ISSN 2321 -158X

সমাজ জিজ্ঞাসা

সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা
অষ্টম বর্ষ / ২০১৪
১ ও ২য় সংখ্যা

- রবীন্দ্র কাব্য ভাবনায় প্রতীকী নাটকের ঐতিহাসিক তাৎপর্য
- আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ভাবনায় ভারতবর্ষ
- উনিশ শতকে ভারতীয় নারী ও চিকিৎসাবিদ্যা : আধুনিকতার এক সমুজ্জল প্রতিফলন
- পেরিয়ারের আত্মমর্যাদা আন্দোলনের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা
- জাতের সচলতা-আধুনিকীকরণের নতুন দিক
- কালিম্পং নোটবুক-মায়েল লিয়াং, গোর্খা ল্যান্ড ও বায়ব রাজনীতি: একটি পর্যালোচনা
- খাদ্য নিরাপত্তায় ভারত
- কর্মের অধিকার ও আইনি নিশ্চয়তা রক্ষায় মহাত্মা গান্ধীর জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের ভূমিকা: একটি বিশ্লেষণের প্রয়াস
- ল্যান্ডবন্ড: জমি অধিগ্রহণের এক সম্ভাবনাময় চাবিকাঠি
- আধুনিক ভারতে নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রযুক্তির ব্যবহার
- পুস্তক পর্যালোচনা

বিদ্যাসাগর সেন্টার ফর সোস্যাল সায়েন্সেস
মেদিনীপুর

সমাজ জিজ্ঞাসা

Samaj Jijnasa

[সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা]

ISSN 2321– 158 X Samaj Jijnasa

অষ্টম বর্ষ

১ম ও ২য় সংখ্যা

২০১৪

সম্পাদক

অনিল কুমার জানা

সহ-সম্পাদক

শক্তি পদ পাল

বিদ্যাসাগর সেন্টার ফর সোস্যাল সায়েন্সেস

[বিদ্যাসাগর সমাজ বিজ্ঞান কেন্দ্র]

মেদিনীপুর

প্রকাশক অধ্যাপক অনিল কুমার জানা
সম্পাদক
বিদ্যাসাগর সমাজ বিজ্ঞান কেন্দ্র
মেদিনীপুর

মুদ্রণ গিরি প্রিন্টার্স, মেদিনীপুর
২৭৬২৮৬/৯৪৩৪০০৫৪৫৮

প্রাপ্তি স্থান ভূর্জপত্র
ইউনিভার্সিটি রোড, তাঁতিগেড়িয়া
মেদিনীপুর, ০৩২২২-২৭১৩৫৭

মূল্য : ষাট টাকা
(সভ্য ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পঞ্চাশ টাকা)

Address for Communication :
Dr. Anil Kumar Jana
Director & Secretary
Vidyasagar Centre for Social Sciences, Midnapore
F/4, Bidhan Nagar, P.O. Midnapore
Dist. West Midnapore (721 101) WB
Ph. 264232 / (M) 9434414340

The philosophy of any time is 'nothing but the spirit of that time expressed in abstract thought'.

With compliments from:

Centre for Development and Local Studies

... exploring alternative ideas & community actions

Midnapore • West Bengal

Office : F-4, Bidhan Nagar, West Midnapore (WB)

(M) 9434414340 / Email : anilkjana.vu@gmail.com

সমাজ জিজ্ঞাসা
Samaj Jijnasa

৮ম বর্ষ / ২০১৪ ১ম ও ২য় সংখ্যা

সূচীপত্র

তপতী দাশগুপ্ত	রবীন্দ্র কাব্য ভাবনায় প্রতীকী নাটকের ঐতিহাসিক তাৎপর্য	১-১৬
পাপিয়া গুপ্ত	আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ভাবনায় ভারতবর্ষ	১৭-২২
নিবেদিতা পাল	উনিশ শতকে ভারতীয় নারী ও চিকিৎসাবিদ্যা : আধুনিকতার এক সমুজ্জ্বল প্রতিফলন	২৩-৩৬
দেবী চ্যাটার্জী	পেরিয়ারের আত্মমর্যাদা আন্দোলনের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা	৩৭-৪৩
মনিমালা ঘোষ	জাতের সচলতা – আধুনিকীকরণের নতুন দিক	৪৪-৫৬
তপন কুমার দাস	কালিম্পং নোটবুক—মায়েল লিয়াং, 'গোর্খা'ল্যান্ড ও বায়ব রাজনীতি: একটি পর্যালোচনা	৫৭-৬৯
সেবক জানা ও অসীম কর্মকার	খাদ্য নিরাপত্তায় ভারত	৭০-৮৩
রুদ্র প্রসাদ রায়	কর্মের অধিকার ও আইনি নিশ্চয়তা রক্ষায় মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের ভূমিকা:একটি বিশ্লেষণের প্রয়াস	৮৪-১০০
মানসেন্দু কুন্ডু	ল্যান্ডবন্ড : জমি অধিগ্রহণের এক সম্ভাবনাময় চাবিকাঠি	১০১-১০৭
সুজয়া সরকার	আধুনিক ভারতে নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রযুক্তির ব্যবহার	১০৮-১১৯
পুস্তক পর্যালোচনা :		
শক্তি পদ পাল	Sudha Pai (ed), *Handbook of Politics in Indian States– Regions, Parties and Economic Reforms*	১১৯-১২৩
অনিল কুমার জানা	*Public Administration in the Globalisation Era– The New Management Perspective*	১২৪-১২৮

লেখক পরিচিতি

ড. অসীম কর্মকার	সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
ড. তপতী দাশগুপ্ত	পরামর্শ বিশেষজ্ঞ, আর্কিওলজি ও রিজিওন্যাল্ প্ল্যানিং বিভাগ, আই.আই.টি., খড়্গপুর
ড. তপন কুমার দাস	সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দমদম মতিঝিল কলেজ, কলকাতা
ড. দেবী চ্যাটার্জী	ভূতপূর্ব অধ্যাপিকা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা
ড. নিবেদিতা পাল	সহযোগী অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, সরোজিনী নাইডু কলেজ ফর্ উইমেন, কলকাতা
ড. পাপিয়া গুপ্ত	সহযোগী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
মনিমালা ঘোষ	সহযোগী অধ্যাপিকা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়
ড. মানসেন্দু কুন্ডু	সামার ফ্যাকাল্টি, নৃতত্ত্ব ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগদ্বয়, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্ণিয়া, সান্টাবারবারা, ইউ.এস.এ.
রুদ্র প্রসাদ রায়	সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, এগরা এস এস বি কলেজ, মেদিনীপুর
ড. সুজয়া সরকার	সহযোগী অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
ড. সেবক জানা	সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
ড. শক্তিপদ পাল	ভূতপূর্ব সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, খড়্গপুর কলেজ, মেদিনীপুর
ড. অনিল কুমার জানা	অধ্যাপক, গ্রামীণ প্রশাসন সহ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

তপতী দাশগুপ্ত

রবীন্দ্র কাব্য ভাবনায় প্রতীকী নাটকের ঐতিহাসিক তাৎপর্য

সারাংশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের অন্যতম প্রগতিশীল চিন্তানায়ক, যিনি তাঁর অসামান্য সাহিত্য সম্ভারের মাধ্যমে তখনকার সুপ্ত, ভাঙনধরা সমাজকে দিতে পেরেছিলেন এক দৃপ্ত সচেতনতাবোধ। তাঁর লেখা প্রতীকী নাটকগুলি ছিল এই সচেতনতাবোধের এক বলিষ্ঠ হাতিয়ার – এর মধ্যে 'অচলায়তন', 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা' ও 'তাসের দেশ' (নৃত্যনাট্য) প্রভৃতি সামাজিক প্রেক্ষাপটে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে। 'অচলায়তন' নাটকটি এক আবদ্ধ, সংকীর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রহসন। 'রক্তকরবী' ও 'মুক্তধারা' দুটি নাটকই শোষণ ও পীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ। 'রক্তকরবী' তে আছে মুখ্যত মুক্তির বার্তা ও পীড়নের বিরুদ্ধাচারণ; 'মুক্তধারায়' আছে সরাসরি ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রজাবিদ্রোহের ডাক। দুটি নাটকই নব্য-শিল্পায়ন ও পুঁজিবাদের বিরোধী বিপ্লবী সুরের বার্তাবাহক। 'তাসের দেশ' একটি জড় সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং নারী মুক্তির পক্ষে দৃঢ় অঙ্গীকার। প্রত্যেকটি নাটকেই প্রতিবাদী জনতার প্রতিভূ রূপে একেক জনের চিত্র রবীন্দ্রনাথ নিপুণ হাতে এঁকেছেন – 'অচলায়তনে' পঞ্চক, 'রক্তকরবী' তে নন্দিনী, 'মুক্তধারায়' যুবরাজ অভিজিৎ এবং 'তাসের দেশে' ভিনদেশী রাজপুত্র। প্রত্যেকটির উদ্দেশ্য এক – ভাঙনধরা সমাজব্যবস্থাকে প্রগতির পথের, আলোর

পথের , মুক্তির পথের দিশা দেখানো। অষ্টাদশ,উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংঘটিত – ইংলন্ডের গৌরবময় বিপ্লব (১৬৮৮). আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৭৮৩), শিল্পবিপ্লব (১৭৬০ থেকে শুরু), ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯, ১৮৩০. ১৮৪৮), রুশ বিপ্লব (১৯১৭) কবির মনে গভীর প্রভাব রেখেছিল। ভারতবর্ষে এবং এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সেদিন একা মহা সংকট। ভারতবর্ষে উন্মেষ হয়েছে জাতীয়তাবাদী চেতনার সাথে সাথে ধনতান্ত্রিক চেতনা ও সমাজতান্ত্রিক চেতনা। এই সমস্ত কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রতীকী নাটকগুলি এক বিশেষ ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করে।

এক

রবীন্দ্র কাব্যভাবনার সুবৃহৎ পরিসরে প্রতীকী নাটকগুলি একটি বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে এবং কিছু চিন্তাবিদের মতে প্রত্যেকটি প্রতীকী নাটকের বিশেষ সামাজিক এবং ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ গবেষণার বিষয়বস্তু। প্রতীকী নাটকেরও বৃহৎ পরিধির মধ্যে চারটি বিশেষ নাটককে বেছে নেওয়া হয়েছে এই প্রবন্ধে, তাদের সামাজিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্যের জন্য – এগুলি হল – 'অচলায়তন', 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা' ও 'তাসের দেশ' (নৃত্যনাট্য)। রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন ১৮৬১ সালে, তখন সারা ভারত উত্তাল সিপাহী বিদ্রোহের মত এক মহা বিদ্রোহের উত্তেজনা ও আগুনকে প্রশমিত করতে। বিক্ষুব্ধ সেদিন সমস্ত ভারতবাসী; একদিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের ব্যর্থ প্রচেষ্টা, অন্যদিকে স্বাধীনতার সচেতনতায় সদ্য জাগ্রত ভারত এক নতুন সূর্য অবলোকনের জন্য উন্মুখ। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় সেদিন ঔপনিবেশিক শাসনকর্তারা ভারতকে রাণী ভিক্টোরিয়ার নতুন খেতাবে অলংকৃত করে ভারতকে প্রভূত সম্মানে সম্মানিত করার জন্য প্রয়াসী। অন্যদিকে, অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে, ঔপনিবেশিক শাসক ও বণিকগণ ভারতকে রিক্ত, নিঃস্ব, বঞ্চিত করে নিজেদের দেশকে সমৃদ্ধশালী করার আকাঙ্খায় মূর্খ ও দরিদ্র ভারতবাসীকে প্রতিনিয়ত পদদলিত করে চলেছে। গ্রামাঞ্চলের চাষ আবাদ, কুটীরশিল্প সেদিন শ্রীহীন, সম্পদহীন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণে ও সংকটের সময় তৈরী হল সামাজিক প্রেক্ষাপট। ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে প্রতিদেশে, প্রতিকালে, এই ধরণের সংকটপূর্ণ অবস্থার মোকাবিলা করেছে মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। বাংলায়, তথা ভারতবর্ষে সেদিন কান্ডারীর ভূমিকা নিয়েছিলেন এই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাংস্কৃতিক মিলনসেতু ঘটিয়ে এবং ঔপনিবেশিক শাসনের উজ্জ্বল ও অন্ধকার দিকগুলি বিবেচনা করে দেশবাসীকে সচেতন ও জাগ্রত করে তোলার শুরু দায়িত্ব নিয়েছিলেন এই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণে এই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী বা Modernist দের একটি অগ্রগণ্য ভূমিকা ছিল – জাতির জীবনে তাঁরা একাধারে যেমন তাঁদের বহুমুখী প্রতিভার ছাপ রেখে যেতে পেরেছিলেন, অন্যদিকে কুসংস্কার ও অশিক্ষার অন্ধকারে নিমগ্ন একটি

জাতিকে আলোর পথের সন্ধান দেখিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রথম সারির ব্যক্তিবিশেষ যাঁরা ছিলেন, তাঁরা হলেন রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আরো অনেকে। রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন জোড়াসাঁকোর সেই ঠাকুর পরিবারে যেখানে স্বদেশীয়ানা ও সংস্কৃতির একই সঙ্গে চর্চা ছিল। তিনি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত ব্যক্তিরই সহোদর, যাঁরা তখন বাংলার নবজারণের প্রতিটি সোপানকে জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, অঙ্কনে, সাহিত্যে দর্শনে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন এবং অজ্ঞানতার তমসা থেকে বাংলা তথা ভারতকে জাগ্রত করে তোলার এক নিরলস প্রয়াস নিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা'র পাতায় পাতায় লিখেছেন কিভাবে তাঁরা প্রতিটি ভাই বোন এই সাংস্কৃতিক জগতের পরিমন্ডলীর মধ্যে বড় হয়েছিলেন। তখনকার দিনের শিক্ষাব্যবস্থাটি ছিল বড়ই কৃত্রিম - প্রকৃতপক্ষে হিন্দুসমাজ তখনও ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের শিকার এবং প্রতি পদে আচার, নিয়ম - নিষ্ঠা, সংস্কারের আবদ্ধ। শ্বাসরোধকারী এই সমাজ ব্যবস্থায় 'শিক্ষা' শব্দটি নিতান্তই একটি প্রহসন ছাড়া কিছুই ছিল না। রবীন্দ্রনাথ নিজে তথাকথিত স্কুল কলেজের শিক্ষার এই কাঠামোটি কোনদিনই পছন্দ করেন নি। তাঁর শিক্ষার আদর্শ ছিল একেবারে নতুন ধরণের – প্রকৃতির স্পর্শে থেকে, প্রাণের ছোঁওয়া লাগা, আনন্দের ছোঁওয়া লাগা শিক্ষাই তিনি মনে করতেন প্রকৃত শিক্ষা। এই শিক্ষা ব্যবস্থা তিনি পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে – যা আজও সারা পৃথিবীতে একটি ব্যতিক্রমী শিক্ষাব্যবস্থা বলে সুস্বীকৃত। কিন্তু উনিশ শতকের সেই কৃত্রিম, অচল শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থাকে তিনি তীব্র ভাবে ধিক্কার দিয়েছেন এবং ১৯০১ সালে প্রতীকী নাটক 'অচলায়তনে' এই কৃত্রিম ব্যবস্থার থেকে মুক্ত হবার জন্য প্রতিবাদী ভাষা দিয়েছেন এই সমাজেরই নীচু তলার মানুষের কন্ঠে এবং কিছু প্রগতিবাদী মানুষের কন্ঠে।

দুই

'অচলায়তন' নাটকটি লেখা হয়েছে একটি অচলায়তনকে ঘিরেই। প্রথম থেকেই এই নাটকে প্রতীকের স্পর্শ। অচলায়তন এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে মহাপঞ্চক, উপধ্যায়ের মতে কিছু সংস্কারতায় আচ্ছন্ন মানুষ প্রতিষ্ঠানটি চালান এবং প্রতিনিয়ত ছাত্রদের কিছু পুঁথিগত বিদ্যা কন্ঠস্থ করান ও পাপ-পুণ্য প্রায়শ্চিত্তের কঠিন নির্দেশ দিয়ে থাকেন। পঞ্চক, সুভদ্র, বিশ্বম্ভর, জয়োত্তম, সঞ্জীবের মত ছাত্ররা 'স্ফট স্ফট স্ফোটায়'র মত শাস্ত্র আওড়ায়, অস্পৃশ্যতার পাঠ নেয় এবং একজটা দেবীর মত কাল্পনিক দেবীর অভিশাপের ভয়ে সদাই কোনও অনির্দিষ্ট পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। এই কৃত্রিম শিক্ষা ব্যবস্থায় পঞ্চক ছিল একমাত্র ব্যতিক্রম, যে মনে–প্রাণে এই শিক্ষাব্যবস্থাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি এবং অস্পৃশ্য সম্প্রদায় শিক্ষা ব্যবস্থার ভাগ পাবে না বলে বিরোধিতা করেছে – তার কন্ঠেই নাটকের আরম্ভে আমরা শুনি মুক্তির সুর, প্রতিবাদী সুর :

"তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে
কেউ তা জানে না,
আমার মন যে কাঁদে আপন মনে,
কেউ তা মানে না।"[১]

সুভদ্র ছিল এমনই একটি কিশোর, যে সদাই পাপ এবং পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধনে ব্রতী; পাপ হল এমনই একটি পাপ যা হয়তো আবদ্ধ সমাজব্যবস্থার একটি অর্গল খুলে দেবার প্রচেষ্টা অর্থাৎ আয়তনের উত্তর দিকের একটি বাতায়ন খুলে দেওয়ার পাপ। এই পাপের বাতাসই যে প্রথম মুক্তির বাতাস বয়ে এনেছিল আবদ্ধ অচলায়তনে, তা প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে নাটকের প্রথম থেকেই। প্রতীকগুলি আরও সুস্পষ্ট হয়েছে প্রতিবাদের ভাষায় যা রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন শোনপাংশু এবং দর্ভক নামের অস্পৃশ্য, নীচু সম্প্রদায়ের মানুষের কন্ঠে যারা সোচ্চার হয়ে উঠেছে প্রতিহিংসায়, প্রতিবাদে, কারণ তাদের সম্প্রদায়ের চন্ডককে হত্যা করা হয়েছে নির্মমভাবে। মহাপঞ্চকের ভাই পঞ্চক, যে ছিল প্রথম থেকেই প্রতিবাদী জনতার প্রতীক এবং শাস্ত্র-শিক্ষায় অনিচ্ছুক, সে এই নীচু সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙার কাজে হাত মেলায়। কারণ, পঞ্চকের মত মানুষের মতে নীচু সম্প্রদায়ের মানুষরা শিক্ষার সুযোগ থেকে সদাই বঞ্চিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, অস্পৃশ্য বলে তারা সমাজে ঘৃণিত, অবহেলিত। পঞ্চকের কন্ঠে বিভিন্ন গানের কলি বেঁধে রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্ট করে তুলেছেন নিরেট, অচল সমাজব্যবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সুর, মুক্তির সুর। এর মধ্যে,

"আমি কারে ডাকি গো –
আমার বাঁধন দাও গো টুটে"
"আজ যেমন করে গাইছে আকাশ
তেমনি করে গাও গো।"[২]
"হাররে রে রে রে রে
আমায় ছেড়ে দেরে দেরে
যেমন ছাড়া বনের পাখি
মনের আনন্দে রে "।[৩]

গানগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নাটকের শেষের দিকে উঁচু-নীচু সবাই মিলে অচলায়তনের আবদ্ধ অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসার আলো দেখতে পায়। মহাপঞ্চক, উপাচার্য-এঁদেরও ছাত্রসম্প্রদায় মিলে, নীচু সম্প্রদায় মিলে বোঝাতে সক্ষম হয় যে এই জাতি-ভেদের জালে জর্জরিত ও কুসংস্কারের পীড়নে মথিত সমাজ ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হতে হবে এবং শিক্ষাকে শুধুমাত্র কন্ঠস্থ বুলি না করে মুক্তির আনন্দ, প্রকৃতির আনন্দ ও হৃদয়ের আনন্দের সঙ্গে মেলাতে হবে।

"আলো আমার আলো, ওগো
আলো ভুবনভরা।
আলো নয়ন-ধোওয়া আমার
আলো হৃদয়হরা"[৪]

এই আলোর বন্যা অন্ধকার থেকে উত্তরণের আলো, কুসংস্কার থেকে প্রগতির পথে এগোনোর আলো এবং জড়তা থেকে মুক্তির আলো।

রবীন্দ্রনাথের এই নাটক 'অচলায়তন' তখনকার যুগের সামাজিক চিত্রপটে একটি প্রকৃত প্রতীকী নাটক, যা তখনকার সমাজব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থাকে তীব্র কশাঘাত করেছে। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে রবীন্দ্রনাথের একই পরিপ্রেক্ষিতে লেখা 'লিপিকা'র অন্তর্গত 'তোতাকাহিনী' সমাজব্যবস্থা ও শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রহসন। একটি তোতাপাখিকে শিক্ষিত করে তোলার যে প্রবল প্রয়াস নিয়েছিলেন রাজা তাঁর মন্ত্রী এবং চাটুকার দল তারই এক হাস্য প্রহসন এই 'তোতাকাহিনী'। তোতার জন্য সোনার খাঁচার ব্যবস্থা হয় এবং পুঁথির উপর পুঁথি দিয়ে তোতাকে দম চাপা করা হয়। দানা-পানির বদলে কেবলই পুঁথি মুখ-গহ্বরে ভরে তার মৃত্যুর পথটি ত্বরান্বিত ও প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। প্রহসনটির শেষে পাখির মৃত্যুকালে রাজার আগমন ও তাঁর সভাসদবৃন্দের কথোপকথনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পুরা হইয়াছে"।
রাজা শুধাইলেন, "ও কি আর লাফায়"।
ভাগিনা বলিল, "আরে রাম"।
"আর কি ওড়ে"।
"না।"
"আর কি গান গায়।"
"না।"
"দানা না পাইলে আর কি চেঁচায়।"
"না।"
রাজা বলিলেন, "একবার পাখিটাকে আনো তো, দেখি"। পাখি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল। রাজা পাখিটাকে টিপিলেন, সে হ্যাঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্‌খস্‌, গজ্‌গজ্‌ করিতে লাগিল। বাহিরে নববসন্তের দক্ষিণ হাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘনিশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।[৫]

মুক্তি-বিহীন, আলো-বিহীন, আনন্দ-বিহীন এই দম-চাপা শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের লেখনী একদিন যন্ত্রণায়, ধিক্কারে ও সমালোচনায় সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। এই সমালোচনা ভারতীয় মনস্তত্ত্বের গভীরে সংকুচিত সংকীর্ণ মূল্যবোধের বিরুদ্ধে এবং এই সমালোচনা তখনকার তথাকথিত মুকুটধারী, শোষণকারী ঔপনিবেশিক শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে।

তিন

রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' এমনই একটি প্রতীকী নাটক যা সে যুগের শোষক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে শুধু বিশাল তফাৎটাই সুস্পষ্ট করে তোলে না, শোষক যে তার অত্যাচারে ও শোষণে কতটা ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে, তারই একটি জ্বলন্ত নজির রাখে। মনে রাখতে হবে, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সে যুগটি হচ্ছে নব্য শিল্পায়নের যুগ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলন্ডে যে শিল্পবিপ্লবের জন্ম, তারই উৎসমুখ ধরে এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ে শিল্পায়নের ধারা। গ্রামীণ কুটির শিল্প তখন ক্রমশঃ ভাঙনের মুখে এবং নব্য বিকশিত ভারী শিল্পের চাপে শ্রমিক শ্রেণী সেদিন দিশেহারা। ঔপনিবেশিক শাসক এবং শোষণকর্তারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় নিজেদের দেশের অর্থনৈতিক তহবিলকে অর্থসঞ্চয়ে পূরণ করার তাগিদে ভারতীয় চাষী এবং শ্রমিককে অকথ্য নির্যাতন করে চলেছে। দিশাহারা চাষী - মজুরের বোবা কান্না, ব্যর্থ প্রতিবাদে কেউ কান দেয় না। এমনই একটি শোষণস্থল 'রক্তকরবী'র যক্ষপুরী, যেখানে শ্রমিকদল খনি থেকে তাল তাল সোনা তোলার কাজে অবিরাম ব্যস্ত। রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই বেছে নিয়েছেন একটি প্রতীকধর্মী নাম 'রক্তকরবী' - যা হল প্রতিবাদেরই রক্তঝরা নাম। এখানে প্রতীকী শাসন-শোষণ-কর্তা সদাই লৌহ জালের অন্তরালে নেপথ্যে থাকেন। তাঁর চরিত্রটি কবি চিত্রিত করেছেন দুভাবে - একদিকে শোষণকারী ও অত্যাচারী, অন্যদিকে অতিরিক্ত মালিকানাকারী ও প্রেমের ভিখারী। রবীন্দ্রনাথ এই নেপথ্য চরিত্র বা রাজার চরিত্রের মধ্য দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যারা সংসারে বা সমাজে অতিরিক্তি দাপট ও শাসন দেখায়, তারাই ব্যক্তিগত জীবনে হয় সম্পূর্ণ কাঙাল, রিক্ত।

'রক্তকরবী' তে নন্দিনী চরিত্রটি আরেকটি প্রতীকী চরিত্র, যাকে রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন কল্পনার রঙে রঙীন করে। রক্তকরবীর সাজে সজ্জিতা এই নারী একইসঙ্গে মুক্তি, প্রেম ও প্রতিবাদের এক উজ্জ্বল প্রতীক। রাজা নন্দিনীকে তীব্রভাবে কামনা করেন, কিন্তু কখনই পান না, তার কারণ নন্দিনী নিরাসক্ত, সে যে এক প্রগতিবাদী, প্রতিবাদী যুবক রঞ্জনের প্রেমে মাতোয়ারা। নাটকে আরও চরিত্র আছে – যেমন ফাগুলাল, চন্দ্রা, বিশু পাগল, অধ্যাপক ও কিশোর প্রমুখ। ফাগুলাল চন্দ্রারা শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিভু – তারা বুঝতে পারে না কবে তাদের স্বর্ণখনির কাজ শেষ হবে, কবেই বা তারা নিজেদের গাঁয়ে ফিরে যেতে পারবে। আছেন অধ্যাপকের মত বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত, যিনি প্রতিনিয়ত বোঝার চেষ্টা করেন প্রকৃত শোষণকারী কে এবং মুক্তির উপায়ই বা কি – নন্দিনীর মধ্যে তিনি মুক্তির একটি নিশানা খুঁজে পান। আছে গোকুলের মত কিছু গুপ্তচরবৃত্তির মানুষ, যারা সদাই প্রতিবাদী মানুষ, তথা নন্দিনীর মত মুক্তিকামী মানুষের গতিবিধির উপর নজর রাখছে। বিশু পাগল তারই মধ্যে প্রাণের সঞ্চার, আশার আলো জুগিয়ে চলেছে সবার মনে, বিশেষ করে নন্দিনীর মনে। নেপথ্য রাজার প্রতিনিধি হিসেবে সর্দার তার কঠোর দায়িত্ব পালনে কোন কসুর করে না – নম্বরধারী প্রতিটি শ্রমিকের উপর তার কঠোর নজরদারী।

শেষ পর্যন্ত যক্ষপুরীতে নেমে আসে রক্তের ঢল, প্রতিবাদের বন্যা। বাঁ হাতে বাজপাখির ক্রূর শোষণ চিহ্ন নিয়ে রাজা প্রতিবাদী শ্রমিক শ্রেণীর দলনায়কদের শেষ দেখতে চান। এর মধ্যে পড়ে বিশু পাগল, রঞ্জন নামে নন্দিনীর সেই নেপথ্য নায়ক – যার চলার ছন্দ, যৌবনের ছন্দ এবং প্রতিবাদের ভাষা যার কোদাল নয়, সারেঙ্গি। নন্দিনীর হাতের রক্তকরবীর মুকুট আর তার পরা হল না – রাজা তার শেষ পরিণতি দেখতে চাইলেন দুই কারণে – প্রতিবাদী শ্রমিক দলের প্রতিভূর বিনাশ ও রক্তকরবী পরিহিতা নন্দিনীর প্রেমের বিনাশ। একই নিয়মে বিশু পাগলকে শেষ করতে চাইলেন, কারণ সে যে মুক্তির দূত, আনন্দের দূত। কিন্তু মুক্তি স্বরূপিণী, আনন্দ স্বরপিণী, প্রেম স্বরূপিণী নন্দিনী এই শোষণকে মানে নি। রাজাকে সে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছে, অনেক চেষ্টা করেছে নেপথ্য জালের অন্তরাল থেকে বের করে এনে তাকে বাইরের দুনিয়ার রঙ, আলো, বাতাস, মুক্তি, স্বাধীনতা আনন্দকে দুহাত ভরে গ্রহণ করাতে। উলে□সে পেল চরম দুঃখ, বঞ্চনা ও পীড়ন। তাই সে সবাইকে ডাক দিয়েছে, সর্বহারা মানুষকে শোষণ ও পীড়নের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তুলেছে – বর্শার আগায় তার কন্দফুলের মালা। যে রক্তকরবীর ভূষণে রঞ্জনকে সে বরণ করে নেবে ভেবেছিল, সেই রক্তকরবীর লাল, হয়ে ওঠে তার প্রতিহিংসা রঞ্জন, পাগলা বিশু ও কিশোরকে কেড়ে নেবার ধিকিধিকি আগুনে।

এই সমাজবিরোধী, শ্রেণী বিরোধী নাটকটিতে মুক্তিকামী গানের সংখ্যা কম নয়।

নন্দিনীর কন্ঠে :

"ভালোবাসি ভালোবাসি
এই সুরে কাছে দূরে জলে - স্থলে বাজায় বাঁশি
আকাশ কার বুকের মাঝে
ব্যাথা বাজে
দিগন্তে কার কালো আঁখির আঁখির জলে যায় গো ভাসি"[৬]।

বিশু পাগলের কন্ঠে :

"মোর স্বপ্নতরীর কে তুই নেয়ে!
লাগল পালে নেশার হাওয়া,
পাগল পরান চলে গেয়ে।
আমায় ভুলিয়ে দিয়ে যা
তোর দুলিয়ে দিয়ে না,
তোর সুদূর ঘাটে চল্ রে বয়ে।"[৭]

অথবা নন্দিনীর রাজাকে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হবার অনুপ্রেরণাদায়ক গান :

"পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে – আয় রে চলে,
আয় আয় আয়।
ডালা যে আজ ভরেছে আজ পাকা ফসলে

মরি হায় হায় হায়
... মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হল –
ঘরেতে আজ কে রবে গে খোলো দুয়ার খোলো।"[৮]

এই গান গুলি প্রত্যেকটি মুক্তির গান, আনন্দের গান। 'রক্তকরবী' প্রতীকী নাটকের মূল বার্তা হল শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিক অসন্তোষ, শ্রমিক বিনাশের পালা এবং শেষ পর্যায়ে রক্তের বিনিময়ে, প্রাণের বিনিময়ে প্রতিবাদের জয় ও শোষকের দলন। রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী' নাটকের মধ্য দিয়ে এক দুঃসাহসিক সমাজবার্তা পৌঁছে দিয়েছেন শোষক ও শোষিতের হৃদয়ে এবং সমাজব্যবস্থার মর্মমূলে।

চার

রবীন্দ্রনাথ যে যুগে তাঁর প্রতীকী নাটকগুলি লেখেন, স্মরণে রাখতে হবে-পৃথিবী ব্যাপী সেটি হচ্ছে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগ। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ইংলন্ডে সূচিত শিল্পবিপ্লব বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে তুমুলভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। কবি ছিলেন একজন যুক্তিবাদী, প্রগতিবাদী এবং একজন পরিবর্তনকামী ব্যক্তি বিশেষ, যিনি বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে দেখেছিলেন বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানের মান উন্নয়নের সাথে সাথে মানুষের এবং সমাজের মান উন্নয়নের এক নিরলস প্রচেষ্টা। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৌন্দর্যের পূজারী, নন্দনতত্ত্বের পূজারী। তাই বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে কোনওরকম সামাজিক অকল্যাণ ও বিকৃতি তিনি কোনমতেই সহ্য করতে পারেন নি। বিজ্ঞানের অগ্রগতির মধ্যে তিনি একদিকে দেখেছিলেন সভ্যতার আলো, অন্যদিকে তিনি দেখেছিলেন সভ্যতার সংকট। এই সময়কার লেখা বিভিন্ন কাব্য- কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি সমাজ ও সভ্যতাকে চরম ধিক্কার দিয়েছেন সভ্যতার এই বিকৃতির জন্য এবং গুচ্ছ গুচ্ছ প্রহসনমূলক লেখনীর মধ্য দিয়ে তিনি মানুষকে বোঝাতে চেয়েছিলেন বিজ্ঞানকে অতি মাত্রায় স্বীকৃতি দিয়ে তারা কেমন সর্বনাশা খেলায় মেতেছে। "শতাব্দীর সূর্য আজি রক্ত মেঘ মাঝে অস্ত গেল", "হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব", প্রভৃতি কবিতা ও গান, 'পারস্যে' র অন্তর্গত 'পক্ষীমানব' বা 'কালান্তরের' অন্তর্গত 'ব্যবস্থা ও অব্যবস্থা' এই প্রহসন ধর্মী রচনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এমনই একটি বিশেষ প্রতীকী নাটক 'মুক্তধারা'। এই নাটকের পটভূমিকা উত্তরকূট পার্বত্যপ্রদেশ। নাটকের আরম্ভেই যন্ত্ররাজ বিভূতি পঁচিশ বছরের প্রচেষ্টায় মুক্তধারা নামক জলধারাকে এক বিকৃত দর্শন বাঁধে বেঁধেছেন। তারই জয়োল্লাস পথে পথে। উত্তরকূটের সমস্ত নাগরিক বিপুল উল্লাসে তাই সমবেত হতে চলেছে ভৈরব মন্দিরে কাঁসর ঘন্টা শঙ্খ বাজিয়ে। ভৈরব মন্ত্রে দীক্ষিত সন্ন্যাসীদল

"জয় ভৈরব, জয় শংকর,
জয় জয় জয়, প্রলয়ংকর
শংকর শংকর"[৯]

গান গাইতে জনতার পুরোভাগে আছেন। সারা উত্তরকূটব্যাপী এই জয়োল্লাস পদযাত্রার মধ্যে হঠাৎই শোনা যায় অম্বা নামে এক সন্তানহারা মায়ের আর্ত কান্না, তার সুমন যে হারিয়ে গেছে বা তাকে বলিদান করা হয়েছে নারকীয় এই কর্মযজ্ঞের মর্মনাশা মারণখেলায় – সন্তানহারা মায়ের মর্মভেদী কান্না বিজ্ঞানের জয়ধ্বনিকে ছাড়িয়ে যায়। ঠিক তেমন করেই ছাড়িয়ে যায় শিবতরাই এর অসহায় মানুষের বোবা কান্না, যারা বছরের পর বছর এমন করেই দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছে যা প্রকৃতির বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা এই যন্ত্রলীলার শোষণের মাধ্যমে হয়েছে। নাটকে দেখা যায় মানুষ এখানে দু'দলে বিভক্ত – একদল উত্তরকূটের মানুষ রাজা রণজিৎ এবং যন্ত্ররাজ বিভূতিকে খুশি করার তাগিদে এবং যন্ত্রের জয় উন্মাদনায়, মত্ত। অন্যদল, শিবতরাই এর অসংখ্যা খেটে খাওয়া শ্রমিক মজুরের দল, যারা দিনের পর দিন ক্ষুধার তাড়নায়, শোষণে ও অত্যাচারে জর্জরিত হয়েছে এবং বহু প্রাণ বলিদান করেছে মুক্তধারার জলস্রোতে বিজ্ঞানের বাঁধ গড়ে তোলার জন্য। এই প্রতিবাদী জনতার প্রতিভূ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ বেছে নিয়েছেন এমনই একজন মানুষকে যিনি উত্তরকূটের যুবরাজ এবং আগামী দিনের রাজা – তিনি রাজা রণজিতের পুত্র কুমার অভিজিৎ। যুবরাজ অভিজিৎই শেষ পর্যন্ত যান্ত্রিক বাঁধ ভেঙে দেবার এক তীব্র তাগিদে শিবরতাই এর হাজার হাজার শ্রমিকের কান্না নিজের করে নেন। তিনি আবিষ্কার করেন, তিনি নিজে প্রকৃত রাজরক্তের কেউ নন – প্রকৃতির বুকে বয়ে যাওয়া মুক্তধারার ঝর্ণাতলায় কুড়িয়ে পাওয়া এক অনাথ, যাকে জোর করে রাজতিলক পরিয়ে উত্তরকূটের বংশধর হিসেবে চিহ্নিত করার এক বিপুল প্রয়াস চলেছে। এই প্রসঙ্গে রাজকুমার সঞ্জয়কে উদ্দেশ্য করা যুবরাজ অভিজিতের উক্তিটি স্মরণীয় :

> "মানুষের ভিতরকার রহস্য বিধাতা বাইরে কোথাও-না-কোথাও লিখে রেখে দেন; আমার অন্তরের কথা আছে ঐ মুক্তধারার মধ্যে। তারই পায়ে ওরা যখন লোহার বেড়ি পরিয়ে দিলে তখন হঠাৎ যেন চমক ভেঙে বুঝতে পারলুম উত্তরকূটের সিংহাসনই আমার জীবনস্রোতের বাঁধ। পথে বেরিয়েছি তারই পথ খুলে দেবার জন্য।"[১০]

'মুক্তধারা' নাটকটি যান্ত্রিক সভ্যতার প্রধান অঙ্গ বস্তুবাদের বিরুদ্ধে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ অঙ্গীকার। শিল্পায়নের সাথে সাথে সারা বিশ্বে (উনিশ ও বিশ শতকে) গড়ে উঠেছিল নব্য পুঁজিবাদ (Neo capitalism) এবং পুঁজিবাদী শোষকরা সাধারণ মানুষের প্রাণের দামের বিনিময়ে নিজেদেরকে, দেশকে, নিজেদের পুঁজিকে যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। শ্রমিক শ্রেণীর কি হারাল, কি গেল, তা নিয়ে তাদের ভ্রুক্ষেপও ছিল না। তাই 'মুক্তধারা' নাটকে সুমনের মা অম্বার অসহায় কান্না কেউ শুনতে পায় না; ধনঞ্জয় বৈরাগীর মত প্রতিবাদী শ্রমিক প্রতিনিধিকে তারা টুঁটি টিপে ধরতে দ্বিধা করে না। কিন্তু অভিজিতের মত শোষিত মানুষের অভিজাত প্রতিনিধির মুখে বিজ্ঞানের বিড়ম্বনার বার্তা কোথাও তাদের নাড়া দেয়। বাঁধ ভেঙে দিয়ে আবার প্রকৃতির সঙ্গে প্রকৃতির বুকের মানুষের যোগসাধন করিয়ে, রবীন্দ্রনাথ মাটিরই জয়গান করেছেন, সাধারণ মানুষের ব্যথা ও যন্ত্রণার সঙ্গে

একাত্ম হবার চেষ্টা করেছেন। এই নাটকের গানগুলির প্রতিটি সেই অনুভূতিকে সুস্পষ্ট করে তোলে। ধনঞ্জয় বৈরাগীর কন্ঠে ব্যথা ও প্রতিবাদ একই সঙ্গে ধ্বনিত হয় এই গানে :

"আরো, আরো প্রভু আরো আরো
এমনি করেই মারো, মারো।
... কেবল হেসে খেলে গেছে বেলা
দেখি কেমনে কাঁদাতে পার।"[১১]

কিন্তু মারে জখম হলেও, প্রতিবাদে অক্ষম নয় সমাজের নীচু তলার মানুষ – তাই ধনঞ্জয় আবার গেয়ে ওঠে :

"তোর শিকল আমায় বিকল করবে না।
তোর মারে মরম মরবে না।"[১২]

যুবরাজ অভিজিৎকে বৈপ্লবিক মন্ত্রে উদ্দীপিত করার জন্য বৈরাগীর কন্ঠে শুনি :

"আগুন আমার ভাই,
আমি তোমারি জয় গাই।
তোমার শিকল ভাঙা এমন রাঙা
মূর্তি দেখি নাই"।[১৩]

পাঁচ

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, যখন রবীন্দ্রনাথের জন্মকাল, সেই সময় তথাকথিত ঐতিহ্যময় হিন্দুসমাজ এক বিরাট সামাজিক ভাঙনের মুখোমুখি। প্রাচীন হিন্দুসমাজে এ ভাঙন চিহ্নিত হয় বৈদিকযুগের শেষভাগে– যখন থেকে সমাজে নানা কুসংস্কার, বর্ণবৈষম্য, বাল্যবিবাহ, অশিক্ষা, স্ত্রীজাতির অসম্মান ইত্যাদি দুর্নীতির মত নিম্ন মূল্যবোধ মানুষের মনেও আনে জরা, তাদের মনের হাসি, আনন্দ সব কেড়ে নিয়ে তাদের করে তোলে জড়পদার্থ। কেবলমাত্র শাস্ত্র-আওড়ানো মানুষ নামের এই জড়পদার্থকে বা ক্লীবকে রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন তীব্র ধিক্কার তাঁর 'তাসের দেশ' নামাঙ্কিত প্রতীকী নৃত্যনাট্যে। নারীর অসম্মান, নারীর পর্দাপ্রথা, সতীদাহপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহের মত সংকীর্ণ সংস্কারের বিরুদ্ধে যাঁরা তাঁদের সংস্কারের হাতিয়ার, লেখনীর হাতিয়ার তুলে ধরেছিলেন, তাঁরা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত মণীষী ব্যক্তি। নারী- মুক্তি আন্দোলনের জোয়ারের অন্যতম প্রধান কর্ণধার ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। এ যুগেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'মহুয়া' কাব্যের অন্তর্গত, 'সবলার', মত কবিতা, যেখানে নারীমুক্তির ছবিটি সুস্পষ্ট।

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা ?
পথপ্রান্তে কেন রব জাগি

ক্লান্তধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি
দৈবাগত দিনে” ?[১৪]

‘তাসের দেশের’ মত প্রতীকী নাটকে রাজপুত্র এবং সদাগর পুত্র ভিনদেশের প্রতিবাদী ও প্রগতি ধারার প্রতীক। তারা ভিনদেশেরই কোন রাণীমার শুভ আশীর্বাদ নিয়ে এসেছে ‘তাসের দেশ’ নামক এক জড় দেশে, যেখানে মানুষরাই একেকজন তাসের মত অনড়, অটল, অচল। তাসের দেশ এক কাল্পনিক দেশ, পাহাড়-সমুদ্রে ঘেরা এক অপরূপ দেশে এসে রাজপুত্র, সদাগর পুত্র মুগ্ধ এবং প্রথম থেকেই তারা যেন অঙ্গীকারবদ্ধ যে তারা এদেশের অচিন মানুষের অনড় মনে এনে দেবে অনাবিল আনন্দ এবং মুক্তির ঝংকার :

“এলেম নতুন দেশে
তলায় গেল ভগ্ন তরী কূলে এলেম ভেসে।
অচিন, মনের ভাষা
শোনাবে অপূর্ব কোন্ আশা,
বোনাবে রঙিন সুতোয় দুঃখসুখের জাল,
বাজবে প্রাণে নতুন গানের তাল,
নতুন বেদনায় ফিরব কেঁদে হেসে” ।[১৫]

তাসের দেশের প্রবেশ দ্বারেই ছক্কা-পাঞ্জার গুরু গম্ভীর সম্ভাষণ

“তোলন নামন
পিছন সমান
বাঁয়ে ডাইনে
চাইনে চাইনে
বোসন ওঠন
ছড়ান গুটন
উলটো-পালটা
ঘূর্ণি চালটা –
বাস্ বাস্ বাস্।”[১৬]

রাজপুত্র সদাগর পুত্রের মনে প্রচুর হাসির উদ্রেক করায় তাসের দেশের মানুষ। তাসের দেশের মানুষ বিস্ময়ে স্তব্ধ। কারণ তাসের দেশে হাসি, আনন্দ, স্বাধীনতা, মুক্তি বলে কিছুই নেই। রাজা, রাণী, টেক্কা, গোলাম-সবাই একেকটি কবির কল্পনায় অলীক চরিত্র, যারা শুধুই নিয়মে চলে, নিয়মে কথা বলে, নিয়মের বাইরে একটুও যায় না। তাদের জাতীয় সঙ্গীত হল :

“চিঁড়েতন, হর্তন, ইস্কাবন –
অতি সনাতন ছন্দে
করতেছে নর্তন
চিঁড়েতন হর্তন।”[১৭]

এই তাসের দেশে প্রচুর নারী চরিত্র, যেমন রাণী, টেক্কানী, চিঁড়েতনী, ইস্কাবনী, হরতনী,

দহলানী ইত্যাদি। কিন্তু এরা সবাই তাদের নিজ অন্তঃপুরে আবদ্ধ একেকজন নারী। এদের প্রত্যেকের বাসনা–কামনা, প্রেম, আনন্দ, ইচ্ছেকে এরা দেশের এবং দশের কল্যাণের জন্য বিসর্জন দিয়ে একেকজন অচলা মূর্তি হয়ে বিরাজ করেছে। রাজপুত্র এদের মধ্যে এনে দিলেন সৌন্দর্য লহরী, নারীত্বের বিকাশ, নিজেকে মুক্তির আনন্দে, স্বাধীনতার আনন্দে ভরিয়ে দেবার প্রয়াস। রাজপুত্রের এই গান-

"ওগো, শান্তপাষাণ মুরতি সুন্দরী
চঞ্চলেরে হৃদয়তলে লও বরি।
কুঞ্জবনে এসো একা,
নয়নে অশ্রু দিক দেখা,
অরুণরাগে হোক রঞ্জিত
বিকশিত বেদনার মঞ্জরী"।[১৮]

যেন পাষাণসুন্দরীদের হৃদয়ে হৃদয়ে পৌঁছে দিল এক নতুন বার্তা- এ বাণী নিজেকে বিকশিত করার বাণী। রাণী হলেন চঞ্চলা, টেক্কানী হলেন উন্মনা– "বলো, সখী, বলো তারি নাম আমার কানে কানে"। হরতনীর গানে

"ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।
... কী মায়া দেয় বুলায়ে, দিল সব কাজ ভুলায়ে,
বেলা যায় গানের সুরে জাল বুনিয়ে।"[১৯]

রুইতন যেন সম্বিৎ ফিরে পায়; তার অনেকদিনের সুপ্ত প্রেম যেন ভাষা পায় হরতনীর রূপ লহরী দেখে :

"উতল হাওয়া লাগল আমার গানের তরণীতে।
দোলা লাগে, দোলা লাগে
তোমার চঞ্চল ওই নাচের লহরীতে
যদি হাল পড়ে খসি,
যদি ঢেউ উঠে উচ্ছ্বসি,
করি নে ভয়, নেবই তারে, নেবই তারে জিতে"।[২০]

অথবা,

"তোমার পায়ের তলায় যেন গো রঙ লাগে,
আমার মনের বনের ফুলের রাঙা রাগে।"[২১]

এই খুশির জোয়ারে ভেসে যায় তাসের দেশ নামক রূপক দেশটি – অনড় পাথর নড়ে ওঠে – নড়ে ওঠে ছক্কা পাঞ্জা, দহলা। রূপে–রসে–আনন্দে ভরে ওঠে হরতনী, ইস্কাবনী, চিঁড়েতনী, দহলানী, টেক্কানীর দল ভিন দেশী সেই রাজপুত্রের যাদুকাঠিতে। বিশেষ করে, নারী মুক্তির ছোঁওয়া লাগে নারীর মনে, সমাজের চেতনা মানসে। এই মুক্তির দোলা শেষ পর্যন্ত রাজা, রাণী, প্রজাবৃন্দ – সবাইকে নাড়া দেয়। ভাঙন ধরা, ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থাকে ভেঙেচুরে

এক নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার স্বপ্নে সবাই বিভোর হয়ে ওঠে :

"বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও
বাঁধ ভেঙে দাও
বন্দী প্রাণমন হোক উধাও।
শুকনো গাঙে আসুক
জীবনের বন্যার উদ্দাম কৌতুক;
ভাঙনের জয়গান গাও।
জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক।
আমরা শুনেছি ওই
মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ
কোন্ নূতনেরই ডাক।
ভয় করি না অজানারে,
রুদ্ধ তাহারি দ্বারে
দুর্দাড় বেগে ধাও।"[২২]

এই সমবেত গান ও নৃত্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে রূপক নাটকটির ইতি টেনেছেন রবীন্দ্রনাথ, রেখে গেছেন বাংলার নবজাগরণের যুগে এক বৈপ্লবিক সুরের রেশ, যা প্রাচীন, ভাঙন ধরা সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক আধুনিকতার বাণী, প্রগতির বাণী।

ছয়

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে চারটি প্রতীকধর্মী নাটক এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটিতে একেক বিশেষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি নাটকেই আমরা খুঁজে পাই কিছু গ্রথিত সূত্র – অর্থাৎ তৎকালীন সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ধিক্কার এবং নতুন সমাজ গড়ে তোলার এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। দুর্নীতিপূর্ণ ও ভাঙন ধরা সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন রূপ কবি দেখিয়েছেন বিভিন্ন নাটকে– শিক্ষা ব্যবস্থার চরম সংকট 'অচলায়তনে' (১৯০১), শিল্পায়নের বিকাশে শ্রমিক মজুরের চরম দুর্গতি 'রক্তকরবীতে' (১৯১৬), বিজ্ঞানের আতিশয্যে সভ্যতার সংকট 'মুক্তধারায়' (১৯১২) এবং ভাঙন ধরা সমাজে নারীর অবস্থান ও মুক্তির অবকাশ 'তাসের দেশ' (১৯২২) নৃত্যনাট্যে। প্রত্যেকটি নাটকেই আমরা দেখি মুক্তির প্রতীক বা প্রতিবাদের প্রতীক রূপে শোষকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে একজন প্রতিনিধি–তারাই শেষ পর্যন্ত জনতার প্রতিনিধি হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। 'অচলায়তনে' পঞ্চক, মহাপঞ্চক, উপাচার্য এদের বিরুদ্ধে আলোর দিশা দেখিয়েছে। 'রক্তকরবীতে' নন্দিনী অত্যাচারী শোষক রাজার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ও মুক্তির রক্ত নিশান উড়িয়েছে। 'মুক্তধারায়' যুবরাজ অভিজিৎ, রাজা রণজিৎ ও যন্ত্ররাজ বিভূতির বিজ্ঞানের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে মেহনতী জনতার সঙ্গে এক হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন

এবং 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্যে রাজপুত্র অনড় অটল সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে ও নারীমুক্তির সমর্থনে মুক্তির দূত রূপে ভূমিকা পালন করেছেন।[২৩]

একথা অনস্বীকার্য যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি প্রতীকী Symbolic Drama বা নাটক সামাজিক-ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের যথেষ্ট জায়গা রেখেছে। ঐতিহাসিক নীহারঞ্জন রায় তাঁর 'Symbolist plays of Tagore' প্রবন্ধে বলেছেন : The world in the last analysis is a world of pure fantasy. The dream faculty is powerfully active and quiet, suspends the intellect and builds up a mysterious world of evocations and implications which reason cannot analyse."[২৪]

উপরি উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি প্রতীকী নাটকেই কয়েকটি দিক সুস্পষ্ট, যেমন – দুর্নীতিযুক্ত সমাজ ব্যবস্থার সংকট মোচন, শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের লড়াই, প্রগতিবাদী মানুষের প্রতিবাদ, প্রজা-বিদ্রোহ এবং নতুন সমাজ ব্যবস্থা স্থাপন। এই প্রত্যেকটি ধারাই ঐতিহাসিক ধারা এবং প্রত্যেকটি ধারাই শুধুমাত্র ভারতবর্ষ নয়, আন্তর্জাতিক দুনিয়ার পরিপ্রেক্ষিতেও সমান সত্য ছিল সেদিন। যে প্রজাবিদ্রোহের ডাক কবি দিয়েছেন প্রত্যেকটি প্রতীকী নাটকে, তা একদিন অনুরণিত হয়েছিল রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তরে। ইংলন্ডে সংঘটিত গৌরবময় বিপ্লব (১৬৮৮), আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৭৮৩) তিনটি ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯, ১৮৩০ ও ১৮৪৮) এবং রাশিয়ান বিপ্লব (১৯১৭) সারা বিশ্বকে সেদিন বার্তা পাঠিয়েছিল নতুন তন্ত্র গড়ার এবং প্রত্যেকটি বিপ্লবই শুনিয়েছিল শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের লড়াই, মেহনতী মানুষের অশ্রু ও প্রতিবাদের সংগ্রাম, প্রতিবাদী জনতার প্রতিনিধি হিসেবে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বৈপ্লবিক ডাক এবং প্রজাবিদ্রোহের তীব্র নিনাদ।[২৫] ভারতবর্ষে হয়তো কখনও সংঘটিত হয়নি কোন বড় মাপের বিপ্লব, ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবী রুশো–ভলটেয়ার-মন্তেস্কিউ বা রাশিয়ার লেনিন-স্টালিনের মত বৈপ্লবিক নেতাও জন্ম নেননি, কিন্তু জন্ম নিয়েছিল বিপ্লবী চেতনার ধারা ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে এবং জন্ম নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের মত কিছু চিন্তাশীল, প্রগতিবাদী ও নন্দনতত্ত্বের অধিকারী সমাজ সংস্কারক, সাহিত্যিক ও সমাজবিদ, যাঁরা এক ক্ষয়িষ্ণু সমাজের বুকে লেখনীর তীব্র কশাঘাত করতে দ্বিধান্বিত হননি। তাঁরা সেইভাবে এক সুপ্ত, তমসালিপ্ত সমাজব্যবস্থাকে, শিক্ষাব্যবস্থাকে এবং মানুষের অন্ধকারাচ্ছন্ন চিন্তামানসকে জাগ্রত করতে বিপুল সাহায্য করেছিলেন এবং অর্গলাধীন, পরাধীন ভারতবর্ষকে জাতীয়তাবাদের দৃঢ় বুনিয়াদ স্থাপন করতে ও স্বাধীনতার সূর্য দেখানোর একনিষ্ঠ প্রয়াসে প্রয়াসী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরের লেখা প্রতীকী নাটকগুলি তাই ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে এক মূল্যবান নজির রূপে আজও মানুষের এবং সমাজের সম্পদ।

সূত্রনির্দেশিকা :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অচলায়তন', *রবীন্দ্ররচনাবলী*, ষষ্ঠ খন্ড. বিশ্বভারতী. ১৯৯৬. পৃ, ৩০৫.

২. *তদেব*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অচলায়তন', *রবীন্দ্ররচনাবলী*, ষষ্ঠ খন্ড. বিশ্বভারতী. ১৯৯৬. পৃ, ৩২৭.

৩. *তদেব*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অচলায়তন', *রবীন্দ্ররচনাবলী*, ষষ্ঠ খন্ড. বিশ্বভারতী.১৯৯৬. পৃ, ৩২৮..

৪. *তদেব*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অচলায়তন', *রবীন্দ্ররচনাবলী*, ষষ্ঠ খন্ড. বিশ্বভারতী. ১৯৯৬. পৃ, ৩৪২.

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "তোতাকাহিনী", লিপিকা, *রবীন্দ্ররচনাবলী*, ত্রয়োদশ খন্ড. বিশ্বভারতী. ১৯৯৬. পৃ, ৩৪৯-৫০.

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রক্তকরবী', *রবীন্দ্ররচনাবলী*, অষ্টম খন্ড. বিশ্বভারতী. ১৯৯৬. পৃ, ৩৭৫.

৭. *তদেব*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রক্তকরবী', *রবীন্দ্ররচনাবলী*, অষ্টম খন্ড. বিশ্বভারতী. ১৯৯৬. পৃ, ৩৭৫.

৮. *তদেব*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রক্তকরবী', *রবীন্দ্ররচনাবলী*, অষ্টম খন্ড. বিশ্বভারতী. ১৯৯৬. পৃ, ৩৯২.

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মুক্তধারা', *রবীন্দ্ররচনাবলী*, সপ্তম খন্ড. বিশ্বভারতী. ১৯৯৬. পৃ, ৩৩৫.

১০. *তদেব*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মুক্তধারা', *রবীন্দ্ররচনাবলী*, সপ্তম খন্ড. বিশ্বভারতী. ১৯৯৬. পৃ, ৩৪৫.

১১. *তদেব*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মুক্তধারা', *রবীন্দ্ররচনাবলী*, সপ্তম খন্ড. বিশ্বভারতী. ১৯৯৬. পৃ, ৩৫০.

১২. *তদেব*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মুক্তধারা', *রবীন্দ্ররচনাবলী*, সপ্তম খন্ড. বিশ্বভারতী. ১৯৯৬. পৃ, ৩৫৭.

১৩. *তদেব*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মুক্তধারা', *রবীন্দ্ররচনাবলী*, সপ্তম খন্ড. পৃ. ৩৬১.

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "*সবলা*", '*মহুয়া*', '*সঞ্চয়িতা*'. কলকাতা. ২০০২. পৃ, ৪১৩.

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '*তাসের দেশ*', *রবীন্দ্ররচনাবলী*. দ্বাদশ খন্ড. পৃ, ২৩৯-৪০.

১৬. *তদেব*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'তাসের দেশ', *রবীন্দ্ররচনাবলী*, দ্বাদশ খন্ড. পৃ, ২৪০.

১৭. *তদেব*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'তাসের দেশ', *রবীন্দ্ররচনাবলী*, দ্বাদশ খন্ড. পৃ, ২৪৫.

১৮. *তদেব*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'তাসের দেশ', *রবীন্দ্ররচনাবলী*, দ্বাদশ খন্ড. পৃ, ২৪৬.

১৯. *তদেব*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'তাসের দেশ', *রবীন্দ্ররচনাবলী*, দ্বাদশ খন্ড. পৃ, ২৪৯.

২০. *তদেব*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'তাসের দেশ', *রবীন্দ্ররচনাবলী*, দ্বাদশ খন্ড. পৃ, ২৫০-৫১.

২১. *তদেব*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'তাসের দেশ', *রবীন্দ্ররচনাবলী*, দ্বাদশ খন্ড. পৃ, ২৫০.

২২. *তদেব*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'তাসের দেশ', *রবীন্দ্ররচনাবলী*, দ্বাদশ খন্ড. পৃ, ২৫৭.

২৩. Nihar Ranjan Ray, 'Symboilist Plays of Tagore, Homage to Rabindranath Tagore', (ed.), B. M. Chaudhuri, Kharagpur 1961. p, 53.

২৪. Abha Chatterjee & Tapati Dasgupta, ‘Unicommon Dreams in a Common Language : Three Plays by Tagore, ' *Linguistic Landscaping in India*', N.H. Itagi & Shailendra Kumar Singh,(ed.). Mysore, 2002. p, 210.

২৫. Tapati Dasgupta, *'SocialThought of Rabindranath Tagore : ‘A Historical Analysis*’. New Delhi. 1993. p, 59.

পাপিয়া গুপ্ত

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ভাবনায় ভারতবর্ষ

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘস্বরূপ এই প্রবন্ধটি তাঁর কিছু চিন্তাধারাকে উপস্থাপনের প্রচেষ্টামাত্র। আচার্য শীল ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞ মানুষ যার তুলনা তিনি স্বয়ং। কবিগুরু তাঁর থেকে তিন বছরের ছোট ব্রজেন্দ্রনাথের ৭২ তম জন্মদিনে যে কবিতা রচনা করেছিলেন সেখানে তাঁকে 'বন্ধু' বলেই জানান দিয়ে ছিলেন :

"মোরে তুমি জানো বন্ধু বলি
আমি কবি আনিলাম ভরি মোর ছন্দের অঞ্জলি
স্বদেশের আশীর্বাদ, বিদায়কালের অর্ঘ্য মোর,
বাহুতে বাঁধিনু তব আমার শ্রদ্ধার রাখীডোর"।

এই অকৃত্রিম বন্ধুত্ব, প্রীতি ও শ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটতে দেখা যায় ১৯৩৮ সালের ৩রা ডিসেম্বর আচার্যের মহাপ্রয়াণ দিবসের পরের দিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের লেখায় :

"I have lost an old friend for whom I always had a sincerest affection and regard".

এক

বিস্ময়কর পান্ডিত্যের অধিকারী ব্রজেন্দ্রনাথের জ্ঞানের যে কোন আঙিনায় ছিল অনায়াস স্বচ্ছন্দ বিচরণ–এ প্রসঙ্গে তাঁরই উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে : "বাল্যকাল হইতে আমার একটা ধারণা ছিল। জ্ঞানের প্রত্যেক শাখাই আমার চর্চার বিষয়। সেইজন্য জীবনে সকল

বিষয়ই আমার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে; অনেক বিষয়ের চর্চা করিয়া আনন্দ পাইয়াছি। জ্ঞানসেবার যে সুযোগ ও অধিকার পাইয়াছিলাম তাহাতেই আমি ধন্য ও পরিতৃপ্ত[১]।" তাঁকে বলা হতো "বিদ্যার জাহাজ, প্রকান্ড বিদ্যা-দিগগজ, সর্বাবিদ্যাবিশারদ-পন্ডিত-জ্যান্ত বিশ্বকোষ[২]।"

এক আশ্চর্য নিরহংকারী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন আচার্য শীল, যাঁর প্রতিটি চিন্তাধারায় ছিল স্বকীয়তার প্রকাশ। তাঁর গবেষণা, সিদ্ধান্ত তাঁর আলোচনার অংশীদার হয়ে বহু মানুষই নিজের নাম প্রকাশ করেছে — এই তথ্য জানা থাকলেও বিন্দুমাত্র ক্ষোভ ছিল না জ্ঞানতাপস মানুষটির অন্তরে। দার্শনিক মননে ঋদ্ধ আচার্য বিশ্বাস করতেন, সত্য কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় — সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি, সত্য নিজেই নিজেকে আবিষ্কার করে চলেছে- ব্যক্তি নিমিত্ত মাত্র।

আচার্য শীল তাঁর বিভিন্ন রচনায় ভারতবর্ষের স্বাতন্ত্র্য, তার বিশিষ্ট সভ্যতাকে তুলে ধরেছেন যা একদিকে যেমন মানবজীবনের কিছু আদর্শ প্রতিষ্ঠাকে সম্ভবপর করে তোলে, তেমনি বিশ্বমানবের বিকাশের ক্ষেত্রেও সহায়তা করে। যদিও তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, প্রকৃত সত্য হল বিশ্বমানবের অবস্থান বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে — তা এক অখন্ড তত্ত্ব—সব মানুষের মধ্যে তথা মনুষ্য সমাজের মধ্যে ইনি একই সংগে ব্যক্ত ও অব্যক্ত হয়ে রয়েছেন। প্রতিটি সমাজ বা সভ্যতাই এই বিশ্বমানবের বিকাশপ্রবাহে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর কিছু তরঙ্গ সৃষ্টি করেছে মাত্র —ভারতবর্ষও যেমন তার ব্যতিক্রম নয়, ইউরোপও তাই, উভয়েই বিশ্বমানবের অঙ্গ, তার বিশ্বলীলার সহচরমাত্র। ভারতের অবদান প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে প্রায় সমগ্র প্রাচ্য ও মধ্য এশিয়াখন্ডের বিশাল মানবসমাজ যে তত্ত্বজ্ঞানের শিক্ষা করেছে বা তাদের যে সামাজিক রীতি-নিয়ম তার মূল সূত্র বা তাৎপর্য্যের সন্ধান পাওয়া যায় ভারতবর্ষের তত্ত্ববিদ্যায় বা সমাজনীতিতে; এমনকি তাদের আদর্শগত সাধনার বীজও প্রোথিত আছে ভারতীয় ধর্মনীতি তথা ভারতীয় ধর্ম-সাধনায়।

দুই

প্রকৃতির সাথে মানুষের গভীর এবং নিবিড় সম্পর্ক প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গী আচার্য যেভাবে উপলব্ধি করেছেন ও প্রকাশ করেছেন—তার মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র যে তাঁর অনন্যসাধারণ পান্ডিত্যপূর্ণ মননের প্রকাশ ঘটেছ তা নয়, ভাষার উৎকর্ষতা লেখনীটিকে করে তুলেছে মহিমান্বিত। প্রকৃতির দিবারাত্র চক্রাকারে আবর্তনকে অপূর্ব সুষমামন্ডিত কাব্যিক ভাষায় ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন —প্রকৃতির ময়ূরকন্ঠী মর্য্যাদাময় রাজকীয়তা, তার নীলাভ অসীম ব্যাপ্তি, চন্দ্রালোকের ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণ এবং রাত্রির রহস্যময়তা সমস্তই একইরকম ভাবে নিয়মিত ব্যবধানে পুনঃপুনঃ সংঘটিত হতে থাকে কিন্তু মানুষ ছায়ামূর্ত্তির ন্যায় এই দৃশ্যগুলি দ্রুত অতিক্রম করে যায় — তার যে মৌলিক শক্তি, মনুষ্যত্বের

পবিত্র প্রতীক বা চিহ্ন তা সমস্তই বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে বা বিকীর্ণ হয়ে যায় –শূন্যতার মাঝে হারিয়ে যায়। বস্তুতঃ মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে এক বহিরাগত বা অনাহূত অতিথি[৩] শূন্যতার অনুভূতি যার আত্মাকে দগ্ধ করে চলেছে, তার ললাটলিখন নশ্বরতা –সে বিনাশশীলতায় দন্ডপ্রাপ্ত —মৃত্যুর যুপকাষ্ঠে বলিরূপে প্রদত্ত অসহায় মানুষ। বস্তুতঃ সমগ্র মনুষ্যজাতি-ই এই অনিবার্য্য অপ্রতিহত নিয়মনীতির তথা শৃঙ্খলার যজ্ঞবেদীতে সমর্পিত—প্রাকৃতিক কঠোর নিয়মে তার জীবনের পরিসমাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তার চিন্তা, মতবাদ অনন্তকাল ব্যাপী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তরূপে রয়ে যাবে এ ব্রহ্মান্ডে। অন্তহীন সম্ভাবনা, অসীম জগৎ এবং অগণিত ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির অস্পষ্ট আভাস প্রত্যক্ষায়িত হবে সূর্য্যের অতিবর্তি আলোয়, আত্মার নীরব শান্ত অন্তঃস্থল থেকে শোনা যাবে অস্ফুট ধ্বনি, মৃত্যুর অন্ধকার তাকে বারবার চঞ্চল করে তুলবে, তার ছায়া এই জগৎ তথা যাবতীয় জাগতিক বিষয়কে অতিক্রম করে যাবে। মৃত্যুর এই করুণ রস, রহস্যময়তা, সর্বোপরি পবিত্রতা তার মাথায় অলংকারের ন্যায় শোভিত হবে এবং তাকে এক মহৎ বেদনাময় প্রশান্তি দান করবে। বস্তুতঃপক্ষে মানুষ প্রকৃতির এই সম্পূর্ণ, তৃপ্ত জীবনচক্রের অর্ধভোক্তা অর্ধজ্ঞাতা অতৃপ্ত দর্শকমাত্র।

কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায় মানুষ এই যজ্ঞে প্রকৃতির অংশীদার হয়েছে। সে উপলব্ধি করেছে জীবন ও মৃত্যু একে অপরের পরিপূরক স্বরূপ। প্রকৃতির এই নবীকরণ তথা পুনর্জাগরণে তাই সে-ও সহকারীরূপে যোগদান করতে শুরু করে।[৪] ভারতবর্ষ মন্দিরময় হলেও তার বৈশিষ্ট্য এই যে, সে সেই পরম সত্য যিনি সর্বব্যাপী তার মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে নিজেকে অনুভব করেছে। ভারতবর্ষের মানুষ সেই নিরাকার অনন্তের মাঝে নিয়ত খুঁজে চলেছে আপন অস্তিত্ব—এখানেই ভারতবর্ষের নিজস্বতা, তার বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষের সংযমী, নৈতিক চরিত্রের ওপর আচার্য বারবার আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন এবং তাকে ভারতের জাতিগত বৈশিষ্ট্য বা racial characteristic রূপে উল্লেখ করে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, যে কোন জীবমাত্রই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশতঃ বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে এবং কাম রিপুর আকর্ষণ একজন ভারতীয় মানুষের কাছে শত্রুর আক্রমণের মতোই ভয়ংকর যা থেকে নিজেকে বাঁচানোর তাগিদ তার পক্ষে স্বাভাবিক ; এর জন্য তার কোন বিশেষ প্রযত্ন বা অনুশীলনের প্রয়োজন হয় না। আরো একটি কারণবশতঃ তারা প্রবৃত্তি দমন করতে চায় – তা হল জীবন্মুক্তি লাভের আকাংখা, যে জন্য তারা বাসনা বা প্রবৃত্তির বীভৎস, ভীষণ রূপ কল্পনা করে তাকে বর্জন করতে চেয়েছে। অর্থৎ ক্রমাগত যদি ঐ প্রবৃত্তিগুলির জঘন্য, ভয়ংকরতম রূপ মন কল্পনা করে তখন সে আপনা থেকেই বিষয়গুলি হতে ঘৃণায় দূরে সরে যায় এবং চিত্তবৃত্তি রক্ষা পায়। বস্তুতঃ দক্ষিণ ভারতে বহু দেবমন্দিরে যে কুরুচিকর চিত্র বা ভাস্কর্য্য দেখা যায় তার দ্বারা হিন্দুদের নৈতিক অবনতি বা অবক্ষয় প্রমাণিত হয় না, বরং তার উদ্দেশ্য সর্বতোভাবে নৈতিক ও ধর্মীয়।

তিন

স্বাজাত্য বা nationality হল ভারতবর্ষের এমন এক চিরন্তন ঐতিহ্য যার ভিত্তি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নয়। সে ঐতিহ্যকে প্রমাণ করার জন্য ভারতকে সাম্রাজ্যবাদের ব্রজা উড়িয়ে সামরিক শক্তির তান্ডবকে আশ্রয় করে অন্য দেশ দখলের চেষ্টা করতে হয়নি – এমনকি উপনিবেশ–ও স্থাপন করতে হয়নি। এই স্বাজাত্যের ধারণার যে অন্তর্নিহিত সত্যবোধ তাকে যেন আমরা কখনো ভুলে না যাই। স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধা, অনুরাগ থেকেই সর্বজনীন মানবতাবোধে উত্তরণ সম্ভব, কিন্তু তা যেন কখনোই মাত্রাকে অতিক্রম না করে বা অন্ধ আবেগের দ্বারা আচ্ছন্ন না হয় – তাহলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। এইখানেই আচার্য শীলের স্বাতন্ত্র্য যে তাঁর ভাবনায় ভারতবর্ষ তার সীমা, গন্ডি অতিক্রম করে বিশ্বচেতনার অংশ রূপে প্রতিভাত হয়েছে। এই স্বজাতি পক্ষপাতিত্বের প্রসঙ্গে তিনি আরো উল্লেখ করেন যে প্রতিটি জাতি-ই নিজেদের সভ্যতা বা সাধনাকে জগতের অন্য যে কোন দেশের সভ্যতা তথা সাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব'লে ভাবে ও গর্ব অনুভব করে। ইউরোপীয়রা যেমন আধুনিক সভ্যতার চূড়ান্ত সীমা স্পর্শ করার প্রচেষ্টার অহংকারে ইউরোপের বাইরের কোন প্রকৃত মানুষ বা সভ্যতার অস্তিত্ব সর্বতোভাবে অস্বীকার করে, তেমনি ভারতীয়রাও তাদের সনাতন সভ্যতা ও সাধনার প্রেক্ষিতে জগতের যাবতীয় সভ্যতা-সাধনাকেই হীনতর বলে ভাবে। অর্থাৎ পক্ষপাতিত্ব দোষে উভয়ই দুষ্ট আর তাই উভয়ের প্রাপ্ত সত্যই আংশিক, সমগ্র নয়। এই বিরোধীতার অবসানকল্পে আচার্যের বক্তব্য, এই পৃথিবীতে অগণিত ভিন্ন ভিন্ন জাতি যেমন আছে তেমনি তাদের জীবনযাত্রার প্রণালী বা পদ্ধতির ভিন্নতাও আছে। কিন্তু বিভিন্নতার মধ্যেও কোন এক জায়গায় একটি ঐক্যের সুর ব্রনিত হয় এবং তা হল জাতি হিসেবে এরা প্রত্যেকেই মানবজাতির অংশ–যদি এই বিবিধ জীবনশৈলী, মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার আদান–প্রদান ঘটে তবেই বিশ্বমাঝে গড়ে উঠবে বৃহৎ লীলাক্ষেত্র। এই পারস্পরিক দেয়া–নেয়ার বিষয়টিকে আচার্য তাঁর দার্শনিক ভাবনার আলোয় উদ্ভাসিত করে বলেছেন, সেই এক অদ্বিতীয় নিরাকার ব্রহ্ম যেহেতু প্রতিটি মানুষকে ঘিরে আছেন তাই আমরা প্রত্যেকেই অন্যের মধ্যবর্তী। আমরা সেই মহান ঐক্যের অভ্যন্তরে একে অপরের মাঝে লীন হয়ে রয়েছি। অন্যত্র অন্য বিষয় প্রসঙ্গেও তাঁর এই পরিণত প্রজ্ঞার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় যখন তিনি বলেন, "...আমরা ভূমার বুদ্বদ মাত্র। একটু বড় বুদ্বুদ, কেউ একটু ছোট। এই যা পার্থক্য"।[৫] ভারতের মধ্যে এই সমন্বয়ী ঐক্যসাধনের প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ করা যায়।

চার

ব্রজেন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন সারা পৃথিবী জুড়ে তৈরী হয়েছে হিংসা, দ্বন্দ্ব, কলুষতার বাতাবরণ—প্রত্যেক স্তরেই একটা ভাঙনের ভাব, বিদ্রোহের ভাব দেখা যাচ্ছে, যার লক্ষ্য কখনো প্রাচীন সভ্যতা, কখনো আচার অনুষ্ঠান, কখনো বা বিদ্যাবুদ্ধি। এ বিষয়ে আচার্য

শীল অত্যন্ত স্পষ্ট ধারণা পোষণ করেছেন যে আধুনিককালে যে বিষয়টির প্রভুত অভাব বিশ্বজুড়ে অনুভূত হচ্ছে তা হল আন্তর্জাতিক শান্তি – যার জন্য প্রয়োজন নবমানবতাবাদের ধর্মীয় অগ্রগতি। বস্তুতঃ এই অশান্তির অবসানে শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে মৈত্রী ও অহিংসার বাণী প্রচারক ভারতবর্ষের অবশ্যই একটি ভূমিকা আছে বা থাকা উচিত। ভারতের সনাতন ধর্ম তথা সাধনা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বিশ্বরূপ দর্শন করেছে এবং তার মধ্যে ব্রহ্মের ঐক্যকে অনুভব করেছে —এইভাবে সে শান্তির ভিত স্থাপনের চেষ্টায় ব্রতী হয়েছে। আচার্য শীল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন শুধুমাত্র কোন এক ব্যক্তি বা কোন এক বিশেষ জাতির জীবন বা তার ধর্মীয় ভাবনা তথা চিন্তাধারাকে মূল্য দিলে হবে না, 'mass এর life, mass এর religion' কেও গুরুত্ব দিতে হবে[৬]। মানবধর্মের নতুন রূপ বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন, এ হল আধুনিক সমাজধর্মের প্রস্থান বা starting point। প্রত্যেকের মধ্যে যে চেতনা, যে সম্পদ, যে অধিকার বর্তমান তাকে তার পূর্ণ মূল্য প্রদানই নবমানবধর্ম। ভারতবর্ষ যুগ যুগ ধরে এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করার সংকল্পে ব্রতী — সমগ্র বিশ্বকে সে এই বিশ্বমানবতার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে বদ্ধপরিকর। নবমানবধর্মের তিনটি প্রধান ভিত্তির উল্লেখ করে আচার্য বলেছেন :

> (১) অপূর্ণকে পূর্ণতর করার মধ্যেই আছে পূর্ণতাপ্রাপ্তি এবং তার মধ্য দিয়েই ঘটে আত্মার পূর্ণতাসাধন।
>
> (২) একমাত্র যদি পূর্ণতর নিজেকে উৎসর্গ করে বা আত্মবলিদান দেয়, তবেই অপূর্ণের জীবন প্রাপ্তি ঘটে, এবং
>
> (৩) শুধুমাত্র নিজে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেই আত্মপ্রতিষ্ঠা ঘটবে না – প্রয়োজন প্রতিটি মানুষের প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তি।[৭]

অর্থাৎ ব্যক্তিগত মুক্তি নয়, সর্বমুক্তির মধ্য দিয়েই মুক্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। প্রাচীন ভারতের ঋষির কন্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে সার্বিক পূর্ণতার তত্ত্ব, বিশ্ব –ঐক্যের তত্ত্ব।

> "ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
>
> পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।[৮]

অর্থাৎ "ওঁ তাহা (অর্থাৎ বিশ্বের অব্যক্ত বীজ) পূর্ণবস্তু। ইহা (অর্থাৎ ঐ বীজের ব্যক্ত আকার) পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণ উৎপন্ন হয়। এই পূর্ণ যখন ঐ পূর্ণেতে প্রত্যাগত হয় তখন পূর্ণই কেবল অবশিষ্ট থাকে।"[৯]

পাঁচ

ভারতবর্ষের দুর্বলতার দিকটিও আচার্য্যের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। ভারতবর্ষ অত্যন্ত পরিমাণে আবেগপ্রবণ বা emotional যা তার বৌদ্ধিক দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছে, সাথে মুক্তির মেলবন্ধন। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন; মানসিকভাবে হতে হবে সত্যনিষ্ঠ ও শৃঙ্খলাপরায়ণ যা আমাদের বুদ্ধিগত সততাকে জাগিয়ে তুলবে, আমাদের করে তুলবে কর্তব্যনিষ্ঠ। একই সংগে

নৈতিকভাবেও হ'তে হবে দায়িত্ববোধসম্পন্ন যার প্রকাশ ঘটবে ব্যক্তিগত জীবনেও। উদার মানসিকতার প্রতিমূর্ত্তি আচার্য শীল যেমন নিজেকে সমৃদ্ধশালী করে তোলার জন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের থেকে শিক্ষা আহরণে বিন্দুমাত্র দ্বিধান্বিত ছিলেন না, তেমনি সনাতন ভারত সভ্যতার একনিষ্ঠ সাধকরূপে ভারতীয় 'প্রাণ ও সৃজনীশক্তি' কে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করারও তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। তাঁর ভাষাতেই বলা যায় —"যা কিছু গ্রহণ করব তাকে ভারতের ছাঁচে ঢেলে নিতে হবে। আমাদের সৃজনীশক্তির দ্বারা তাদের 'Cointed into our flesh and blood' হয়ে যাওয়া চাই[১০]। অতএব, বিশ্বকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে হবে নতুবা নিজেকে পাওয়া যাবে না। তাই বিশ্বরূপ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের স্বকীয়তা, ভারতবর্ষের স্বাতন্ত্র্য এবং ভারতবাসী রূপে আমাদের আত্মপরিচয় লাভ সম্ভব হবে।

তথ্যসূচী :

১. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯৩১ "আচার্য শীলের প্রশ্নোত্তর", *প্রবাসী*, ১৯৩১.

২. তপন কুমার ঘোষ, (সম্পাদিত) ২০১৩. *বিনয় সরকারের বৈঠকে* (প্রথম ভাগ), বাংলা রচনা – ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, কলকাতা : পত্রলেখা.

৩. "Perpetuation of Historic Memories (Man's Association with Nature:The Peculiarity of Bharat Varsha)". *The Dawn*, Calcutta, November, 1902.

৪. *তদেব*.

৫. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯৩১. "আচার্য শীলের প্রশ্নোত্তর", *প্রবাসী*, ১৯৩১.

৬. বিশ্বভারতী পরিষদ সভার প্রতিষ্ঠা উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ, বিশ্বভারতী, ১৯৪৪.

৭. ''বর্তমান যুগের সেবাদর্শ সম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা'', *প্রবাসী*, ১৯১৪ (পঠিত).

৮. *বৃহদারণ্য ক উপনিষদ*, শান্তিবচন.

৯. "হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্বঃ" *নারায়ণ*, ১৯১৪ (আলাপন).

১০. "বিশ্বভারতী পরিষদ সভার প্রতিষ্ঠা উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ", বিশ্বভারতী, ১৯৪৪.

নিবেদিতা পাল

উনিশ শতকে ভারতীয় নারী ও চিকিৎসাবিদ্যা : আধুনিকতার এক সমুজ্জ্বল প্রতিফলন

উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত নারীর সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, দীর্ঘদিন ধরে সমাজ ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন না হওয়ায় নারীর সম্মান ও অধিকারের ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করা হয়নি। সমাজ পুরুষকে দিয়েছিল অবাধ অধিকার, কিন্তু নারীকে সবরকম অধিকার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করা থেকে বঞ্চিত রেখেছিল। বৃহত্তর সামাজিক আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে নারীর জীবন শুধু গৃহবন্দী হয়ে পড়ে।[১] উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে নারীর অবস্থান ও অধিকার সম্বন্ধে চেতনার উন্মেষ দেখা দেয় এবং সেই সময় থেকে এই সমাজের অধিকাংশের বিষয় ভাবনা শুরু হয়। জীবিকার জন্য নারী শতাব্দীর পর শতাব্দী পুরুষের ওপর নির্ভরশীল থেকেছে। বাল্য বিবাহ নিবারণ, বহু বিবাহ এবং সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ ও স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে নারীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়। সূতিকাগৃহে নারীর বেদনা প্রশমিত করা থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় নারীর অংশগ্রহণ ও মহিলা চিকিৎসক হিসেবে বহির্জগতে আত্মপ্রকাশ নারীর আধুনিকতা ও আত্মসম্মান লাভের সংগ্রামে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়।

প্রত্যেক সংসারে রোগ ও অসুস্থতা নিত্যকার বিষয়। রোগী পরিচর্যা সম্বন্ধে নারী পুরুষ উভয়ের দায়িত্বের কথা বলা হলেও সমাজ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করা উচিত বলে মনে করত। 'কারণ রমণী স্বভাবত দয়াবতী ও মধুভাষিণী; তাঁহাদের কোমল হস্তের শুশ্রুষায় রোগী যেমন আরাম পায়, পুরুষের স্বভাব কঠোর হস্তে

তাহা সম্ভবপর নহে'[২]। এই স্বাভাবিক গুণের জন্য শুশ্রুষাকার্য নারীদের দ্বারা সম্পন্ন করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু নারীর অসুস্থতাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হত না। কন্যা শিশুর জন্ম ছিল পরিবারের কাছে অপ্রার্থিত বা অবাঞ্ছিত। প্রসবের সময় নারীকে সূতিকাগৃহে অনেকরকম কষ্ট সহ্য করতে হত। এই প্রসঙ্গে *Daily Graphic* এর প্রতিনিধি Marry Frances Billington মনে করেছিলেন – 'In an Indian house, the women's quarters known as zenana or in colloquial Hindustani as bibighar are always architecturally and artistically its meanest part . Not only the women of the household, but friends and relations from far and wide would visit the mother crowding into the close room which is often kept at such a degree of heat that existence might be well-nigh unendurable. Observances are regarded not merely as sanitary, but as religious obligations.'[৩]

ব্রিটিশ শাসকগণ ঔপনিবেশিক প্রজাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে চিন্তিত ছিলেন না। তা সত্ত্বেও ভারতে পাশ্চাত্য চিকিৎসার প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক পরিকাঠামো ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রই নির্মাণ করেছিল। উনিশ শতকের প্রথম পর্যায়ে রাষ্ট্রের পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিস্তারের মূল লক্ষ্য ছিল ইংরেজ সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্য রক্ষা করা। রাধিকা রামাসুব্রান মনে করেন যে উনিশ শতকে পাশ্চাত্য চিকিৎসা শ্বেতাঙ্গদের মধ্যেই সীমিত ছিল। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অনেক সৈন্য যৌনরোগে আক্রান্ত হলে সরকার তাদের স্বাস্থ্যের জন্য চিন্তিত হয়, কারণ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মূল স্তম্ভ ছিল সেনাবাহিনী। ইউরোপীয় সেনাদের পরিবার তাদের সাথে ভারতে না থাকায় ইউরোপীয় সেনাগণ পতিতা পল্লীতে যাতায়াত করত এবং তারা যৌনরোগে আক্রান্ত হত। তাই সাম্রাজ্যের সামরিক স্বার্থে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় পতিতা মহিলাদের চিকিৎসার সুবিধা দেওয়ার জন্য প্রথম অগ্রসর হয়েছিল। এর ফলশ্রুতি হিসেবে সামরিক ছাউনিতে বা cantonment areas এ 'lock hospital' ব্যবস্থা শুরু করা হয় পতিতাদের যৌনরোগের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে। লন্ডনে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে এই নামে হাসপাতাল প্রচলিত ছিল।"In the nineteenth century it was accepted that veneral diseased patients would be locked up until they were cured and it was invariably understood that these patients would be women prostitutes. Women found to be disordered on customary days of inspection were to be sent at once to the hospital."[৪] সেনাবাহিনীর ছাউনির কাছাকাছি 'লালবাজার' বা যৌনপল্লী থাকত। লালবাজারের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে যে বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলা থাকত, তার কর্তব্য ছিল পতিতাদের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া এবং যৌনরোগে আক্রান্ত পতিতাদের বহিষ্কৃত করা বা 'লক হাসপাতালে' চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করা। সরকার বেরহামপুর,

কানপুর, ফতেগড়, আগ্রা প্রভৃতি জায়গায় diseased public women দের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল নির্মাণ করে। সরকার ভারতে ইউরোপীয় সেনাদের পরিবার রক্ষার জন্য অধিক অর্থ খরচে অনিচ্ছুক ছিল। তাই ভারতীয় পতিতাদের সাথে ইউরোপীয় সৈন্যদের যৌন সম্পর্ক তারা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেছিল। ১৮৬৮ সালের Indian Contagious Disease Act দ্বারা পতিতাদের নাম নথিভুক্ত করা, নিয়মিত ব্যবধানে পতিতাদের শারীরিক পরীক্ষা এবং বাধ্যতামূলক চিকিৎসা করানোর কথা বলা হয়েছিল। ফলে এই 'লক হাসপাতালে' ব্রিটিশের খাতায় নথিভুক্ত বেশ্যা মহিলারা প্রথম চিকিৎসার সুযোগ লাভ করেছিল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার ছিল পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা।"The Colonial establishment took it up as a part of its imperial credo, and the missionaries incorporated it into their evangelizing project while the critics of empire identified western medicine not with liberation and well being but with subjugation and salavery"[৫] ঊনবিংশ শতকের প্রথামার্ধে পুরুষ শাসিত শাসনব্যবস্থায় ঔষধ এবং স্বাস্থ্য ছিল পুরুষকেন্দ্রিক এবং মহিলারা পুরুষের স্বাস্থ্যের সাথে সংযুক্ত বস্তু বা 'appendages to the health of man' বলে পরিগণিত হত। একই সময়ে ইংল্যান্ডের মহিলারা ধাত্রীদের দ্বারা সন্তান প্রসবের সুবিধা লাভ করতেন এবং চিকিৎসাবৃত্তি ধাত্রীবিদ্যাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করেছিল। ১৮৩৩ সাল থেকে প্রসূতি ও নারীর শরীর সংক্রান্ত 'Books of Advice' প্রকাশিত হতে থাকে। নারীদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসার প্রগতি ঘটে যখন ১৮৪৭ সালে 'ক্লোরোফর্ম' আবিষ্কৃত হয়, যা প্রসবের বেদনাকে অনেকাংশে লাঘব করে দিয়েছিল। উনিশ শতকের অগ্রগতির সাথে সাথে ভারতের প্রথাগত প্রসূতি প্রথা এবং মায়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় ধারণা সমালোচিত হতে থাকে। সূতিকা গৃহে অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় সন্তান প্রসব এবং মাকে অবজ্ঞার সাথে ফেলে রাখা হয়। আঁতুড়ঘরের অবস্থার জন্যই মাতা এবং শিশুর মৃত্যুর হার ভারতে অনেক বেশী পরিমাণে দেখা যায়। ধাইয়ের সাহায্যে শিশু প্রসব করানো ছিল প্রসুতির প্রথা। ধাই বৃত্তিতে যুক্ত রমণীরা ছিল নীচু জাতের হিন্দু বা গরীব মুসলমান মহিলাগণ। বাংলায় হাড়ি বা ডোম, উত্তর ভারতে চামার বা মেথরানি এবং দক্ষিণে নাপিত জাতির অন্তর্ভূক্ত ছিল ধাই মহিলারা, এবং তাদের মধ্যে পেশাদারিত্বের অভাব ছিল লক্ষ্যণীয়। স্বল্প অর্থের বিনিময়ে ধাই সন্তান প্রসব ও আঁতুড়ঘরে মা ও সন্তানকে দেখাশোনা করত। পরিশ্রম, পরিচ্ছন্নতা তার কাছে অজানা ছিল। কিন্তু অশিক্ষা ও অজ্ঞতার ফলে মা ও সন্তানের স্বাস্থ্য বিপদগ্রস্ত হত।

ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ঔপনিবেশিক প্রজাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আগ্রহী ছিল না, অপরদিকে ব্রিটিশ বা ভারতীয় পুরুষগণ জন্ম প্রক্রিয়া সম্বন্ধে নিরুৎসাহ ছিল। প্রথমে মিশনারী মহিলারাই এই প্রসূতি প্রথার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। বালফোর এবং ইয়ং বলেছেন যে "The stimulus

for the first dhai training schemes was provided by those missionaries who had gained access beyond the purdah as teachers and were grieved to see their young pupils dying in child birth."[৬] জেনানা মহল ছিল তাদের দৃষ্টিতে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, আবর্জনা ও ব্যাধির কেন্দ্রস্থল। দেশীয় মহিলাদের ঔপনিবেশিক চিকিৎসার সাথে যুক্ত করার একটি উপায় ছিল প্রথাগত ধাই ব্যবস্থার সংস্কারসাধন।[৭] এই প্রসঙ্গে ১৮৯০ সালে মেরি ফ্রান্সিস বিলিংটন লিখেছিলেন যে "The infant mortality is very high not on account of evil intent but is due to the apalling ignorance of the dhais whose method of treatment are barbarous and would be enough to kill every unfortunate victim upon whom they practised" .[৮] Margaret Balfour এবং Ruth Young আরো বলেছেন যে পর্দানসীন রমণীগণ কখনই পুরুষ ডাক্তারদের দ্বারা চিকিৎসা করাতেন না বা সন্তান জন্মের বিষয়ে পুরুষ সাহায্য তাদের কাছে কাঙ্খিত ছিল না।[৯]

১৮৬০ থেকে ইংল্যান্ড এবং আমেরিকা থেকে মহিলা মিশনারীরা ভারতে এসে হাসপাতাল, চিকিৎসা কেন্দ্র এবং ধাত্রী মহিলা ও আয়াদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেন। বলা যেতে পারে মিশনারী মহিলারা ভারতে আসার আগে সরকারী কর্তৃপক্ষ প্রসবের বিষয়ে আগ্রহী ছিল না। ১৮৫৭ সালের পরে মিশনারী মহিলাদের ভারতে আগমন বৃদ্ধি পায়। অন্তঃপুরে মহিলারা প্রবেশ করতে পারতেন এবং তাঁরা প্রসূতির সময় ভারতীয় নারীদের দুর্দশা দেখে মর্মাহত হয়েছিলেন। ১৮৬৯ সালে আমেরিকার Methodist Episcopal Church এর Women's Foreign Missionary Society র সদস্য Miss Clara Swain ভারতে আসেন। এক দশক পরে ইংল্যান্ডের Zenana Missionary Society, Miss Fanny Butler কে ভারতে পাঠান। স্বল্প হলেও কিছু ভারতীয়দের প্রসূতিকালে চিকিৎসার সুবিধা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বোঝাতে তিনি সফল হন। তাঁদের প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত হয় ভাইসরয়দের পত্নীদের প্রচেষ্টা। "Viceroy's wives seemed to feel obliged to raise funds to improve the position of women in India."[১০] Miss Beilby ১৮৭৫ সালে মিশনারী কাজে লক্ষ্ণৌ আসেন। বুন্দেলখন্ডের একটি রাজ্য পুন্নার রাণীকে তিনি চিকিৎসা করেন। মহারাণী তাঁকে অনুরোধ করেন যে তিনি ইংল্যান্ডে প্রত্যাগমন করে ভারতীয় মহিলাদের ক্লেশভোগ হ্রাস করার জন্য সকল প্রয়াসের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করছেন। ১৮৮৩ সালে লেডি ডাফরিন ভারতে আসার সময় মহারাণী তাঁকে ভারতীয় মহিলাদের চিকিৎসার জন্য কিছু পরিকল্পনা গ্রহণের নির্দেশ দেন। ভারতে আসার পর লেডি ডাফরিন অন্যান্য গভর্ণর পত্নীদের এ বিষয়ে সমর্থন লাভের পর ১৮৮৫ সালে "The National Association for Supplying Female Medical Aid" or "Dufferin Fund" গঠন করেন ভারতীয় মহিলাদের জন্য। এই ফান্ডের উদ্দেশ্য ছিল ডাক্তারদের, হাসপাতালের

সহকারীদের, নার্স ও ধাত্রীদের চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষাদান করা : চিকিৎসাকেন্দ্র, মহিলা বিভাগ, মহিলা চিকিৎসক, মহিলা হাসপাতালের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শুশ্রুষার ব্যবস্থা করা এবং ধাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।[১১]

শিক্ষিত ভারতীয় পুরুষগণও ভারতীয় মহিলাদের জন্য পুরনো ধাই ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ধাত্রীদের প্রতি আস্থাজ্ঞাপন করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকারও ধীরে ধীরে চিকিৎসা শিক্ষা, চিকিৎসা পরিষেবা ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে। জেমস মিল একদা বলেছিলেন যে, যেই দেশের অর্ধেকাংশ অশিক্ষিত ও অবহেলিত, সেই দেশকে সভ্য বলা অযৌক্তিক। ভারতে হিন্দুদের দেখলে সেই ধারণা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় পুরুষেরা এই দোষারোপ খন্ডন করা ও দেশের নারীর অবস্থার প্রতি সহানুভূতি থেকে নারীশিক্ষা ও ধীরে ধীরে নারীর স্বাস্থ্যের প্রতি সচেতন হয়ে ওঠেন। শিক্ষিত অভিজাত ও ব্রাহ্মসমাজের অনেক পুরুষ সদস্যরা ধাত্রীবিদ্যার সুবিধা লাভে তৎপর হন। ব্রাহ্ম ম্যাগাজিনে পাশ্চাত্য চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখা হত। শিশু মৃত্যুহার খুব অধিক হ্রাস না পেলেও ভদ্রমহিলারা প্রসূতির যন্ত্রণা হ্রাস করার জন্য নতুন ধাত্রীবিদ্যার সুবিধা লাভে তৎপর হন। ১৮৭০ সালে 'The Calcutta Medical College' এবং ঢাকাতে 'The Mitford Hospital' এ ধাত্রীবিদ্যার পাঠ্যসূচী শুরু করা হয়। মহিলাদের আধুনিক চিকিৎসা সম্বন্ধে অবহিত করার উদ্দেশ্যে ১৮৫৭ সালে 'মাতা ও শিশু যত্নের' ওপর সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা 'শিশু পালন' নামে প্রকাশিত হতে থাকে। ''Books on medical care, hygiene and simple midwifery written specially for women, were printed ranging from 500 to 2000 copies and often went into many editions.''[১২]

ধাত্রীবিদ্যায় প্রশিক্ষণ ও লাইসেন্স দেওয়ার দাবী করা হলেও এই ব্যবস্থাটি বাস্তবায়িত করতে অনেক সময় অতিবাহিত হয়েছিল। ধীরে ধীরে মিশনারী প্রচেষ্টা বিলুপ্ত হয়, যদিও নতুন হসপিটালগুলিতে প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত পরিমাণ ধাত্রীদের প্রশিক্ষণ দিতে অসফল ছিল। প্রথম দিকে ধাইদের শিশুজন্মের পাশ্চাত্য পদ্ধতির সাথে পরিচিত করে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু প্রথাগত ধাইরা এর বিরোধিতা করে কারণ হাসপাতালে গিয়ে প্রশিক্ষণ লাভের জন্য তারা টাকা পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তাছাড়া পাশ্চাত্য উপায়ে প্রসূতিকে তারা তাদের কার্যপদ্ধতির বিরোধী বলে মনে করে। অনেক ধাত্রীবিদ্যা পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় ইংরেজী ভাষার সঙ্গে পরিচিত ছিল না। ফলে ডাফরিন ফান্ড ''decied to create a class of nurses and midwives who would in time supplant the dhais, or by successfully competing with them, force them to seek instructions offered to them.'' এই প্রসঙ্গে বালফোর বলেছেন যে ধাইরা তাদের কাজ ও জনপ্রিয়তা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় প্রশিক্ষণ নিতে অরাজী ছিল এবং ভারতীয়

মহিলাদের মন তারা ইউরোপীয় ধাত্রীবিদ্যার সম্পর্কে অবিশ্বাস ও ভুল কথা দ্বারা প্রভাবিত করার চেষ্টা করত।[১৩]

১৮৭৩ সালে পন্ডিত মধুসূদন গুপ্ত কলকাতা মেডিকেল কলেজ দ্বারা একটি ধাত্রীবিদ্যার কর্মসূচী সমর্থনের কথা সুপারিশ করেন। তাঁর সুপারিশ অনুযায়ী কলকাতা মেডিকেল কলেজ ১৮৪০ সালে ধাত্রীবিদ্যার হাসপাতাল শুরু করে। হাসপাতালে চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্রদের আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ১৮৪৮ সালে Midwifery Hospital এর রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, তাদের স্নাতক ছাত্ররা 'অভিজাত নেটিভ'দের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন কারণ ভারতীয়রা তাদের মহিলা ও শিশুদের আর অবহেলায় ফেলে রাখতে ইচ্ছুক নয়। ঢাকার Mitford Hospital, অমৃতসরে Church of England Zenana Missionary Society র তত্ত্বাবধানে প্রচলিত 'Amritsar Dais School' এর নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলার তুলনায় মাদ্রাজ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু অঞ্চলে ধাত্রীবিদ্যা প্রশিক্ষণ বেশি সফল হয়েছিল। প্রশিক্ষণে প্রাত্যহিক উপস্থিতি সম্ভব না হওয়ায় ও ইংরেজী না জানার ফলে পেশাদারী ধাইরা ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা লাভ থেকে বিরত থাকত। পরিবর্তে এই পাঠ্যক্রমে প্রধানতঃ ভারতীয় খ্রীষ্টান, ইউরেশিয়ান ও কিছু ইউরোপীয় এবং কখনো হিন্দু, মুসলমান বা ব্রাহ্ম মহিলাগণ ধাত্রীবিদ্যায় প্রশিক্ষণ লাভে এগিয়ে আসেন।[১৪]

কিন্তু ইউরোপীয় পদ্ধতিতে পাশ্চাত্য ধাত্রীবিদ্যার শিক্ষালাভ কতগুলি সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়েছিল। এই কার্যক্রমের জন্য পর্যাপ্ত ছাত্রী পাওয়া মুশকিল ছিল। দেশীয় ধাইরা ক্লাসে নাম নথিভুক্ত করলেও তাদের পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিক্ষিত করা সহজ ছিল না। বৃত্তি প্রদান বা ঘুষের লোভ দেখিয়েও তাদের শিক্ষা দেওয়া দুষ্কর ছিল : অনেক ক্ষেত্রে তারা পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যার উৎকৃষ্টতা মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রশিক্ষিত ডাক্তারেরাও তাদের সাথে সহযোগিতা করতে তৈরী ছিলেন না। ১৯০১ সালে লেডি কার্জন জেনানা মহলে পরিষেবা দেওয়ার জন্য ধাইদের পুনরায় প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে Victoria Memorial Scholarship Fund এর ব্যবস্থা করেন। কিছু ধাত্রী সরকারী হাসপাতালে Matron পেশায় যুক্ত হয়। ধাত্রীরা পুরুষ ডাক্তারদের সন্তান প্রসবে সাহায্য করলেও পুরুষ ডাক্তারই সফল প্রসূতির জন্য প্রশংসা ও সম্মান লাভ করতেন। সাধারণ পরিবার প্রথাগত ধাইদের দ্বারাই প্রসূতির কাজ সম্পন্ন করত। পুরনো প্রসূতি পদ্ধতির সমালোচনা করা হলেও প্রথাগত ধাইদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রয়াসের অভাব দেখা যায়। ব্রাহ্মরা সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে ধাত্রীদের প্রয়োজনের কথা বললেও ভারতীয় সকল শিক্ষিত সম্প্রদায় একই অভিমত পোষন করেনি। অনেক শিক্ষিত পরিবারে অন্তঃপুরের ইচ্ছানুযায়ী চিরাচরিত উপায়ে সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা করা হত। অন্যেরা দুটি ব্যবস্থা একত্রিত করে পুরুষ চিকিৎসকদেরকেই সূতিকাগৃহে আহ্বান জানাত।[১৫] কিন্তু ধীরে ধীরে শহর ও

জেলা সরকারী হাসপাতালে এবং চিকিৎসালয়ে ধাত্রীদের প্রয়োজনীয়তা ও 'বিপদজ্জনক ধাই' দের শিশু ও মাতৃমৃত্যুর জন্য দায়ী করার ফলে আধুনিক ধাত্রীবিদ্যায় শিক্ষার জন্য নতুন নতুন প্রকল্পের প্রস্তাবনা করা হয়েছিল। ধাত্রীরাই ধাইদের বিকল্প হিসেবে প্রসূতির ক্ষেত্রে স্থান তৈরী করে নিয়েছিল।

১৮৫৬ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজে প্রাণীবিদ্যা, শরীরবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা রসায়নবিদ্যা, ব্যবহারিক ঔষধবিজ্ঞান, ধাত্রীবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, শল্য চিকিৎসা প্রভৃতি পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা ছিল। ছাত্রদের চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হত– প্রাথমিক শ্রেণী, শিক্ষানবিশ শ্রেণী ও বাঙালী শ্রেণী। প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রদের ইংরেজীর পাঁচ বছরের পাঠক্রম পূরণের পর 'Licence in Medicine and Surgery (LMS)', 'The Bachlor of Medicine (MB), এবং The Doctorate of Medicine' (MD) পরীক্ষার জন্য বসার যোগ্য বলে মনে করা হত।[১৬] বোম্বাই, মাদ্রাজ, আমেদাবাদ ও আগ্রা প্রভৃতি শহরে চিকিৎসা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। মহিলারা শিক্ষা লাভ করে বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা হিসেবে নিযুক্ত হলেও চিকিৎসাবিদ্যায় মহিলাদের প্রবেশ ঘটেছে বহু পরে। সাধারণ শিক্ষার বা General Education এর একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হল পেশাদারি শিক্ষা বা Professional Education.[১৭] Profession বা পেশাদারিত্ব কথাটির অর্থ হল "an occupation exhibiting professional attributes such as autonomy in terms of situation, a communiy oriented code of ethic and the period of training and higher prestige and status associated with it."[১৮] মহিলাদের বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হলে সেটা তাদের সম্মানের উন্নতির পরিচায়ক। মহিলাদের জীবন ও সম্মানের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা domestic এবং public শব্দ দুটির ব্যবহার করে থাকেন। কারো মতে দুটি জগৎ পুরোপুরি ভিন্ন। আবার কেউ কেউ মনে করেন দুটি জগৎ পরস্পরের সাথে যুক্ত এবং একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। মহিলারা চাকরিতে নিযুক্ত হওয়ার পাশাপাশি মহিলাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করার কথা চিন্তা করা হয়। "A nunber of bhadramahila were begining to face the problem of finding ways to lessen the total dependence on men that left women helpless if they fell on hard times."[১৯]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মহিলা চিকিৎসকদের প্রয়োজনীয়তার বিষয় সকলে একমত ছিল না। একটি রক্ষণশীল পত্রিকায় বলা হয় যে, মহিলা চিকিৎসকদের অভাবে মহিলারা অসহায়ভাবে মারা যাচ্ছে না। মহিলাদের সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে যা সম্ভব ছিল না যদি চিকিৎসার অভাবে মহিলাদের মৃত্যু ঘটত। অপরদিকে মহিলা চিকিৎসকদের দাবীতে লেখা হয় যে, "We know of several instances in orthodox hindu families, where the

female members suffer from most complicated diseases, but yet would not allow male doctors to visit and treat them. The consequence is they are treated second hand through the assistance of uneducated quack native midwives and in ninety nine cases out of hundred, they are never radically cured.”[২০]

ইংল্যান্ডে ১৮৭৭ সাল থেকে মহিলারা চিকিৎসাবিদ্যায় ডিগ্রী লাভ করতে পারতেন। বাংলায় নীচু জাতির মহিলারা ধাই এবং কোন কোন মহিলা কবিরাজী হতে পারতেন কিন্তু মহিলাদের চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষালাভের বিষয় নিয়ে আপত্তি ছিল। বাংলায় মেয়েদের ডাক্তারি পড়ার সময় ‘স্ত্রীলোক কেন ডাক্তারি পড়বে না’ এবং ‘কেন পড়বে,’ এ প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়। ‘স্ত্রীলোক কেন ডাক্তারি পড়বে না’- এ প্রসঙ্গে বলা হয় যে ডাক্তারি পড়তে হলে ছাত্রদের রাত্রিবাস করতে হয় একঘরে, কিন্তু স্ত্রীলোক কীভাবে পুরুষের সাথে একসাথে থাকবে; পুরুষ শিক্ষক ছাত্রীদের কীভাবে বোঝাবে; ছাত্র–ছাত্রী একসাথে কীভাবে শিক্ষালাভ করবে প্রভৃতি। অপরদিকে ‘স্ত্রীলোক কেন ডাক্তারি পড়বে’- এ বিষয়ে বলা হয় যে স্ত্রীরোগ চিকিৎসার জন্য স্ত্রীচিকিৎসকই প্রয়োজনীয়। যেখানে মহিলাকুল পর্দার অন্তরালে বহিরাগত পুরুষের থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখে, সেখানে মহিলা চিকিৎসক বেশি দরকারী। স্ত্রী চিকিৎসক দ্বারা ব্যাধির নিবারণ হলে পারিবারিক চিকিৎসা উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা হতে পারবে এবং স্ত্রীলোকের অর্থোপার্জনের প্রকৃষ্ট পথ তৈরী হবে।[২১] গভর্নমেন্ট নারীদের ডাক্তারি পড়ার ব্যবস্থা করেছে, অতএব সেই সুযোগ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

সময়ের সাথে ইংল্যান্ড এবং ভারতীয় জনমত উপলব্ধি করেছিল যে, ভারতীয় রমণীদের জন্য মহিলা চিকিৎসক প্রয়োজনীয়। ব্রিটিশ মহিলা ডাক্তার Frances Hoggan মতামত প্রকাশ করেন যে, ভারতীয় চিকিৎসা পরিষেবা বা Indian Medical Service ভারতীয় মহিলাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে এবং মহিলা চিকিৎসকরাই তাদের রোগিনীদের স্বার্থ রক্ষা করতে সক্ষম হবে। ঔপনিবেশিক সরকার চিরাচরিত ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থায় মহিলা চিকিৎসকদের পরিষেবা ব্যবহারে অসফল হয়েছে যদিও অনেক ভারতীয় মহিলা তাদের ওপর চিকিৎসার জন্য নির্ভরশীল ছিল।[২২] ডাঃ হোগানের মতে ভারতীয় নারীদের পুরুষ চিকিৎসকদের দ্বারা চিকিৎসা না করানোকে কুসংস্কার হিসেবে দেখা অনুচিত। তাঁর এই চিন্তাকে শ্রদ্ধা করা উচিত। তাই সরকার দু’ ধরনের মহিলা চিকিৎসদের প্রশিক্ষণ দিক – একদল দেশের মহিলাদের চিকিৎসা করবে এবং বেশি অভিজাত মহিলা চিকিৎসকরা বড় বড় শহরে শিক্ষা প্রদান ও চিকিৎসাচর্চা করবে। George A. Kittiredge নামে বোম্বাইতে অবস্থানরত এক আমেরিকান ব্যবসায়ী ডাক্তার হোগানের আবেদনে প্রভাবিত হন। ‘Medical Women’s Fund’ মহিলাদের চিকিৎসা

শাস্ত্রে শিক্ষা লাভের জন্য তৈরী করা হয়। তিনি তাঁর পার্সি বন্ধুর সাহায্য লাভ করেন এবং Pestonji Hormusji Cama নারী ও শিশুদের হাসপাতাল নির্মাণের জন্য দেড় লক্ষ টাকা দান করেন। ১৮৮৬ সালে 'Cama Hospital' শুরু হয়।

ডাফরিন ফান্ডের লক্ষ্য ছিল 'to bring medical knowldge and medical relief to the women of India by providing women medical workers.' কার্যবিবরণীতে বলা হয় যে এই ফান্ডের মাধ্যমে মহিলাদের চিকিৎসক এবং ধাত্রীবিদ্যায় শিক্ষিত করা হবে, মহিলাদের তত্ত্বাবধানে হাসপাতাল ও চিকিৎসালয় খোলা হবে, ভারতীয় মহিলাদের যন্ত্রণার লাঘব করা হবে এবং মহিলা রোগী ও শিশুদের যত্ন শুশ্রুষার জন্য ধাত্রী ও আয়ার ব্যবস্থা করা হবে।[২৩] ভিক্টোরিয়া ছিলেন এই ফান্ডের পৃষ্ঠপোষক এবং ভারতে এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ভাইসরয় ডাফরিন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় অভিজাতগণ এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানান। তাঁরাও মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্র গঠনে অর্থ প্রদান করেছিলেন। বাংলায় রামকমল সেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর বা মতিলাল শীলের মত ব্যক্তিগণ মনে করতেন যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও চিকিৎসা আধুনিকতারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী ব্রিটিশদের দ্বারা আরোপিত ভারতীয় পুরুষদের মহিলাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদাসীনতার অভিযোগের উত্তর দেওয়ার জন্য মহিলাদের শিক্ষা ও চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষিত হওয়াকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। "There was also an urge to create a compatriot wife who would bring about discipline, order and hygienic practices in middle class home."[২৪] ১৮৮৩ সালে 'Brahmo Public Opinion' এ বলা হল যে, ভারতে মহিলা চিকিৎসকের আবশ্যকতা, পরিপূর্ণভাবে অনুভব করা যাচ্ছে। পর্দা ব্যবস্থার ফলে অনেক মহিলা বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করছে। বামাবোধিনী পত্রিকায় লেখা হয়েছিল যে পুরুষদের মত নারীদেরও চিকিৎসা শাস্ত্রে শিক্ষিত হওয়া আবশ্যিক। মহিলা রোগ পুরুষ চিকিৎসক নয়, একমাত্র মহিলা চিকিৎসকেরাই বুঝতে পারবেন ও চিকিৎসা করতে পারবেন।

কোন ডিগ্রী ছাড়া ১৮৭০ সালের পূর্বে কিছু মিশনারী মহিলা ভারতে চিকিৎসাবিদ্যা চর্চ্চা করতেন। Dr. Clara Swain এবং Dr. Fanny Butler ছিলেন ডাক্তারি পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ ভারতের প্রথম মিশনারী মহিলা চিকিৎসক। ভারতে বিদেশী মহিলা চিকিৎসকদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ব্রিটিশ নারীদের জন্য ইংল্যান্ডের চিকিৎসা বিদ্যালয়ের দ্বার খুলে দেওয়া হয়। দেশে চিকিৎসা চর্চার সুযোগ না লাভ করলেও ভারতের মাটিতে বিদেশী মহিলা চিকিৎসকগণ সেই সুযোগ লাভ করেন। ব্রিটিশ সরকার এই মহিলাদের সাহায্যে ব্রিটিশ সরকারের মানবিক মুখ এবং ভারতীয় নারীদের প্রয়োজনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিল।[২৫] ভারতে কলকাতা মেডিকেল কলেজের আগেই মাদ্রাজ

মেডিকেল কলেজে মেয়েরা চিকিৎসাবিদ্যা লাভের অনুমতি পায়। অবলা দাস ও এলেন দাব্রুর মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন যেখান থেকে তারা সার্টিফিকেট ডিগ্রী লাভ করেন।[২৬] মেডিকেল কলেজের কাউন্সিল এবং মেডিকেল বিজ্ঞানের শাখা মেয়েদের চিকিৎসাবিদ্যা অর্জনের বিরোধিতা করে। নারীদের তারা নার্স ও ধাত্রী হিসেবেই দেখতে চেয়েছিলেন। মহিলাদের জন্য মহিলা চিকিৎসকের প্রয়োজনীয়তা নেই বলে তারা মনে করতেন। তাদের মতানুযায়ী যে সকল মহিলা প্রশিক্ষণ নিতে আসবে তারা পুরো শিক্ষা সমাপ্ত করতে না পেরে অর্ধশিক্ষিত হবে এবং চিকিৎসাবিদ্যাকে কলঙ্কিত করবে। সরকারকে মহিলা চিকিৎসক তৈরী করতে হলে আলাদা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে, কিন্তু অনেক ভারতীয় পুরুষ এই মতের বিরোধিতা করে জানান যে তাদের পরিবারের জন্য মহিলা চিকিৎসক আবশ্যক এবং তাদের কন্যারা চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষালাভে আগ্রহী। তারা সরকারের সাথে একজোট হয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজের দ্বার নারীদের জন্য উন্মুক্ত করতে চান।

মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়বার জন্য স্নাতক হওয়া আবশ্যিক ছিল। নিয়ম ছিল যে কোন ব্যক্তি বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিনা বেতনে মেডিকেল কলেজে পড়তে পারবেন। যে কোন ব্যক্তি (এনি পারসন) পুরুষ বা নারী উভয়কেই ইঙ্গিত করে। ফলে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ১৮৮৬ সালে বেথুন কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে এই নিয়মের সুযোগে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৮৮৬ সালে তিনি Bachelor of Medicine ডিগ্রীর বদলে Graduate of Bengal Medical College উপাধি লাভ করেন। ভারতের প্রথম মহিলা ডাক্তার ছিলেন মহারাষ্ট্রের আনন্দীবাই জোশী। ১৮৯০ সালে বিধুমুখী বসু ও ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট ডিগ্রী লাভ করেন। ১৮৮৫ সালের মধ্যে চৌত্রিশজন মহিলা মেডিকেল কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। এদের মধ্যে একশজন মহিলাকে ডাফরিন হাসপাতালগুলিতে চাকরি প্রদান করা হয়। কিন্তু অনেক সময় চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে হাসপাতালগুলি দেশীয় মহিলা ডাক্তারদের প্রতি শোষণ ও বৈষম্যমূলক আচরণ প্রদর্শন করত। ডাফরিন ফান্ড ইউরোপীয় এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ান চিকিৎসকদের বেশি অগ্রাধিকার দিত। কাদম্বিনী এ বিষয়ে অভিযোগ করেছেন যে–

> Hospitals exist for two purposes – the treatment of the sick, poor and the education of the medical profession and that the performance of the hospital duties quietly improved the qualification of a doctor. The Indian medical women will miss all the advantages of such professional duties by their exclusion from the medical charge of important hospitals or by being placed in an inferior position, for in the inferior class of hospitals, few cases of importances will ever come for treatment. No opportunity

> has yet been offered to Indian medical women to show whether they are capable of taking the responsible charge of large and important hospitals.[২৭]

ডাফ্‌হাসাপাতাল বা ডিসপেনসারি জেলায় শুরু হলে মহিলাদের হাসপাতালে নিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সেজন্য তাদের কম বেতন গ্রহণ করতে হবে। তা সত্ত্বেও অনেক মহিলা স্নাতক এই চাকরিতে যোগদান করেন। "Clearly Indian women continued to be disadvantaged in a system that placed men above women, foreign credentials above those earned in India." অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয় যখন ১৯০৭ সালে নারীদের চিকিৎসা পরিষেবা বা Womens Medical Service এর জন্য তৎপর হয়। ডাক্তারি পড়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় ভাষার থেকে ইংরেজীকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হত। জেরাল্ডিন ফর্বস এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে মেডিকেল কলেজে মহিলাদের প্রবেশের ব্যবস্থা করে সরকার নারীদের চিকিৎসার সুবিধার জন্য জাতি বা race এর তুলনায় স্ত্রীদের অধিক গুরুত্ব দিয়েছে, কিন্তু চিকিৎসা পাঠক্রম ভারতীয় মহিলাদের তুলনায় ইউরোপীয় মহিলাদের কাছে বেশি সুবিধাজনক ছিল।

মহিলাদের চিকিৎসাক্ষেত্র পেশাদারিত্ব অর্জনের তৃতীয় উপায়টি ছিল তাদের হাসপাতালের সহকারী বা Hospital Assistants হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়া। ১৮৭০ সালে ক্যাম্পবেল মেডিকেল কলেজে নীলকমল মিত্রের নাতনী বিরাজ মোহিনীকে ভর্তি করানোর চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু ছাত্রীকে পৃথক ঘরে পড়ানোর আবেদন নাকচ হয়ে গিয়েছিল। ১৮৮০ র দশকে তিনটি প্রেসিডেন্সির মেডিকেল কলেজের দ্বার মহিলা ছাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল। যে সকল মহিলা পর্দা প্রথার জন্য এতদিন চিকিৎসার সুযোগ লাভ করতে পারত না, তাদেরকে চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে সুবিধা দেওয়ার প্রচেষ্টা হয়েছিল।[২৮] ১৮৬৭ সালে বাংলায় ৬১ টি চিকিৎসালয় খোলা হয়েছিল যা ১৯০০ সালে বেড়ে ৫০০ হয়। ১৮৮৬ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজের আন্ত ও বহির্বিভাগে ৪১,২১৭ জন মহিলাকে চিকিৎসা করা হয় যা ১৮৯৯ সালে ৪৪,৩৭০ য়ে গিয়ে পৌঁছয়। যদিও মেডিকেল কর্তৃপক্ষ নারীদের মেডিকেল কলেজে প্রবেশের বিরোধিতা করে, তা সত্ত্বেও শিক্ষিত ভারতীয় গোষ্ঠী Campbell Medical কলেজের তত্ত্বাবধায়ককে মহিলা হসপিটাল অ্যাসিস□ন□এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বোঝাতে সফল হন। Director of Public Instruction এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে ছাত্রীদের হাসপাতালে প্রবেশ থেকে শুরু করে বৃত্তি প্রাপ্তিরও ব্যবস্থা করেন। Campbell Medical College যে ১৮৮৮ সালে পনেরো জন মহিলাকে হাসপাতাল অ্যাসিট্যান□হিসেবে প্রশিক্ষণের জন্য ভর্তি নেয়। এই ক্লাসে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান ও ইউরেসিয়ান মহিলারা প্রবেশ করেন। *The Indian Messenger* জানায় যে নিম্ন মধ্যবিত্ত হিন্দুদের মধ্যে এই পেশায় যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কিন্তু মহিলাদের বেশীরভাগ ইংরেজী ভাষার সাথে অবগত না থাকায় সফল হতে

পারতেন না। সরকার এই শিক্ষার মান আরো উন্নত করায় হিন্দু ও মুসলমান মহিলারা খ্রীষ্টান ও ইউরেসিয়ান মহিলাদের থেকে শিক্ষালাভে পিছিয়ে পড়েছিল। তা সত্ত্বেও বলা যায় যে এইসকল দেশীয় মহিলা হাসপাতাল সহায়িকারাই পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যাকে বাংলার জেলাগুলিতে পৌঁছে দিয়েছিলেন। ''They became the backbone of these small hospitals and dispensaries, staffing almost 90 percent of those set up by the Dufferin Fund as well as a number of Governmnt Institutions.''[২৯] তাদের ডিগ্রী নিম্নতর হলেও হাসপাতালগুলিতে তাদের নিয়োগ করা হত। মেয়েদের হাসপাতালে চাকরি করা ছিল সম্মানীয় এবং আর্থিক দিক থেকে তারা নিজেদের স্বয়ং নির্ভরশীল করতে সফল হয়েছিলেন। বেতন কম হলেও ব্যক্তিগতভাবে তারা চিকিৎসা করতে পারতেন জেলা হাসপাতালে ও চিকিৎসালয়ে। ঊনবিংশ শতকের শেষে বাংলার বিভিন্ন মহিলা হাসপাতালে পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলা চিকিৎসকদের নিয়োগ করা হয়েছিল। সকলে কলকাতা মেডিকেল কলেজের চিকিৎসাবিদ্যার স্নাতক না হলেও ক্যাম্পবেল মেডিকেল কলেজ ও আগ্রা মেডিকেল কলেজ থেকে হাসপাতাল অ্যাসিস্ট্যান্টের শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ব্রিটিশ মহিলা চিকিৎসকরা জেলায় বা শহরতলিতে গিয়ে চিকিৎসা চর্চা করতে অনিচ্ছুক ছিলেন, ফলে ভারতীয় মহিলা হাসপাতাল সহায়িকারাই এই সব অঞ্চলে মহিলাদের চিকিৎসার প্রয়োজন পূর্ণ করতেন। হৈমবতী সেন, হেমাঙ্গিনী দেবী, মেনকা দেবী, নিস্তারিণী চক্রবর্তী, প্রিয়বালা গুহ 'Vernacular Licentiate in Medicine and Surgery' (VLMS) ডিগ্রী লাভ করে হুগলিতে, বাঁকুড়ার ডাফরিন মেডিকেল হাসপাতালে, মুর্শিদাবাদের গিরিশচন্দ্র হাসপাতালে, শাহাবাদের ডুমরাও রাজ হাসপাতালে, বোগবার জুহারুন্নিসা মহিলা হাসপাতালে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁরা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রদ্ধেয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলেন। তাঁদের পরিষেবার ফলে শহরাঞ্চলে অনেক সাধারণ দেশীয় নারীরা গৃহে অথবা ডিসপেনসারিতে গিয়ে পাশ্চাত্য ঔষুধের সুবিধা লাভ করতে পারত।

কিন্তু মহিলা চিকিৎসকদের অনেক সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হত। মফস্বলে মহিলা চিকিৎসকরা একা থাকার জন্য অনেক সময় নিন্দিত হতেন। They had to be constantly on guard against attacks on their reputation as well as occasional physical assault. They were often subjected to hostile and derisive reaction from the local male population.[৩০] মহিলা ডাক্তারদের যৌন নিগ্রহের শিকার হতে হত বা তাদের ধর্ষণের ভয় দেখানো হত। সরকারী বৈষম্যমূলক নীতির ফলে অনেক মহিলা চিকিৎসক নৈরাশ্যের শিকার হন। দেশীয় সংবাদপত্রে অভিযোগ করা হয় যে, সরকারী রাজস্বের অনেকাংশ ইউরোপীয় মহিলা ডাক্তারদের হাসপাতালে নিয়োগ করে বেতন দিতে খরচ হচ্ছে যদিও এইজন্য শিক্ষিত দেশীয় মহিলা চিকিৎসকরা ছিলেন। ইউরোপীয় ডাক্তারদের

পারিশ্রমিকের সমান পারিশ্রমিক দাবী করায় অনেক পরিবার মহিলা চিকিৎসকদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। মহিলা মিশনারী চিকিৎসকরা ঔপনিবেশিক সরকারের এই বৈষম্যের সুযোগ নিয়ে সমস্ত প্রাপ্য পদগুলি নিজ দখলে রাখেন ও ভারতীয় মহিলাদের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ান। ফলে ভারতীয় মহিলা চিকিৎসকের লিঙ্গ ও জাতিগত বৈষম্য- উভয়েরই শিকার হতে হয়। বড় বড় হাসপাতালে পুরুষ চিকিৎসকেরাই অধিকতর অস্ত্র চিকিৎসা করতেন কারণ তারা মনে করতেন যে মহিলা চিকিৎসকেরা জটিল অস্ত্র চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে যোগ্য নন, যদিও অনেক ব্যক্তির গৃহে তাঁরা রোগিনীর শরীরে অস্ত্রপ্রচার করতেন। চিকিৎসা পেশায় পুরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং মেডিকেল কাউন্সিলের সদস্যরা এই ধারণা পোষণ করতেন যে মহিলাদের ঔষধ সম্বন্ধে বোঝার ক্ষমতা কম। মহিলা ডাক্তারেরা কৃতিত্বের সাথে ভালো নম্বর লাভ এবং পুরুষ চিকিৎসকের মত সমসংখ্যক রোগীর চিকিৎসা করা সত্ত্বেও তারা হাসপাতালে বেশি রোগীর চিকিৎসা করে না বলে সমালোচিত হতেন। মহিলা চিকিৎসকদের হাসপাতালে সহকারী হিসেবে দেখা হত। ১৯০৩ সালে পুরুষ চিকিৎসকেরা মহিলাদের ডাক্তারিতে ভর্তির মান আরো বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন।

তবুও মহিলাদের চিকিৎসাবিদ্যা লাভ মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মহিলা হাসপাতাল এবং ব্যক্তিগতভাবে গৃহে গিয়ে নারীদের চিকিৎসা করে তারা চিকিৎসার প্রয়োজন কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। নারী অগ্রগতির ক্ষেত্রে ভারতীয় মহিলাদের চিকিৎসা জগতে প্রবেশ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে পরিগণিত হয়। বর্হিজগতে পুরুষের সাথে তাল মিলিয়ে তারা কাজ করেন এবং স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন করেন। প্রচুর সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মহিলাদের জন্য মহিলা চিকিৎসকের ব্যবস্থা, মহিলাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে শিক্ষালাভ ও চিকিৎসাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা ছিল উনিশ শতকে নারী প্রগতির একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

তথ্যসূত্র :

১. গীতশ্রী বন্দনা সেনগুপ্ত, ১৯৯৯. *স্পন্দিত অন্তর্লোক : আত্মচরিতে নারী প্রগতির ধারা*. কলকাতা : প্রগেসিভ পাবলিশার্স, পৃ. ১৬.

২. শ্রী উপেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১৩৮১. *ভারতের নারী* . কলকাতা : মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ৫০.

৩. Mary France Billington, 1973. *Women in India* . New Delhi, pp. 2-3.

৪. Kenneth Ballhatchet, 1980. Race, *Sex and Class under the Raj; Imperial Activities and policies and their Critics*, 1793-1905. London : Weldenfeld and Nicolson, p .11.

৫. David Arnold, 1993. *Colonizing the Body: State Medicine and Epidemic*

Diseases in Nineteenth Century India Delhi : Oxford University Press, p. 292.

৬. M. Balfour and Ruth Young, 1929. *The work of Medical Women in India* London : Oxford University Press, p. 13-14.

৭. David Arnold, *op. cit.*, p. 255.

৮. Mary Frances Billington, *op.cit.*, p.36.

৯. M. Balfour, *op.cit.* p.34.

১০. Roger Jeffery, 1988. *The Politics of Health in India*. London : University of California Press Ltd, p. 89.

১১. Gerakdube Forbes, 2005. *Women in Colonial India: Essays on Politics, Medicine and Historiograohy* New Delhi : Chronicle Books. 2005. p.56.

১২. Meredith Borthwick, 1984. *The Changing Role of Women in Bengal, 1849-1905* Princeton : Princeton University Press, p. 159.

১৩. M. Balfour, *op. cit.*, p.20.

১৪. Geraldine Forbes, *op.cit.* p.106.

১৫. Dagmar Engels, 1996. *Beyond the Purdah? Women in Bengal, 1890-1939* Delhi : Oxford University Press.

১৬ Deepak Kumar, 1995. *Science and the Raj: A Study of British India*. New Delhi : Oxford University Press, p. 33.

১৭. Sankar Sen Gupta, 1907. *A study of Women of Bengal*. Calcutta : Indian Publications, p. 253.

১৮. Poonam Bala, 1991. *Imperialism and Medicine in Bengal: A Socio Historical Perspective* New Delhi : Sage Publications, p. 65.

১৯. Merdith Nortwick, *op.cit.*, p. 310.

২০. Female Doctors in Bengal, Brahmo Public Opinion, 27 June, 1875, Cited in M. Borthwock. *op.cit.*, p. 321.

২১. সুনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, *কালজয়ী কাদম্বিনী ও তাঁর কাল*, ২০১২. কলকাতা : ডলফিন, পৃ. ৬৪.

২২. Sujata Mukherjee, 2001. 'Disciplining the Body? Health Care for women and Children in Early Twentieth Century Bengal in Deepak Kumar' (ed), Disease and Medicine in India, A Historical overview, New Delhi : Tulika Books, p. 199.

২৩. Sujanta Mukherjee, 2010 Imperialism, Medicine and Women's Health in Nineteenth Century India, in Arun Bandopadhayay (ed)m Science and Society in India, 1750-2000. New Delhi : Monohar, p. 107.

২৪. *Ibid*, p.111.

২৫. Geraldine Forbes, *op.cit.*, p.110.

২৬. সুনীতা বন্দোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২.

দেবী চ্যাটার্জী

পেরিয়ারের আত্মমর্যাদা আন্দোলনের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

এক

দক্ষিণ ভারতে তামিলনাড়ুর ইরোড্ (Erode) শহর পেরিয়ারের জন্মস্থান। তিরুপ্পুরু নামক শিল্পনগরী থেকে বাসে করে গেলে ঘন□খানেক লাগে। অবশ্য অন্য পথেও যাওয়া যায়। তবে, আমি যে পথে গিয়েছিলাম সেটার কথাই বললাম।

পশ্চিমবঙ্গে অনেকেই ইরোড শহরের নাম শোনেননি; যাঁরা হয়তো বা শুনেছেন তাঁদের অধিকাংশের কাছে এটি দক্ষিণ ভারতের আর পাঁচটি শহরের মত একটি শহর, যার কোন আলাদা গুরুত্ব বা বৈশিষ্ট্য নেই। কারন, ই.ভি. রামসামী[১] বা পেরিয়ারের নামই তো এখানের অধিকাংশ মানুষের কাছে অচেনা। নামের সঙ্গে যদি বা অল্প কিছু মানুষের পরিচয় আছে, তাঁর চিন্তাভাবনার সঙ্গে পরিচিত মানুষের সংখ্যা আরো কম। এতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই, কারণ আমাদের চোখ সচরাচর নিজেদের দিকে নয়তো আর্য সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু উত্তরাঞ্চলের দিকে নিবদ্ধ থাকে। ফলে, স্থান-মাহাত্ম্যের কারণে তিরুপতি, শিল্প কলার কারণে ভারতনাট্যম্ ও রসনা তৃপ্তির কারণে ইডলি-দোসার কথা বাদ দিলে দক্ষিণ ভারত সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ কমই থাকে।

কিন্তু দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ুতে যে কোন শহরে গেলেই একেবারে অন্যরকম ছবি দেখা যায়। সেখানে কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত সবাই পেরিয়ারের নাম জানেন। সেখানে যে কোন শহরে গেলেই অলিতে গলিতে বা রাস্তার মোড়ে সর্বত্রই পেরিয়ারের পূর্ণাবয়ব বা

আবক্ষ মূর্ত্তি দেখা যায়। তাঁর নামে বাড়ি, রাস্তা, আরো অনেক কিছু। এমনকি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে পেরিয়ারের নামে তা করার আবশ্যকতাও দেখা যায়। ডি.এম.কে, এ.আই.ডি.এম.কে. তথা তামিলনাড়ুর প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি ঘুরে ফিরে পেরিয়ারের কথা বলে; তাঁর মতাদর্শের কথা বলে– যেখানে ভিন্ন মত সেখানেও তাঁর উল্লেখ আসে। তিনি আধুনিক কালের তামিলনাড়ুর ইতিহাসের প্রবাদ পুরুষ। বলা যেতে পারে, পেরিয়ারের কথা বাদ দিলে আধুনিক কালের তামিলনাড়ু তার পরিচিতি অনেকখানিই হারিয়ে ফেলে; হারিয়ে ফেলে তার আত্মমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। এ হেন ব্যক্তি পেরিয়ারের, তথা ই.ভি. রামসামীর জন্মস্থান ইরোড্।

১৮৭৯ তে ইরোড্ (Erode) এ এক দক্ষিণ ভারতীয় নাইকার পরিবারে রামসামীর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ভেঙ্কাটাপ্পা নাইকার প্রথমে পাথর খোদাই করার রাজমিস্ত্রী ছিলেন; পরে আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটে এবং ধনী ব্যবসায়ীতে পরিণত হন। এই নাইকাররা ছিলেন কান্নাড়া বালিজা নাইডু জাতির অন্তর্ভুক্ত। তারা একটু উঁচু জাতির শুদ্র। রামসামীর পিতা তাঁকে স্কুলে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেও রামসামীর লেখা-পড়া বেশি দূর এগোয়নি। কুড়ি বছর বয়সে তিনি তাঁর বাবার ব্যবসা ও মন্দির দেখাশোনার দায়িত্ব নেন। তিনি ইংরেজ সার্কল্-এর দেবস্থানম্ কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। এ ছাড়াও, তিনি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, তালুক বোর্ড, নাইডু সংঘ, ব্যবসায়ী সংঘ, কৃষক সংঘ ও আরো নানা সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন।

১৯০৭ সালে, কংগ্রেসে যোগদানের মধ্য দিয়ে রামসামীর রাজনীতিতে প্রবেশ। ১৯২৩-২৪ এ তিনি তামিলনাড়ু কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং তার পরের বছর সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হন। জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার প্রতি রামসামীর তীব্র বিরোধিতা ও সামাজিক গণতান্ত্রিকীকরণের দাবি— শুরু থেকেই তাঁর সমস্ত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে প্রতিফলিত হয়। তিনি আশা করেছিলেন কংগ্রেস নেতৃত্ব ও সংগঠন তাঁর পাশে থাকবে। কিন্তু তা হয় নি। ফলে তাঁর পক্ষে বেশিদিন কংগ্রেসে থাকা সম্ভব হল না। বলা যেতে পারে, ১৯২০ থেকেই কংগ্রেস সম্পর্কে রামসামীর মোহভঙ্গ হতে শুরু করে। ঐ বছর তামিলনাড়ু কংগ্রেস সম্মেলনে তিনি জাতভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের দাবী রাখেন। কিন্তু বিরুদ্ধ যুক্তিতে তা খারিজ হয়ে যায়। ১৯২৫ পর্যন্ত রামসামী তাঁর প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। কিন্তু প্রতিবছরই তিনি ব্যর্থ হন। অবশেষে তিনি কংগ্রেস দলের সঙ্গে তাঁর সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। রামসামী তাঁর মনোভাব স্পষ্টতই প্রকাশ করে বলেন, "কংগ্রেস অ-ব্রাহ্মণদের কোন ভাল করতে পারে না। তাই এখন থেকে আমার প্রধান কাজ হবে কংগ্রেসকে ধ্বংস করা।"

দুই

কংগ্রেসে থাকাকালীন ১৯২৪ এ ভাইকম সত্যাগ্রহে নেতৃত্ব দিয়ে রামসামী 'ভাইকম্ ভীরর্' বা ভাইকমের বীর হিসাবে সম্মান পান এবং অবদমিত জাতিদের মধ্যে নিজের নেতৃত্বের

স্থান সুদৃঢ় করেন। ভাইকম সত্যাগ্রহ অবদমিত জাতির মানুষের আন্দোলন ছিল। কেরালার ভাইকম শহরের রাস্তা দিয়ে এরাওয়া ও আদি দ্রাবিড় জাতিভুক্ত মানুষদের হেঁটে যাওয়ার অধিকারের দাবীতে কেরালার কংগ্রেস দল এই আন্দোলন গড়ে তোলে। তবে, আন্দোলন শুরু হওয়ার পরই সামনের সারির নেতারা গ্রেপ্তার হয়ে যান। আর, তখনই পেরিয়ারের কাঁধে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব এসে পড়ে। এই ভাবেই তিনি নিম্নবর্গের নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন।

কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হওয়ার পর ইভি রামসামী আত্মমর্যাদা আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তাঁরই কথায়, এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা নির্মূল করা ও ঈশ্বর ও কু-সংস্কারের বিরোধিতা করা। এই আত্মমর্যাদা আন্দোলন বা Self Respect Movement জাতিবর্ণ ব্যবস্থা ও ব্রাহ্মণ্যবাদের তীব্র বিরোধিতা করে যা ১৯২৩ এ চেঙ্গলপস্তুতে অনুষ্ঠিত প্রথম আত্মমর্যাদা সম্মেলন থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেখানে জাতিবর্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তার পর থেকে বিভিন্ন স্থানে আত্মমর্যাদা আন্দোলনের ধারা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। শহর থেকে গ্রামে–চতুর্দিকে, সভা–সমিতি অনুষ্ঠিত হতে লাগে; পত্র–পত্রিকা প্রকাশিত হয়; মনুস্মৃতি, তথা ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মীয় গ্রন্থাটি পোড়ানো হয়। এর পাশাপাশি চলে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বর্জন, ধর্ম ও ভগবান–পুরোহিত তন্ত্রের তীব্র সমালোচনা। পেরিয়ারের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এই আন্দোলন পাঁচটি মূল স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়–ভগবানের বিরোধিতা, ধর্মের বিরোধিতা, ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধিতা, জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতা ও গান্ধীর বিরোধিতা।

১৯৩২–৩৪ পর্যন্ত পেরিয়ার তাঁর আত্মমর্যাদা আন্দোলনকে সমাজতান্ত্রিক চেতনার[২] সঙ্গে যুক্ত ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালান। পেরিয়ারের পত্রিকা *কুড়ি আরাসু*-তে তৎকালীন দক্ষিণভারতীয় সামনের সারির সমাজবাদী নেতা সিঙ্গারা ভেলু চেট্টিয়ার এর রচনা ১৯৩১ সাল থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। পেরিয়ারের সমাজতন্ত্রের ধারণাটি 'সমধর্ম' শব্দের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। তিনি আত্মমর্যাদা সমধর্ম দল গড়ে তোলেন। তবে, নানা ঘটনার প্রবাহে, ১৯৩৪ থেকে তাঁর সমাজতান্ত্রিক সূত্র অনেকটা হ্রাস পায়। তিনি জাসিস্ট্ পার্টির কাছাকাছি সরে যান।[৩]

তিন

ধর্ম, তথা জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনার পাশাপাশি পেরিয়ার আত্মমর্যাদা আন্দোলনের মাধ্যমে স্ত্রী স্বাধীনতার এক নব দিগন্তের দিক নির্দেশ করেন। ব্রাহ্মণ্যবাদী পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী পুরুষের সমনাধিকারের কোন স্থান নেই। রীতি–রেওয়াজ, আচার আচরণ, আদর্শ নারীর প্রচলিত ভাবমূর্তি সবই নারীকে পুরুষের অধীনে রাখে। নারীর স্থান গৃহে, তার মূর্তি মাতৃমূর্তি – প্রচলিত এই ধারণা সুকৌশলে নারীকে স্বাধীন জীবনযাত্রার আস্বাদ থেকে বঞ্চিত রাখে। গৃহের গন্ডির মধ্যে তার জীবন যন্ত্রণা মূল্যায়ণের বাইরে থেকে

যায়; তার দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব – বৈষম্য, শোষণ, অত্যাচার, সব কিছুই 'পারিবারিক' ব্যাপার বলে ধামা চাপা পড়ে। আত্মমর্যাদা আন্দোলন এসবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ভালবাসা, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, পরিবার — এসব সম্পর্কে প্রচলিত ধ্যান ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানায়। নারী পুরুষের সমকক্ষ এই মতাদর্শের ভিত্তিতে নারী পুরুষের ভালবাসাকে স্বাগত জানিয়ে, নারীকে পারিবারিক গন্ডির বাইরে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে যুক্ত করে পেরিয়ারের আত্মমর্যাদা আন্দোলনের অন্যতম মুখপত্র '*কুড়ি আরাসু*' পত্রিকায় ১৯২৮-২৯ এ লিঙ্গ বৈষম্য, নারী মুক্তি, ইত্যাদি নানা ধরনের রচনা নিয়মিত প্রকাশ পেতে থাকে। নারী–পুরুষ উভয়েরই রচিত বিশ্লেষণ ধর্মী রচনা, বির্তক মূলক আলোচনা ইত্যাদি আত্মমর্য্যাদা আন্দোলনকে এক জীবন্ত রূপ দেয়।

পেরিয়ারের আত্মমর্যাদা আন্দোলনের অন্যতম দিক ছিল আত্মমর্যাদা বিবাহ (Self-Respect Marriage) বা 'সুইয় মর্যাদাই কল্যাণম্' চালু করা। এই বিবাহ পদ্ধতি সংস্কারের আন্দোলনের মাধ্যমে পেরিয়ার তামিল মানুষকে গণতান্ত্রিক যুক্তিবাদী জীবনযাত্রার দিকে পরিচালিত করার প্রচেষ্টা করেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল বিবাহকে ধর্মীয় গন্ডির বাইরে নিয়ে গিয়ে প্রাপ্তবয়স্কের – নারীর স্বাধীন বিচার বিবেচনার উপর নির্ভরশীল চুক্তি হিসাবে, প্রতিষ্ঠিত করা। সেখানে ব্রাহ্মণ্যবাদী রীতি নীতি, পুরোহিত বা সংস্কৃত মন্ত্রের কোন স্থান থাকবে না। এই সবের মধ্য দিয়ে পেরিয়ার গয়নায় মোড়া নারী বা লজ্জাবতী নারী নয়, দৃপ্ত স্বাধীনচেতা নারীর ভাবমূর্তি তুলে ধরতে চান।

অল্পদিনের মধ্যেই দক্ষিণ ভারতে, বিশেষতঃ তামিলনাড়ুতে আত্মমর্যাদা বিবাহ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পুরোহিত নেই, তার নিয়ম কানুনের উপদ্রব নেই। শাস্ত্রের কচকচানি নেই, নাভিশ্বাস তোলানো অর্থব্যয় নেই; শুধু বর–বৌ, দুটি ফুলের মালা, কিছু বন্ধু–বান্ধব, আত্মীয়–পরিজ্জন, বাস্তবধর্মী ভাষণ — এসব কিছু নিয়েই রচিত হয় আত্মমর্যাদা বিবাহ। আর এ সব কিছুর পাশাপাশি সভা পরিচালনা করার সভাপতি লাগে, তিনি হয় কোন প্রধান আত্মীয় নয়তো বা গাঁয়ের বা সমাজের কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি। এ হেন সরল বিবাহ পদ্ধতি জনপ্রিয়তা অর্জন করাই স্বাভাবিক। তবে নানা বাধা আসে। ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রতিরোধের পাশাপাশি আইনী স্বীকৃতির সমস্যা দেখা দেয়। বিচারালয়ের বক্তব্য, যে বিবাহে হিন্দু বিবাহ রীতি মান্য করা হয় না তা সিদ্ধ নয়। আর, আত্মমর্যাদার বিবাহ অনুষ্ঠানে হিন্দু বিবাহ রীতি নীতি গ্রাহ্য হয় না। শেষ পর্যন্ত, আন্নাদুরাই এর মুখ্যমন্ত্রীত্ব কালে উদ্ভূত আইনী সমস্যাটি মেটানো সম্ভব হয়। আত্মমর্যাদা বিবাহ আইনী স্বীকৃতি পায়।

চার

পেরিয়ার পুরোপুরি ভাবে নাস্তিক ও যুক্তিবাদী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাবে ঈশ্বর ও মূর্তিপূজার সমালোচনা করেন। জনসভায় বক্তব্য রাখার সময়ে পেরিয়ার প্রায়শই তাঁর ভাষণ শুরু করতেন যা বলে তা হলো :

কোন ভগবান নেই,
কোন ভগবান নেই
কোন ভগবান নেই একেবারেই।
যে ভগবান সৃষ্টি করেছে সে নির্বোধ ছিল;
যে ভগবান প্রচার করে সে বদমায়েস।

ধর্মের নেতিবাচক দিকগুলি তুলে ধরে পেরিয়ার বলেন, "ধর্ম আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি নষ্ট করে; প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নষ্ট করে, আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য বিপন্ন করে; উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।" ধর্ম পালনের রীতি নীতি ও তীর্থ যাত্রার জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় তার দিকে পেরিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ ব্যয় যে কেবলমাত্র আর্থিক উন্নয়নের পথে বাধা তাই নয়। যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে অন্তরায় হয়ে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বাধার সৃষ্টি করে। তাই, যা প্রয়োজন তা হল যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণ। পেরিয়ার মনে করেন যুক্তিবাদী মনোভাব গ্রহণ করলে সমাজের বহু সমস্যার সমাধান করা যায়। কিন্তু সমস্যা হল, 'ভগবানের ইচ্ছা' র কথা বলে মানুষকে যুক্তিবাদী হওয়াতে বাধা দেওয়া হয়। কিছু মানুষ আছে যারা নিজেদের মত সমাজের উপর চাপিয়ে দিতে চায়। তারা চায় না অন্যরা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করুক। অথচ, যুক্তিপূর্ণ চিন্তা করার ক্ষমতাই মানুষ ও অন্য প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য সূচিত করে।

পেরিয়ারের দর্শনে যুক্তিবাদের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তাঁর প্রকাশিত পত্রিকাগুলির মধ্যে একটির নাম রেখেছিলেন 'পাগুথারিভূ' যারা তামিল এ অর্থ হল 'যুক্তিবাদ'। এ ছাড়াও, তিনি 'Modern Rationalist' নামে একটি ইংরেজী পত্রিকা চালু করেন। ১৯৬৩ তে ভীডুথালাই পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে পেরিয়ার তাঁর আন্দোলনকে 'যুক্তিবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত' বলে উল্লেখ করেন। Collected Warks of Periyar E.V.R. এর পাতা ওল্টালে দেখা যায় যে তিনি Self Respect Movement ও Rationalist Movement অনেক অর্থে ব্যবহার করেছেন। ১৯৭০ সালে পেরিয়ার Rationalist Forum নামক একটি অ-রাজনৈতিক সামাজিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।

পাঁচ

পেরিয়ারের দৃষ্টিকোণ নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক ছিল। ভারতীয় সমাজ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির যে তীব্র সমালোচনা পেরিয়ার করেন, তার তুলনা কমই পাওয়া যায়। যুক্তিবাদকে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে, অতি সাধারণ ভঙ্গিতে নিয়ে আসেন। সমাজকে নানা দিক থেকে তিনি নতুন ভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। অন্ধ কুসংস্কার, ধর্মবিশ্বাস বর্জন করা থেকে শুরু করে সামাজিক অবদমনের নানা দিককে তিনি চ্যালেঞ্জ জানান। এক দিকে বর্ণ ব্যবস্থাকে চূর্ণ করে অবদমিত জাতিদের সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা অপরদিকে লিঙ্গ সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন আনা পেরিয়ারের আ-জীবন লক্ষ্য ছিল। আর, তারই হাতিয়ার ছিল আত্মমর্যাদা

আন্দোলন বা Self-Respect Movement.

পেরিয়ারের আত্মমর্যাদা আন্দোলন তামিলনাড়ুতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এর প্রভাবে মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের মত দেশে যেখানে বড় তামিল জনগোষ্ঠীর বাস – সেখানে ও ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। আত্মমর্যাদা আন্দোলনকে পেরিয়ার একটি গণ আন্দোলনের পর্যায়ে নিয়ে যেতে চান। বিভিন্ন জাতি–বর্ণের নারী–পুরুষ সংগঠিত করে। দ্রাবিড় পরিচিতির উপর ভিত্তি করে তামিল জনগণের সংস্কৃতির কথা পেরিয়ার তুলে ধরেন। বলা বাহুল্য, এই বিকল্প সমাজ চিন্তার, একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দিক ছিল। সে রাজনীতি ছিল দ্রাবিড় পরিচিতি কেন্দ্রীক, বৈদিক আর্য–ব্রাহ্মণ্যবাদী সভ্যতার বিরোধী। তামিলনাড়ুর মূল রাজনৈতিক দল যথা ডি.এম.কে. ও এ. আই. এ. ডি. এম কে র উৎস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় আত্মমর্যাদা আন্দোলনের মধ্যে তাদের শিকড়। পেরিয়ারের সমালোচনা করলেও, পেরিয়ারকে অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি। তবে দ্রাবিড় আন্দোলন বৈদিক আর্য্য–ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির বিকল্প হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। একদিকে নারী ও শূদ্রের মুক্তির লক্ষ্যে গৃহীত বৈপ্লবিক কর্মসূচী স্থিমিত হয়ে পড়ে, অন্য দিকে তামিলনাড়ুর বাইরে আন্দোলন খুব ছড়াতে পারেনি। তামিল জাতীয় পরিচিতির উপর জোর দেওয়ায় দ্রাবিড় সভ্যতা ভিত্তিক পরিচিতির ধারনা কোথায় যেন হারিয়ে যায়। ফলে, তামিলনাড়ুর বাইরে অন্যান্য দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যগুলিতে এ চিন্তাদর্শ যথাযথ প্রভাব ফেলতে পারে না। পেরিয়ারের উত্তরসূরিরা তাঁর দর্শনকে সঠিক ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে অনেকটাই ব্যর্থ হ'ন। ফলে তাঁর শুরু করা আন্দোলনের বৈপ্লবিক দিক ও তার প্রসার থমকে যায়। সম্ভাবনার যথার্থ স্ফুরণ ঘটে না। তামিলনাড়ুতে অবশ্য আত্মমর্যাদা বিবাহ এখনও দেখা যায়। ইরোডে (Erode) পেরিয়ার ভীড়ু-র কাছে 'কল্যাণম্ মন্ড্রম্' আছে। বাড়িটি কেবলমাত্র আত্মমর্যাদা বিবাহের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়। যৎসামান্য টাকায় ভাড়া, অতিথি আপ্যায়ণ ও পাত্র–পাত্রীর জন্য একজোড়া ফুলের মালা- সবই হয়ে যায়। তামিলনাড়ুতে অন্যত্রও এমন অনেক ব্যবস্থা আছে।

ব্রাহ্মণ্যবাদী পিতৃতান্ত্রিক ভারতীয় সমাজের আমূল পরিবর্তন আনার প্রয়াস নতুন নয়। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে সমাজকর্মী ও রাজনীতিবিদরা নানাভাবে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছেন। গোটা দেশে এমন অনেক নজির ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কখনও সেই পরিবর্তন ধর্মীয় পথে আনার চেষ্টা হয়েছে। যেমন উঠে এসেছে বৌদ্ধ জৈন ধর্ম, পরবর্তীতে শিখ ধর্ম, কবীর পন্থ তথা ভক্তি আন্দোলনের নানা ধারা। কখনও বা প্রতিষ্ঠিত কোন ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে অবদমিত মানুষ মুক্তির পথ খুঁজেছে। ব্রাহ্মণবাদকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বিকল্প সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছে সহজিয়া বৈষ্ণবরা, বাউলরা, বাংলার মতুয়া সহ আরো অনেকে। তবে, বিস্তৃত এলাকা জুড়ে, বিপুল জনসংখ্যাকে যুক্ত করে দীর্ঘস্থায়ী কোন বিকল্প গণমুখী সংস্কৃতি– আজও প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নি।ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যবস্থার অগণতান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক, জাত–পাত ভিত্তিক অত্যাচার

অনেকাংশেই অব্যাহত থেকে গেছে। বিকল্প চেতনা গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। এখানেই পেরিয়ারের চিন্তার গুরুত্ব। তাঁর চিন্তায় এই বিকল্প চিন্তার সন্ধান নতুন মাত্রায় লক্ষ্যণীয়। সমাজের সার্বিক চিত্রটি সামনে রেখে পেরিয়ার তাঁর বিকল্প সমাজের স্বপ্ন দেখেন; তাতে সমাজের নানা দিক, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতিকে অখন্ড রূপে তুলো ধরে অবদমিত মানুষের বিকল্প, আত্মমর্যাদার পরিচিত প্রতিষ্ঠার অনলস প্রয়াস ছিল। আজ আরো একবার, নতুন করে অব্রাহ্মণ্যবাদী বিকল্প সমাজ গঠনের তাগিদে পেরিয়ারের চিন্তা ভাবনার দিকে ফিরে দেখা আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

টীকা :

১. সংস্কৃত ভিত্তিক 'রামস্বামী' শব্দটি ব্যবহার না করে প্রতিবাদী নিম্নবর্গের চিহ্ন হিসাবে পেরিয়ার 'রামসামী' শব্দ ব্যবহার করতেন। এ ছাড়াও, তাঁর 'নাইকার' পদবীটি তিনি ত্যাগ করেছিলেন।

২. সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়ে পেরিয়ার বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। সোভিয়েত অর্থনীতির চেয়েও ধর্ম সম্পর্কে সে দেশের অবস্থান তাঁকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে।

৩. পুলিশের ব্যাপক দমন পীড়ন এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল।

তথ্যসূত্র :

1. B.S.Chandrababu, 1993. *Social Protest in Tamil Nadu*, Emerald Publishers. Chennai.
2. V. Geetha and S.V. Rajaduria, 1998. *Towards a Non-Brahmin Millennium: From Jyothee Thass to Periyar*. Samya. Kolkata.
3. Debi Chatterjee, 2004. *Up Against Caste : Comparative Study of Ambedkar and Periyar*, Rawat Publications. New Delhi. 2004.
4. E.Sa. Viswanathan, 1983. *The Political Caveer of E.V. Ramasami Naicker*, Ravi and Vasanth Publishers. Madras.
5. S. Saraswathi, 1994. *Towards Self Respect : Periyar EVR on a New World*, Institute of South Indian Studies, Madras.
6. M.D. Gopal Krishanan, 1996. *Periyar : Father of the Tamil Race*, Emerald Publishers. Chennai.
7. Nambi Arooran, 1980. *Tamil Renaissance and Dravidian Nationalism* : 1905 - 1944, Kudal Publishers. Madurai.

মনিমালা ঘোষ

জাতের সচলতা – আধুনিকীকরণের নতুন দিক

প্রত্যেক সমাজের নিজস্ব কিছু ক্ষমতাগত বৈশিষ্ট্য থাকে। এই ক্ষমতাগত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে জাত - ব্যবস্থা অন্যতম। খুব সহজতম ভাষায় জাত – ব্যবস্থা বলতে বোঝায় সমাজের বিভক্তীকরণ (Stratification) যেখানে একটি বিভক্ত শ্রেণী খুব কঠোরভাবে অন্য একটি শ্রেণীর থেকে দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে থাকে। এক, এই জাত ব্যবস্থাকে আমরা মূলত দুটি দিক থেকে ব্যাখ্যা করতে পারি – একটি হল প্রতিষ্ঠানগত দিক ও আর একটি হল তার ধারণাগত দিক। প্রতিষ্ঠানগত দিক থেকে বলা যায়, জাত ব্যবস্থা এমন একটি কাঠামো তৈরি করে যেখানে সামাজিক গোষ্ঠীগুলি তাদের সামাজিক অবস্থান ও ক্ষমতা অনুসারে পরপর সজ্জিত থাকে। আর ধারণাগত দিক থেকে জাত ব্যবস্থা বলতে বোঝায়, যেখানে সামাজিক অসাম্য আইনসঙ্গত ভাবে সিদ্ধ তথা প্রতিষ্ঠিত।[১]

এক

ভারতবর্ষ আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও জাত–ব্যবস্থাকে সমাজজীবন থেকে উচ্ছেদ করতে পারেনি। অবশ্যই নতুন ভারতে জাত ব্যবস্থারও নতুনত্ব এসেছে আর তা হলো জাতের রাজনীতি। কেবলমাত্র জাত ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে বহু রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়েছে যারা ভারতীয় রাজনীতিতে রীতিমত শাসন করে চলেছে।

বর্তমান ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল চিরাচরিত ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যে

গুণগত ও সংখ্যাগত পরিবর্তন। স্বাধীনতার পর ভারতের নতুন কিছু রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য হল, চিরাচরিত ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যে গুণগত ও সংখ্যাগত পরিবর্তন। স্বাধীনতার পর ভারতের নুতন কিছু রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য যেমন, উন্নয়ন প্রশাসন, অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্র, ভোটব্যবস্থা, দলীয় ব্যবস্থা, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উত্থান ইত্যাদি আমাদের চোখে পড়ে; তেমনি আমরা দেখতে পাই এই সকল বৈশিষ্ট্যের বিস্তৃতি গোটা ভারত জুড়ে; শুধু ভারতের শহরগুলির মধ্যে কেন্দ্রীভূত না হয়ে গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন স্বাধীনতার পূর্বে ভারতের গ্রাম–গঞ্জে উচ্চ বর্ণের মানুষ ক্ষমতা ভোগ করতো, বর্তমানে ৭৩তম সংবিধান সংশোধন অনুসারে সমাজের নীচু তলার মানুষ অর্থাৎ 'দলিত' বলে যারা পরিচিত তারাও ক্ষমতায় আসছেন। তবে এর সঙ্গে এটাও সত্য যে কিছু আনুষ্ঠানিক (Formal) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন নজরে পড়লেও, মূল সমাজের কাঠামো কতটা পরিবর্তিত হতে পেরেছে তা এখনও প্রশ্নচিহ্ন স্বরূপ।

মূলত ভারতীয় রাজনীতি কখনই জাত রাজনীতি থেকে বেরোতেই পারে নি। বর্তমান দিনে জাত ব্যবস্থা ও রাজনীতির মধ্যে মূলত আমরা দু'ধরনের পরিবর্তন দেখতে পাই। একটি হলো – ক্ষমতার স্থানান্তরীকরণ, একটি ক্ষমতাশালী শ্রেণী থেকে অন্য একটি শ্রেণীতে ক্ষমতা স্থানান্তরিত হচ্ছে, যেমন হয়েছে তামিলনাড়ুতে। সেখানে ব্রাহ্মণরা ক্ষমতাচ্যুত হচ্ছে অ-ব্রাহ্মণদের দ্বারা। দ্বিতীয় যে পরিবর্তন চোখে পড়ে তা হল – ক্ষমতা, জাত-ব্যবস্থার হাত থেকে রাজনীতিতে উদ্ভুত আরো অনেক অন্যান্য সংগঠনের হাতে চলে যাচ্ছে। চিরাচরিত ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে যারা ছিল তাদেরকে নতুন ক্ষমতাশালী শ্রেণীর কাছে টিকে থাকার লড়াই চালাতে হচ্ছে।[২]

দুই

প্রাচীনকালে থেকেই ভারতে হিন্দুদের মধ্যে বর্ণভিত্তিক বিভাজন প্রথা ছিল। এই বর্ণভিত্তিক বিভাজন আসলে ছিল পেশাভিত্তিক বিভাজন। বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষ এক একটি জাতের জন্ম দিয়েছে। যেমন যারা পূজা–আর্চা করত তারা ব্রাহ্মণ, যারা যুদ্ধবিগ্রহ করত তারা ক্ষত্রিয়, যারা ব্যবসা–বাণিজ্য করত তারা বৈশ্য এবং যারা এই তিন বর্ণের মানুষের সেবায় নিযুক্ত থাকত তারা শূদ্র নামে পরিচিত ছিল। প্রথম দিকে বর্ণব্যবস্থায় মানুষের মেলামেশা সহজসাধ্য থাকলেও পরের দিকে কঠোর ভাবে এক জাতের সঙ্গে অন্য জাতের মেলামেশার উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানো হয়। এই বর্ণব্যবস্থার শীর্ষে যাঁরা ছিলেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ তারাই কেবলমাত্র বেদপাঠের অধিকার ভোগ করতেন, সমাজের সর্বোচ্চ সম্মান কেবলমাত্র তাদেরই প্রাপ্য ছিল। বাকি তিন বর্ণের মধ্যে শূদ্রদের অবস্থা ছিল সবথেকে শোচনীয়। তারা বাকি শ্রেণীর সেবায় সদা সম্পর্কিত থাকত। লাঞ্ছনা ও শোষণ তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল। তারা সমাজে অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত হতো। এই জাত–ব্যবস্থায় কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় :

১. সমাজের বিভক্তিকরণ
২. ক্রমোচ্চ স্তরবিনস্ত সামাজিক কাঠামো
৩. সামাজিক মেলামেশা ও একই সঙ্গে খাওয়া – দাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা
৪. ধর্মীয় ও পৌর অধিকারের বিভিন্নতা ও নির্দিষ্ট কিছু সম্প্রদায়কে বিশেষ সুযোগ দান
৫. জীবিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে কঠোর বিধিনিষেধ
৬. ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ[৩]

এই দুর্বিষহ জাত–ব্যবস্থা থেকে মানুষ কিছুটা হলেও মুক্তি পায় ব্রিটিশ শাসনকালে। ব্রিটিশ আমলেই সর্বপ্রথম আইন করে অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ করা হয়, নিম্নবর্ণের মানুষের উন্নতিকল্পে চাষের জমি, শিক্ষা, বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। শুধু তাই নয়, ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যাম্‌সে ম্যাকডোনাল্ড –এর ঘোষণা অনুসারে হিন্দু সমাজের অনুন্নত অংশের মানুষের জন্য পৃথক নির্বাচন ক্ষেত্রের ব্যবস্থা করা হয়। তবে ব্রিটিশদের এই সিদ্ধান্তের মধ্যে ঔপনিবেশিকের স্বার্থ নজরে পড়ে। ব্রিটিশরা ঔপনিবেশিক স্বার্থকে চরিতার্থ করতে মানুষকে জাত সম্প্রদায় এবং উপজাত এর ভিত্তিতে বিভক্ত রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। তারা শিল্পোন্নয়ন চেয়েছিল কিন্তু বিনিময়ে ভারতকে একটি শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করতে চায়নি। ব্রিটিশদের এই বিভেদমূলক সিদ্ধান্তকে (যেখানে হিন্দু সমাজকে দুটি ভাগে বিভক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় – বর্ণহিন্দু ও তফশীলভুক্ত হিন্দু) গান্ধিজী প্রতিবাদ করে অনশন শুরু করেন, তিনি গোটা হিন্দুবর্ণের সংস্কার এর দাবীতে ও অস্পৃশ্যতা বন্ধের দাবীতে আন্দোলন চালান। সর্বশেষে ১৯৩২ সালে ২৪ সেপ্টেম্বর সম্পাদিত হয় 'পুনা চুক্তি', এর মাধ্যমে ভারতের আইনসভায় অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব দ্বিগুণ করা হয়।[৪]

ব্রিটিশ শাসনকালে রাজনৈতিকভাবে সমাজের নিচু বর্ণের মানুষের অবস্থার উন্নতি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে অরাজনৈতিক কিছু পরিবর্ত্তনও জাত-ব্যবস্থার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। যেমন পাশ্চাত্ত্যকরণ (Westernization)। পাশ্চাত্ত্যকরণ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজের মধ্যে মূলত দুটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় :

ক. তথাকথিত নিচু বর্ণের হিন্দুরা যাদের সংস্কৃতি পড়া নিষিদ্ধ ছিল, তারা পাশ্চাত্যকরণের মাধ্যমে হিন্দু উচ্চ বর্ণের মানুষের সমকক্ষ হতে চায়। তারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হবার জন্য যথেষ্ট আগ্রহী হয়ে উঠে।

খ. উচ্চ শিক্ষায় উচ্চ হিন্দুবর্ণের যে প্রাধান্য ছিল এবং তার ফলে সরকারি চাকরিতে তাদের যে আধিপত্য ছিল তা কমতে শুরু করে।

বর্ণব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়নের এই প্রচেষ্টা থেকেই 'সাম্য' (equality)'র উৎপত্তি। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ সামাজিক সচলতা প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন, আলোচনা সভার আয়োজন করেন। শুধু তাই নয়, সমাজের দুঃস্থ অসহায় নিম্নবর্ণের মানুষদের সাহায্যার্থে তহবিল ও গঠন করা হয়। এইভাবে শুরু হয়

জাতের তথা সমাজের সচলতা, এই সচলতা যত বাড়তে থাকে, সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তত আটুট হতে থাকে।[৫]

তিন

সমাজের যে মানুষরা হরিজন তথা অস্পৃশ্য বলে পরিচিত ছিল, সমাজের মধ্যে তাদের অবস্থা আগের তুলনায় ভাল হতে শুরু করল অর্থাৎ হিন্দু বর্ণব্যবস্থার যে কাঠিন্য ছিল তার বদল ঘটতে লাগল। বর্তমান দিনে আমরা যে জাত দ্বন্দ্বের খবর পাই তা আসলে এই তথাকথিত নিচু বর্ণের হিন্দুদের ক্ষমতা পাওয়ার লড়াইকে চিহ্নিত করে। সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষ আজও জাতব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে চায় এবং অন্যান্য বর্ণের মানুষকে নিচু রাখতে চায়।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে মৌলিক অধিকার সমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এখানে ১৫ নং ধারায় জাতি–বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ, জন্মস্থান নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমান বলে বিবেচনা করার কথা উল্লেখ আছে। আবার ঐ একই ধারার চার নম্বর উপধারায় বলা হয়েছে যে সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর জন্য অর্থাৎ তফশীলী জাতি ও তফশীলী উপজাতির মানুষের জন্য রাষ্ট্র 'বিশেষ ব্যবস্থা' গ্রহণ করতে পারে। স্বাধীন ভারতের লক্ষ্য সাম্য প্রতিষ্ঠা ও বৈষম্য দূরীকরণ — তাই সংবিধান অনুসারে মানুষে মানুষে বিভেদ না থাকলেও, বিভেদ ঘোচানোর বিভিন্ন উপায় বার করা হয়, যদিও বাস্তব সমাজে কিন্তু এই বিভেদ আমাদের চোখে পড়ে। এই ব্যবস্থাকে চিরতরে নির্মূল করতে সংবিধানে কিছু সংশোধনও পরবর্তীকালে করা হয়েছে।

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে সংবিধানের অন্যতম দৃঢ় পদক্ষেপ হল, সমাজের একদা দলিত তথা অস্পৃশ্য বলে পরিচিত মানুষদের বিশেষ মর্যাদা দান। সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে নির্দেশমূলক নীতির আলোচনা করতে গিয়ে ৪৬ নং ধারাতে সমাজের দুর্বল অংশের মানুষদের বিশেষত তফশীলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য বিশেষ যত্নবান হতে রাষ্ট্রকে বলা হয়েছে। সংবিধানের ষোড়শ অংশে (Part XVI) তফশীলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। সংবিধানের ৩৪২ এবং ৩৬৬ (২৪) নং ধারায় উভয় সম্প্রদায়ের জন্য লোকসভা ও বিধানসভাগুলিতে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৩৩৫ নং ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন চাকরীর ক্ষেত্রে বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে তফশীলীভুক্ত জাতি-উপজাতির জন্য আসন সংরক্ষিত হয়েছে। সংবিধানের ১৫(৪) ও ২৯(খ) নং ধারায় তাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। সংবিধানের ৩৩৮ (১) নং ধারায় তফশীলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা বাস্তবে কতটা কার্যকর হয়েছে তা দেখার জন্য রাষ্ট্রপতি কমিশন নিয়োগ করতে পারেন। যারা শিক্ষাগত দিক থেকে এই শ্রেণীর অবস্থা ও অসুবিধাগুলি অনুসন্ধান করে উপযুক্ত সুপারিশ করতে পারেন।

সংবিধানের ধারাগুলি ছাড়াও আমরা দেখতে পাই সরকার বিভিন্ন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এদের অবস্থার উন্নতি করার চেষ্টা করেছে, যেমন ১৯৫৫ সালে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য আইন প্রণীত হয়েছে, ১৯৭৯-৮০ সালে তফশীলি জাতিসমূহের সামগ্রিক উন্নতির বিশেষ সাহায্য দান পরিকল্পনা (Special Component Plan - SCP) গ্রহণ করা হয়েছে। সংবিধানকে সংশোধন করে ৭৩ নং ৭৪ নং ধারায় ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সালে পঞ্চায়েত ও পৌরসভায় তফশীলি জাতি–উপজাতির জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে।
সমাজের এই বর্ণের মানুষের উন্নতিকল্পে রাষ্ট্রের সবথেকে সেরা বড় পদক্ষেপ তা হলো 'মন্ডল কমিশন'-এর প্রতিবেদনের বাস্তবায়ন। এই প্রতিবেদন একদিকে যেমন উল্লেখযোগ্য, আবার অন্যদিকে তেমনি বির্তকমূলকও বটে। কেন্দ্রে জনতা সরকারের আমলে ১৭৭৯ সালের ১ লা জানুয়ারি বিন্ধেশ্বরী প্রসাদ মন্ডলের সভাপতিত্বে তফশীলি জাতি উপজাতির মানুষের উন্নতিকল্পে যে কমিশন গঠিত হয় তাই 'মন্ডল কমিশন' নামে পরিচিত। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের অবস্থার উন্নতিকল্পে এই কমিশন সরকারি চাকরির ৫২ শতাংশ পদ এই অনুন্নত শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণের সুপারিশ করে।

১৯৯০ সালে ৭ই আগষ্ট প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং সংসদের উভয় সভায় সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষের জন্য ২৭ শতাংশ সরকারি চাকরী সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা তফশীলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য রক্ষিত ২২.৫ শতাংশের অতিরিক্ত, পূর্বে তাদের সরকারি চাকরিতে ১৩ শতাংশ সংরক্ষিত ছিল। তফশীলি মানুষের উন্নতিকল্পে সরকারের এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। একদা দলিত তথা অস্পৃশ্য বলে পরিচিত মানুষদের এই বিশেষ মর্যাদা দান তাদের অনেক ক্ষমতা ও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার অধিকারি করে তোলে। এবং এই উত্তরণ ভারতীয় রাজনীতির তথা সমগ্র ভারতীয় সমাজের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা এর সঙ্গেই শুরু হল ভারতীয় রাজনীতির নতুন অধ্যায়ের – জাতের রাজনীতিকরণের। অনেকের মতে, এই নতুন অধ্যায় ভারতীয় রাজনীতিতে যে ধারার সূচনা করে- তা পূর্ববর্তী চিরাচরিত জাত ব্যবস্থার থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী।[৬]

চার

তাহলে স্বভাবতই এই প্রশ্নই আসে যে, এই জাত-ব্যবস্থা যা শুধুমাত্র অসাম্যের প্রতীক, তাকে তুলে ফেলতে গিয়েও তার ক্ষেত্রকে এত শক্ত করা হল কেন ? কেনই বা জাতের রাজনীতি বর্তমানে এত প্রাসঙ্গিক ? প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং তফশীলি জাতি ও উপজাতিদের সংরক্ষণ যে চালু করেন তা কি কেবলমাত্র নিম্নবর্ণের মধ্যে সচলতা অনয়ন এর লক্ষ্যে ? কিন্তু বাস্তবতা বলে এই ঘটনা এতটাও সরল নয়। কোনও এক সকালে নিম্নবর্গের উন্নতিকল্পের কথা মনে হল, আর তা বাস্তবায়িত হল – বিষয়টা এত সহজ নয়ই। আসলে বিংশ শতকের সত্তর দশক থেকেই জাতপ্রথা এক শক্তিশালী রূপ নিয়ে আর্বিভূত হয়।

স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায় কংগ্রেস একাধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হলেও সত্তর দশক থেকেই তার আধিপত্য কমতে থাকে। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস আটটি রাজ্যে পরাজিত হয়। কংগ্রেসের আধিপত্য কমতে থাকার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় আঞ্চলিক রাজনীতির তাৎপর্যপূর্ণ উত্থান।

এই আঞ্চলিক রাজনীতির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় মধ্যস্তরীয় জাত- ব্যবস্থারও উত্থান। অথাৎ চিরাচরিত জাত–কাঠামোর মধ্যে উচ্চবর্গের হিন্দুরা যে ক্ষমতা ভোগ করছিল তার স্থানান্তর ঘটে। রাজনীতিতে উচ্চবর্গের তুলনায় নিম্নবর্ণের প্রাধান্য যেন বাড়তে থাকে। এই পরিবর্তনের কারণ হিসাবে আমরা সরকার প্রদত্ত কিছু প্রকল্পের উল্লেখ করতে পারি– যেমন ভূমি সংস্কার আন্দোলন। ভূমি-সংস্কার এর মাধ্যমে ভাগ-চাষীদের মধ্যে জমি ভাগ করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ যারা জমির মালিকের জমিতে কাজ করে অথচ নিজেরা মালিক নয়; মূলত জমি তাদেরকেই দেওয়া হয় এবং এরা অবশ্যই নিম্নজাতভূক্ত সম্প্রদায়। অর্থনৈতিক ভাবে তাদেরকে ক্ষমতাশালী করার এই প্রচেষ্টা এবং একই সঙ্গে ক্ষমতাশালী ও সমৃদ্ধশালী উচ্চবর্ণের মানুষদের মাত্রারিক্ত প্রাধান্য খর্ব করারও সমপ্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে ভারতের সামাজিক সচলতার ইতিবাচক দিক। এই ভূমি–সংস্কার চিরাচরিত ক্ষমতাশালী সম্প্রদায়কে বিশেষ সুযোগ সুবিধা পাবার অধিকার থেকে সরিয়ে দেয়। যেমন রাজস্থানে জমিদারী প্রথা তুলে নিলে সেখানের চিরাচরিত সামাজিক কাঠামোয় একটা ধাক্কা আসে।

সবুজ বিপ্লবের সাফল্যের ফলে কৃষিক্ষেত্রে এক ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। বাজার নির্ভর দ্রবাদ্রি উৎপাদিত ও বিক্রিত হতে থাকে। আর এর ফল ভোগ করে কৃষিক্ষেত্রে যুক্ত নিম্ন ও মধ্যবর্গের মানুষজন। তাদের এই অর্থনৈতিক ক্ষমতা আহরণ রাজনৈতিক ক্ষমতা আহরণেরই প্রথম পদক্ষেপ। তবে তাদের রাজনীতির ভাষা অনেক জটিল, আধুনিকতার সঙ্গে তার সম্পর্ক মোটেই সরল নয়। আধুনিক রাজনীতিতে জাতের ভূমিকা কেমন হবে বা জাত-ব্যবস্থা কি রূপ ধারণ করবে – তা মোটেই সরল নয়। আধুনিক রাজনীতিতে জাতের ভূমিকা কেমন হবে বা জাত-ব্যবস্থা যখন ভোট ব্যাংকের অংশীদার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তখন তার রূপটিই বা কেমন হবে – এর থেকেও আজকের প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতিতে যে প্রশ্ন বেশী আলোচিত হচ্ছে তা হল, কোন ও কার জাতগোষ্ঠী এখন বেশী সক্রিয়। যে জাত ও শ্রেণী যত বেশী সংঘবদ্ধ সেই জাত ও শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তত দর কষাকষিতে সুযোগ পায়। বর্তমানে ভারতীয় জাত ব্যবস্থার এই পরিবর্তন হেতু সমাজে জাতব্যবস্থার ভূমিকা বদলে গেছে। বর্তমানে ভারতীয় রাজনীতিতে জাতব্যবস্থা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকাতে অবতীর্ণ। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা আহ্বানের দ্বন্দ্বে জাতগুলি এখন সদাব্যস্ত। নিম্নবর্ণের জাতসমূহ সরকার ও রাজনৈতিক দলে নিজেদের প্রভাব- প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্য নিজেদের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় করে নিজ নিজ জাত সংগঠন তৈরী করছে।[৭] যেমন গুজরাটে বরিয়া, রাজপুত, ভিল বিভিন্ন জাত নিয়ে গুজরাট ক্ষত্রিয় সভা গঠিত হয়েছে।

কর্ণাটকে হালিকর, হালু, নোনারা, গঙ্গাদিকারা প্রভৃতি জাত নিয়ে তৈরী হয়েছে তক্কালিলা জাত সংগঠন। নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের প্রার্থী থাকলে তারা একজোটে সেই প্রার্থীকে সমর্থন করে থাকে। লোকসভা, বিধানসভা, বিশেষতঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রার্থীর জাত ও শ্রেণীকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এমনিতেও সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গঠিত হলেও জাত-রাজনীতি থেকে তারাও নিজেদের দূরে রাখতে পারেনি। কোন অঞ্চলে বিশেষ কোন জাতের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে সেই জাতের কোন ব্যক্তিকে প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করানো হয়। প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিশীল সব দলই এই খেলায় যুক্ত। রাজনৈতিক দল সরকারের উপর নিজ স্বার্থ বজায় রাখতে বিভিন্ন ভাবে চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। রাজনৈতিক দলগুলি জাতের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে রাজনৈতিক লাভ হাসিল করার একটা সুযোগ ছাড়তে চায়না। পাশ্চাত্যকরণের ফলে ১৫০ বছর ধরে সমগ্র ভারতীয় জাতির মধ্যে যে পরিবর্তন সঞ্চারিত হয়েছিল তাতে চিরাচরিত জাতপ্রথার বৈশিষ্ট্যগুলি আজ ম্লান।

পাঁচ

বস্তুত ব্রিটিশ শাসনকাল থেকেই ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত নিম্নবর্ণের মানুষদের প্রতি শাসককুল সংবেদনশীল ছিল। নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ বজায় রাখার জন্য ইংরেজরা ভারতীয় নিম্নবর্ণের মানুষদের উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল। দক্ষিণভারতে ও মহারাষ্ট্রে যে ব্রাহ্মণবিরোধী আন্দোলন চলছিল তাতে মদত দিয়েছিল ইংরেজরা। স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও দেখা যায় উচ্চবর্ণের মানুষদের হাত থেকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা নিতে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা জোটবদ্ধ। একদা দলিত তথা অস্পৃশ্য বলে পরিচিত মানুষদের সংরক্ষণের সুবিধা জাতের কাঠামোটিকেই বদলে দিয়েছে। তফশীলী জাতি উপজাতিদের এই ক্ষমতায়ন তাদেরকে সমাজের অন্যদের থেকে বিছিন্ন করে দিয়েছে। তারা সচেতন ভাবেই সমাজের উচ্চবর্ণের সাথে দূরত্ব রেখে চলতে চায়। বর্তমানে তারা নিজেদের জন্য আলাদা করে ক্ষেত্র বানিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা আহরণে আগ্রহী। সংবিধানকে সংশোধন করে ৭৩ নং ও ৭৪ নং ধারায় ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সালে পঞ্চায়েত ও পৌরসভায় তফশীলি জাতি-উপজাতির জন্য আসন সংরক্ষণও স্থানীয় রাজনীতির ক্ষেত্রকে বদলে দিয়েছে। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে তারা নিজেদের স্থান করে নিতে সদা উদগ্রীব। পঞ্চায়েত ব্যবস্থাতে সংরক্ষণ তাদের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করে তুলেছে। বিভিন্ন কোয়ালিশন গঠন করে আজ তারা উচ্চবর্ণে একদা ক্ষমতা ভোগকারী মানুষদের এক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। যেমন তামিলনাড়ুতে নিম্নবর্ণের নাইডু, চেট্টিয়ার, মুদালিয়া প্রভৃতি জাতের উদ্যোগে ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য খর্বের জন্য অন্যান্য জাতকে নিয়ে এক ব্যাপক কোয়ালিশন গঠিত হয়েছে। মহীশূরে ভোক্কালিলা ও লিঙ্গায়েতরা ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য খর্ব করে নিজেদের স্বার্থ পরিপূরণের জন্য এক কোয়ালিশন গঠন করে। পাঞ্জাবে জাঠদের বিরুদ্ধে দলিতরা ঐক্যবদ্ধ। এই ক্ষমতার

লড়াইয়ে দ্বন্দ্বেরই হানাহানি ও রক্তপাতের খবর আমাদের প্রায়শই কানে আসে।

এই হানাহানির মূল কারণ হল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, অপরিণত মস্তিষ্ক, আবেগপ্রবণ সিদ্ধান্ত এবং দীর্ঘদিনের তথা সুপ্রাচীন কাল থেকে ভোগ করা উচ্চবর্ণের মানুষের ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কা। দীর্ঘদিন ক্ষমতা ভোগ করে তাদের মজবুত ভিতটাকে তারা নষ্ট হতে দিতে চায়না। এও ছিল একধরনের সংরক্ষণই। প্রাচীনকালে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিজেদের অন্যদের থেকে যে আলাদা করে রেখেছিল, মর্যাদায় তারা যেভাবে অধিকারী হয়ে উঠেছিল তা সম্ভব হয়েছিল তাদের শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণেরই মাধ্যমে। কাজেই সংরক্ষণ কিন্তু তখনও ছিল। সংস্কৃত পাঠায়নের অধিকার কেবলমাত্র তাদের জন্য ছিল। শিক্ষার অধিকার থেকে নিম্নবর্ণের মানুষকে বঞ্চিত করার পরিকল্পনা তাদেরকে সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণের আসনে বসিয়ে ছিল। কিন্তু ধাপে ধাপে সেই ব্রিটিশ শাসনকাল থেকে ব্যবস্থার পরিবর্তন শুরু হয় এবং চূড়ান্ত পরিণতি লক্ষ্য করা হয় 'মন্ডল কমিশন' এর মাধ্যমে।

এখন প্রশ্ন যে, রাষ্ট্রের এত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ আমরা কি বলতে পারি যে, জাতব্যবস্থা সমাজ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ! আমরা প্রকৃতই কি আধুনিক হয়েছি ? আবার এর সঙ্গে আরো একটা প্রশ্ন আসে যে আধুনিকতার সঙ্গে চিরাচরিত ব্যবস্থার সম্পর্ক কতটা আর রাজনীতি কতটাই বা দুইয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে আখেরে নিজের লাভ করে চলেছে ? অর্থাৎ কিনা জাতের রাজনীতিকরণ কতটা গ্রহণযোগ্য ? এখন এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমরা যদি এই অনুসন্ধান চালাই যে সত্যিই জাত-ব্যবস্থা সমাজ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কি না, তাহলে বলতে হয় যে, কোন সামাজিক ব্যবস্থাই পুরোপুরি ভাবে সমাজ থেকে মুছে যেতে পারে না। মুছে ফেলার জন্য রাষ্ট্র যা যা পদক্ষেপ নিয়েছে তার ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই আজকের আধুনিক সমাজে জাত-ব্যবস্থার নতুন রূপ এবং একই সঙ্গে রাজনীতিও নিজের মত করে জাত-ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে ক্ষমতার লড়াই করে চলেছে।[৮]

অধ্যাপক রজনী কোঠারীর মতে, রাজনীতির জাতিকরণ (Casteism in politics) জাতের রাজনীতিকরণ (politicisation) ব্যতীত আর কিছু নয়। ভারতীয় জাতগুলি আজ ভীষণভাবে রাজনীতিকৃত।। জাতব্যবস্থার মধ্য থেকে রাজনীতিও নিজের সংশ্লেষণের উপাদানগুলি খুঁজে বার করে। আসলে রাজনীতি হল ভীষণভাবে প্রতিযোগিতামূলক বিষয় যার মূল লক্ষ্য হল ক্ষমতাদখল। এই লক্ষ্যেই রাজনীতি যেমন আধুনিকতা ও উন্নয়নের বাহক, তেমনি সমাজের চিরাচরিত প্রথাকেও তারা নিজেদের মত করে ব্যবহারে উন্মত্ত। রাজনীতিবিদগণ তাদের ক্ষমতাকে দ্রুত বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে জাত ব্যবস্থাকে স্পষ্টভাবে সমর্থন করে চলেছেন। অন্যদিকে জাতিগুলিও রাজনীতিকে তাদের ক্রিয়াশীলতার দিক হিসাবে তুলে ধরে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়েছে। এইভাবে রাজনীতির রূপ ও জাত ব্যবস্থার রূপ পরিবর্তিত হয়ে একে অপরের কাছাকাছি এসে গেছে এবং

পরস্পর পরস্পরের জন্য কাজ করে চলেছে।[৯]

যেমন মন্ডল কমিশনের সুপারিশগুলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বলা হয় সরকার যথেষ্ট তাড়াহুড়ো করে ফেলেছে। সংরক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হল পিছিয়ে পড়া মানুষগুলির মধ্যে আস্থার মনোভাব তথা আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা, হীনমন্যতা নয়। সংরক্ষণের ফলে বিভিন্ন কাজের মান যাতে নেমে না যায় সেদিকে সমাজকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ ছাড় দেওয়া হলেও পাশের ক্ষেত্রে নয়। সেখানে সমমান বজায় রাখা প্রয়োজন। দরকার হলে পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, ঘাটতি পূরণ করে তারা যাতে যোগ্য হয়ে উঠতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। চাকরির পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নয়, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাই মাপকাঠি হওয়া উচিত। দক্ষ ব্যক্তির উপরে যদি অদক্ষ ব্যক্তিকে শুধুমাত্র সংরক্ষণের জন্য বসিয়ে দেওয়া হয় তাহলে উল্টোফল দেখা দেবে। আবার সংরক্ষণ কখনো কারোর জন্মগত অধিকারে যাতে পরিণত না হতে পারে তার দিকেও নজর দেওয়া উচিত। সংরক্ষণের সুবিধা এক প্রজন্মের মানুষ পেয়ে উচ্চ বর্ণের মানুষদের সঙ্গে ব্যবধান ঘোচাতে পেরেছে- সেক্ষেত্রে তার পরবর্ত্তী প্রজন্মও কতটা সংরক্ষণের সুবিধা পেতে পারে তা নিয়ে আলোচনা আবশ্যক।

অনেক সময় দাবী হয়, সংরক্ষণের মাপকাঠি হোক অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, বংশগত বা জন্মগত পরিচয় নয়। শুধুমাত্র সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রেই কেন (যেখানে চাকরির সংখ্যাই জনসংখ্যা অনুপাতে অনেক কম) নিচু বর্ণের মানুষকে স্বনির্ভর করতে, তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে সরকার আরও অনেক অর্থনৈতিক সাহায্য করতে পারে। মনে রাখতে হবে সুযোগ আর সংরক্ষণ কিন্তু এক জিনিষ নয়। সংরক্ষণের সুযোগ পেতে পেতে সেটা যেন মানুষের অভ্যাস না হয়ে যায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের যে, কোন রাজনৈতিক দলই তাদের ভোট হারাবার আশঙ্কায় সংরক্ষণের তাৎপর্য্য নিয়ে কোন প্রশ্নই তোলেনি। উপরন্তু এর মাধ্যমে তারা নিজেদের ভোটব্যাংক বাড়িয়ে চলেছে। জাতপাতকে ব্যবহার করে আরো কিভাবে ভোটব্যাংক নিজেদের দখলে আনা যায় তার নানান দিক খুঁজে চলেছে।[১০] ভারতবর্ষে অনেক রাজনৈতিক দল এই জাতব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। যেমন বহুজন সমাজপার্টি, সমাজবাদী পার্টি, জনতা দল দাবী করে যে তারা সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষেরই প্রতিনিধিত্ব করছে। ভারতে সবথেকে জনবহুল প্রদেশ উত্তরপ্রদেশে এই বহুজন সমাজ পার্টি এই নিম্নবর্ণের মানুষের সাহায্যে অনেক সময় তাদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে, মুসলিম সমাজের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতা দখল করেছে।

ছয়

কিন্তু জাতের রাজনীতিকরণ হলেও আমরা কিন্তু এই দাবি কখনও করতে পারিনা যে, সত্যি নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা তথাকথিত 'নিচু' বলে আর অপমানিত হচ্ছেন না। জাত ব্যবস্থার উঁচু ও মধ্যস্তরে অবস্থিত মানুষদের দ্বারা নিম্নস্তরের মানুষের উপর নির্যাতনের মাত্রাও প্রচন্ড বৃদ্ধি

পেয়েছে, দেশের কতকগুলি অংশে বিশেষত উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশে এই নির্যাতন হিংসাত্মক রূপ ধারণ করেছে। অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজন সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষদের কাছ থেকে একটু সহানুভূতি সম্পন্ন ব্যবহারের পরিবর্তে সামান্য ব্যাপারেই হয়রান হচ্ছে। সুবিধার দাবীতে উচ্চ ও নিম্ন এই দুই স্তরের জাতির মধ্যে টানাপোড়েন চলছে, কখনো কখনো রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের আকারেও তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ভারতে দলিতদের এই অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক লেখক একে 'India's hidden apartheid' বলে অভিহিত করেছেন। যদিও সমাজতাত্ত্বিক কেভিন রেলেই (Kavin Reilly) সিটেফেন কাফ্‌ম্যান (Stephen Kaufman) এবং অ্যানজেলা বোডিনো (Angela Bodino) মন্তব্য করেছেন যে এই ধরনের ভেদাভেদ বর্তমান ভারতে আর নেই, এমনকি অস্পৃশ্যতাও সমাজ থেকে দূরীভূত হয়েছে। ভারতের শহর জীবনে আজ আর জাত-প্রথার কোন প্রভাব নেই। বিশেষত সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে জাত-প্রথা অনেকাংশে তার প্রভাব বিস্তারে অসমর্থ। পিছিয়ে পড়া সাঁওতাল, কোল, ভিল, মুন্ডা গোষ্ঠীর মানুষও সরকারের প্রকল্পের ফলে সুবিধা ও ক্ষমতা উভয়ই ভোগ করে চলেছে। একশ্রেণীর সমাজবিজ্ঞানীগণও মনে করেন যে আধুনিক ভারতের শ্রেণী সচেতনার উন্মেষের ফলে জাত থেকে শ্রেণীতে উত্তরণ ঘটেছে। জাত আজ মৃত শক্তি। কেননা বর্তমান দিনে বিভিন্ন জাতের সদস্যরা একই পেশায় নিযুক্ত আছেন, একই স্থানে পানভোজন করেছেন, একই রীতিনীতি মেনে চলেছেন, পোষাকপরিচ্ছেদে নারীপুরুষ ভেদে কোন বিভেদ এখন জাতের বিচারে হয়না। তারা পাশাপাশি বাড়িতে বসবাস করেছেন। একই জায়গা থেকে বাজার করেছেন, ছেলেমেয়েদের একই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করছেন, এমনকি অন্যজাতের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কেও আবদ্ধ হচ্ছেন। সমাজে সব বর্ণের মানুষের আত্মসচেতনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে জন্ম হচ্ছে শ্রেণীর, জাতের নয়। উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন জাতের মানুষ একত্রিত হয়ে একটি এক শ্রেণী হিসাবে উদ্ভূত হচ্ছেন। অর্থাৎ জাত প্রথার ভিত্তি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং জাত থেকে শ্রেণীতে উত্তরণ ঘটেছে। তবে রজনী কোঠারি জাত থেকে শ্রেণীতে উত্তরণ ঘটার এই তত্ত্বকে স্বীকার করেননি। তাঁর মতে ভারতীয় রাজনীতি কোন মতেই জাতসর্বস্ব হয়ে পড়েনি, বরং ভারতীয় জাতিগুলিই আজ রাজনীতি-সর্বস্ব হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, প্রাচীন ভারতে জাতপাতের সঙ্গে রাজনীতির যে সম্পর্ক ছিল, আজ তা পরিবর্তিত হয়েছে মাত্র, বস্তুতঃ ভারতে জাত ও রাজনীতি কখনো বিচ্ছিন্ন ছিলনা, আজও নেই।[১১]

তবে আগে যে সব জাতগুলি রাজনীতি সংশ্লিষ্ট ছিল না, এখন তারা রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে রাজনীতিতে জাতের ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জাতকে এড়িয়ে রাজনীতি করবার কৌশলও পালেটগেছে। সকল জাতি সংশ্লিষ্ট হবার ফলে রাজনীতির গণতন্ত্রীকরণ ঘটেছে, যা রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে অর্থবহ করে তুলেছে।[১২] বাবাসাহেব

আম্বেদকর থেকে আমরা লোকসভার স্পীকার শ্রীমতি মীরা কুমারকে পেয়েছি – যাঁরা পিছিয়ে পড়া মানুষের মনোবল হিসাবে কাজ করে চলেছেন, পেয়েছি রাষ্ট্রপতি কে . আর . নারায়নকে (১৯৯৯) যিনি পিছিয়ে পড়া মানুষের জনগোষ্ঠীভুক্ত। ২০০৭ সালে কে. জি. বালাকৃষ্ণন্ ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের মুখ্য বিচারক, যিনি নিজে দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এক সময় সংবাদসংস্থা BBC দাবী করেছিল যে উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী মায়াবতী কুমারী লক্ষ লক্ষ দলিত শ্রেণী তথা অস্পৃশ্য শ্রেণীর আইকন ছিলেন। এইভাবে বিভিন্ন উচ্চ পদে দলিতদের অবস্থান নিঃসন্দেহে ভারতে জাতব্যবস্থার ভিতকে দুর্বল করে তুলেছে।[১৩]

সাত

বিংশ শতকের শেষ দশকে ভারতীয় রাজনীতিতে এক বিশেষ পরিবর্তন নজরে আসে, যা ভারতীয় রাজনীতির ব্যাকরণকে বদলে দেয়। নেহেরুর সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শকে সরিয়ে আসে পাশ্চাত্যদুনিয়ার নতুন উদারিকীকরণ মতবাদ – বিশ্বায়ন। সোভিয়েত রাশিয়ার পতন, ঠান্ডা লড়াইয়ের অবসান, এক মেরুকরণ রাজনীতির উদ্ভব ও বিশ্বায়ন – এই সময়কার বৈশিষ্ট্য। বিশ্বায়ন শুধুমাত্র একটি দেশের অর্থনীতির উপরই প্রভাব ফেলে না; দেশের সংস্কৃতি, রাজনীতির উপর ও এর প্রভাব গাঢ়। মানবিক অধিকার, নারী স্বাধীনতা, পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা সারা বিশ্বে আলোচিত হতে থাকে; দেশের সীমানা ছাড়িয়ে এই সমস্ত আন্দোলন আন্তর্জাতিক রূপ নেয়। অবশ্য শেষ বিচারে কোন আন্দোলনই দেশের নিজস্ব থাকে না, সারা বিশ্বে তা ছড়িয়ে পড়ে। আধুনিকীকরণের সঙ্গে জীবিকার বিভিন্নতাও এই বিশ্বায়নের অন্যতম দিক। নতুন প্রযুক্তি, নতুন পেশা কিছু মৌলিক ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এখন আমরা জাত নয়, শ্রেণী কথাটার সাথেই বেশী পরিচিত, এতেই আমরা বেশী অভ্যস্থ। অল্প হলেও জাত থেকে ধীরে ধীরে শ্রেণীতে উত্তরণ ঘটেছে। এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে।

অর্থনীতি উদারীকরণের ফলে বিভিন্ন যে সরকারি চাকরির ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে তাতে দলিত শ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা ও লাভবান হয়েছে। তাদের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে। টেলিভিশন প্রায় ৪৫ শতাংশ মানুষের আছে, মোবাইল ফোন প্রায় ৩৬ শতাংশ মানুষ ব্যবহার করছে। দুচাকার গাড়ি ১২.৩ শতাংশ মানুষের আছে, প্রায় ৩৭ শতাংশ দলিত গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ নিজেদের ব্যবসা চালায়। বরং জমিতে মজুর হিসাবে কাজের হার কমে গেছে। পূর্বে যা ছিল ৪৬.১ শতাংশ, বর্তমানে তা ২০.৫ শতাংশে নেমেছে। সমাজবিজ্ঞানী কাসান (Cassan) তাই মন্তব্য করেছেন যে , দলিতদের জন্য সরকারের যদি আর কিছু করণীয় থেকে থাকে, তা হল গ্রামে গঞ্জে উচ্চমানের বিদ্যালয় স্থাপন, যা দলিত শ্রেণীর মানুষকে বর্তমান সমাজব্যবস্থার যুগপোযোগী করে তুলবে। ২০০৭ সালে বিশ্বব্যাংক এক সার্ভে করে দেখায় যে, প্রায় ৮০ শতাংশ দলিত শিশু এখন বিদ্যালয়ে যায়। প্রায় ৪০ শতাংশ দলিত পরিবারে বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহার করছে। ১৯৯৫ থেকে ২০০৫ এর মধ্যে দেখা

যায় দলিত সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য সীমার রেখা প্রায় ১০ শতাংশ নেমে গেছে। ১৯৯৫ তে যা ছিল ৪৯ শতাংশ, ২০০৫ সালে তার ১০ শতাংশ কমে গেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দলিত সমাজের উন্নতিও নজরে আসে।

অস্পৃশ্যতাকে সমাজের ব্যাধি হিসাবে মেনে বিভিন্ন সামাজিক নাটকও অনুষ্ঠিত হয়েছে, যার মূল উদ্দেশ্য, এর কুফল সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। যেমন মুল্‌ক রাজ আনন্দ এর 'অস্পৃশ্যতা' (১৯৩৫), হিন্দি সিনেমা 'অশুৎ কন্যা' (১৯৩৬) র নাম উল্লেখযোগ্য। ২০১১ সালের হিন্দি সিনেমা 'আর সংরক্ষণ' ও এর উপর ভিত্তি করে তৈরী হয়েছিল। লেখিকা অরুন্ধতী রায়ের 'The God of small things' (১৯৯৭) ও জাতব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে লেখা অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস। নিঃসন্দেহে এগুলি সমাজ তথা জাতের সচলতারই পরিচয় বাহক।[১৪] জীবিকার ক্ষেত্রে বিভিন্নতা, সাম্যতত্ত্বের ব্যপ্তি, রাজনৈতিক ও সামাজিক সচলতার ক্রমবর্দ্ধমান পরিস্থিতি জাতব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ মৌলিক পরিবর্তনের জন্য দায়ী। আধুনিক অর্থনীতি ও রাজনীতির পরিপেক্ষিতে জাতের ভূমিকাও পরিবর্তিত হয়েছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে জাতব্যবস্থা অবলুপ্ত হয়ে গেছে, যা হয়েছে তা হল এর লজিকের পরিবর্তন। শুধুমাত্র সমাজের কাঠামো নির্দিষ্ট করার মধ্যে আর এই ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ নয়, এটি ভারতীয় রাজনীতিতে বিশেষ ক্ষেত্র বানিয়ে নিয়েছে। এই ইতিবাচক পরিবর্তনকে আমরা একবাক্যে বদ্ধব্যবস্থা থেকে খোলা ব্যবস্থার উত্তরণ বলে চিহ্নিত করতে পারিনা। কেননা পুরানো ব্যবস্থা কিন্তু পুরোপুরি বদ্ধ ছিল না, আর ছিল না বলেই তার মধ্যে সচলতা আনয়ন সম্ভব হয়েছে।

তথ্য সূত্র :

১. সুদীপ্ত কাবিরাজ, ১৯৯৭. *পলিটিকস ইন ইন্ডিয়া*. অক্সফোর্ড. পৃষ্ঠা, ৫৯-৯৩, এম.এন.শ্রীনিবাস, ২০১৩. *সোস্যাল চেঞ্জ ইন মর্ডান ইন্ডিয়া*. ওরিয়েন্ট পৃষ্ঠা, ৯৫.

২. এম. এম. শ্রীনিবাস, ২০১৩. *সোসাল চেঞ্জ ইন মর্ডান ইন্ডিয়া*. ওরিয়েন্ট পৃষ্ঠা. ৯৫- ১২৩

৩. নিরজা গোপাল জায়াল, ভানু প্রতাপ মেহেতা, ২০১৪. *পলিটিকস ইন ইন্ডিয়া*. অক্সফোর্ড. পৃষ্ঠা, ১৫৪-১৬৮.

৪. অরুনাভ ঘোষ, *ভারতীয় রাজনীতির বিতর্কিত বিষয়*. প্রগ্রেসিভ. পৃষ্ঠা, ৫৩–৬৩.

৫. রজনী কোঠারি, ১৯৭০. *কাস্ট ইন ইন্ডিয়ান পলিটিকস্*. পৃষ্ঠা, ২৭-৭১.

৬. সুদীপ্ত কাবিরাজ, ১৯৯৭. *পলিটিকস ইন ইন্ডিয়া*. অক্সফোর্ড. পৃষ্ঠা, ১৭১-১৭৬.

৭. অরুণাভ ঘোষ, *ভারতীয় রাজনীতির বিতর্কিত বিষয়*. প্রগ্রেসিভ. পৃষ্ঠা, ৫৩-৬৩.

৮. নিরজা গোপাল জায়াল, ভানু প্রতাপ মেহেতা, ২০১৪. *পলিটিকস ইন ইন্ডিয়া*. অক্সফোর্ড. পৃষ্ঠা, ১৬০-১৬৮.

৯. নিরজা গোপাল জায়াল, ভানু প্রতাপ মেহেতা, ২০১৪. *পলিটিকস ইন ইন্ডিয়া*. অক্সফোর্ড. পৃষ্ঠা, ১৫৪-১৬৮.

১০. রজনী কোঠারি, ১৯৭০. *কাস্ট ইন ইন্ডিয়ান পলিটিকস্*. পৃষ্ঠা, ২৭ – ৭১.
১১. অরুণাভ ঘোষ, *ভারতীয় রাজনীতির বিতর্কিত বিষয়*. প্রগ্রেসিভ. পৃষ্ঠা, ৫৩–৬৩.
১২. রজনী কোঠারি, ১৯৭০. *কাস্ট ইন ইন্ডিয়ান পলিটিকস*. পৃষ্ঠা, ৭৭ – ৯১.
১৩. রজনী কোঠারি, *প্রগুক্ত*. পৃষ্ঠা, ২৭-৭১.
১৪. উইকিপোডিয়া — *কাস্ট সিস্টেম ইন ইন্ডিয়া*.

—

তপন কুমার দাস

কালিম্পং নোটবুক– মায়েল লিয়াং, 'গোর্খা'ল্যান্ড ও বায়ব রাজনীতি: একটি পর্যালোচনা

প্রাক্ কথা

আলোচনায় প্রবেশের আগে তার প্রেক্ষাপট, প্রত্যয় ও পরিসর নিয়ে কিছু বলা ঐকান্তিক প্রয়োজন। যেমন, বিচার বিশ্লেষণের কাজটাকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এবং তার পটভূমিকে গুরুত্ব দিয়ে একটি সামান্য শিরোনামে আশ্রয় নেওয়া 'কালিম্পং নোটবুক'। 'কালিম্পং নোটবুক' প্রায় তিন দশকের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। এই আলোচনায় দার্জিলিং এর জীবন যাপন ও ইতিহাসের ছায়া অস্পষ্ট বা অদৃশ্য। এবং গুরুত্বহীন ও বটে। কারণ কালিম্পং এর নিজস্ব ইতিহাস ও জীবনযাপন নিয়ে পৃথক আলোচনা প্রায় নেই। এই শূন্যস্থান পূরণের তাগিদ এই লেখায় প্রধান চালিকাশক্তি। আর যাঁদের কেন্দ্র করে এই কথা বলা শুরু তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠের বাসভূমি এই কালিম্পং।

জীবনযাপনের কথা বলছি বলেই ভূমিজ সংস্কৃতির কথাও এসে পড়ে। কিন্তু সেই আলোচনায় কেন্দ্রীয় চরিত্র লেপচা জনসম্প্রদায়। 'নেপালী'[১] শব্দের মোড়কে যে বহু জন-সম্প্রদায় কালিম্পং ও দার্জিলিং এর ইদানীংকার গরিষ্ঠ জনতা, তাদের কথা আসবে শুধুই প্রমাণ অপ্রমাণের বিচারে। তা না হলে ভূমিপুত্র লেপচাদের এযাবৎ উল্লেখহীন অস্তিত্বের টানপরিয়ান বোঝানো দুষ্কর হয়ে উঠবে। সুতরাং একদেশদর্শিতার সম্ভাবনাকে মাথায় রেখেই আলোচনা চলবে দীর্ঘ প্রায় তিনশ বছরের পক্ষপাতদুষ্টতাকে কিঞ্চিৎ শোধনের উদ্দেশ্যে। এই লেখায় আমি নেপালীদের 'নেপালী ডায়াসপোরা' হিসেবেই উল্লেখ করবো; 'গোর্খা'

হিসেবে নয়। সর্বোপরি, এই আলোচনা সাধারণ নেপালী জনগোষ্ঠীগুলির প্রতি অসূয়াজাত নয়। বরং তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ; কারণ তাঁরা আমাকে ভাবতে প্ররোচিত করেছেন। তবে লেপচাদের অতি প্রাচীন জন্মভূমিকে নেপালীদের বলে দাবি করার মতো অনৃতভাষণের বিরোধিতা করা শ্রেয়, সন্দেহ নেই।

'সমাজ জিজ্ঞাসা'র সম্পাদক অধ্যাপক অনিল জানা-এর আগ্রহে এই আলোচনার সূত্রপাত। ভাবনায় রয়েছে একাধিক প্রবন্ধের পরিসরে কালিম্পং পার্বত্যঅঞ্চল ও ভূমিপুত্র লেপচাদের ইতিহাস ও বর্তমান বিধৃত করা। দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের রাজনীতির অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দুটি হ'লো মিথ্যাচার ও নাটুকেপনা; লেপচাদের মাতৃভূমিকে 'গোর্খা ল্যান্ড' বলে দাবি করার মিথ্যাচার যেমন। প্রশ্রয়ের রাজনীতির ছত্রছায়ার বেড়ে ওঠা আন্দোলনগুলির চিরকালীন বৈশিষ্ট্যও তাই।[২] ২০১৩ সালের প্রথমপর্বে ঐ রাজনৈতিক নাটুকেপনাই গণমাধ্যমের দৌলতে প্রায় চুম্বকীয় ঘটনার রূপ নেয়।

এক

জাতিসত্তার আন্দোলনের এই পর্বে তিনটি ঘটনা যথেষ্ট আগ্রহজনক; উদ্বেগজনকও বটে। প্রথমত, মুদ্রণ মাধ্যমের একটি শক্তিশালী অংশ বা কর্পোরেটগোষ্ঠী প্রায় খোলাখুলিভাবে নেপালী ডারাসপোরাকে উৎসাহ ও প্রশ্রয় দিয়েছে। কিছু বাঙালী সাংবাদিক এবং এক সঙ্গীতশিল্পী-চলচ্চিত্রকার এই প্রশয়ের রাজনীতির নবতম প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন।[৩] দ্বিতীয়ত, এই পর্বে নেপালী ডায়াসপোরার স্বঘোষিত কিছু নেতৃবর্গ প্রকাশ্যেই প্রকৃত ভূমিপুত্র লেপচাদের স্বভূমি থেকে বিতাড়নের হুমকি দিয়েছেন। এমন হাস্যকর প্রয়াস পাহাড়ের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে, সন্দেহ নেই। তৃতীয়ত, প্রায় তিনশ বছর পর আবার অস্তিত্বের লড়াই এ সরাসরি পথে নেমেছে আপামর লেপচা জনসম্প্রদায়।

এই লড়াই এর একটি জটিল তথা বহুমাত্রিক চরিত্র রয়েছে। পক্ষ প্রতিপক্ষের দিক থেকে এই দ্বন্দ্ব আসলে নেপালী ডায়াসপোরা ও লেপচা ভূমিপুত্রের মধ্যে। একদিকে নতুন হোমল্যান্ড তৈরীর প্রচেষ্টা, অন্যদিকে মাতৃভূমি ও অস্তিত্বকে ধরে রাখার প্রয়াস। সঙ্গীত শিল্পীর দীর্ঘ লেখাটি একটি প্রতিষ্ঠিত ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। লেখাটি মনে করিয়ে দেয় দার্জিলিং এর 'ইতিহাস' নিয়ে লেখা আর একটি বই এর কথা[৪]। তার কারণ, লেখাদুটির মধ্যে একই ধরনের অপ্রকৃতিস্থ নষ্টালজিয়ার দেখা মেলে। দুটিতেই সংখ্যার দিক থেকে শক্তিশালী নেপালী ডায়াসপোরার স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে লেপচাদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে। শুধু তাই নয়, সঙ্গীতশিল্পীর লেখাটি সেই বাচনের প্রতিনিধিত্ব করে যেটি কালিম্পং দার্জিলিং অঞ্চলের জনবর্গ নয়, ঔপনিবেশিক দার্জিলিং শহরের আমেজটিকে অতিমাত্রায় গুরুত্ব দেয়। সুতরাং স্বীকার করে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত, কালিম্পং বা দার্জিলিং এর রাজনীতি বা আন্দোলনকে শুধুই নেপালীদের 'গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন' বলে চিহ্নিত করা

পক্ষপাতপুষ্ট হবে; যেহেতু লেপচাদের জাতিসত্তার লড়াইকে এখানে উপেক্ষা এবং অবদমিত করা হচ্ছে। আমার বিশ্লেষণে এ জাতীয় রাজনীতি এক ধরনের Bubble Politics এর উদাহরণ। এ স্বীকৃত অভিধাটি ব্যবহারের কারণ হলো, এখানে সমাজের মূলস্রোতের সংঘটকগুলি গরিষ্ঠ জনসম্প্রদায়ের 'এথনিক' আবেগগুলিকে ব্যবহার করে আপন-আপন রাজনৈতিক স্বার্থেই। মরীচিকা হলেও, এখানে আবেগের বুদ্বুদ বা অবাস্তবতা রাজনৈতিক হাতিয়ারের ভূমিকা পালন করে। এই প্রকরণটিও জাতিসত্তার রাজনীতিতে একটি সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য। একে বুদ্বুদিত বা বায়ব রাজনীতি বলতে আপত্তি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ব্যাপারটি প্রান্তিক ভূমিপুত্রদের কাছে সংবর্ত বিশেষ।

অবশ্য কোন এক সঙ্গীতশিল্পী বা দেশান্তরী জনগোষ্ঠী একশ বছর ধরে 'একশ মাইল পথ' হাঁটতেই পারেন নতুন হোমল্যান্ডের খোঁজে বা, ইতিহাসের মুহূর্তগুলিকে নির্মাণ করে নিতে পারেন নিজেদের কল্পনায় 'হোমল্যান্ড' সৃষ্টির মানসে। কিন্তু, অমোঘ সত্যটি হলো, কালিম্পং-দার্জিলিং এর ভূভাগ প্রাথমিকভাবে লেপচা জনসম্প্রদায়ের মালিকানার সরহদ্দেই পড়ে–কয়েক সহস্র বছরের বাসভূমি-তার প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিমন্ডলের উত্তরাধিকার একমাত্র লেপচাদেরই। নেপালী ডায়াসপোরার এতদ্‌অঞ্চলে অভিবাসী হওয়ার কারণ, সাম্রাজ্যবাদী তথা উপনিবেশিক আগ্রাসন ও তদনুরূপ পরিকাঠামো নির্মাণ বা তজ্জনিত বাধাপ্রাপ্ত অনুপ্রবেশ।

পার্বত্য রাজনীতি দীর্ঘকাল ধরেই নানান স্বার্থের রাজনৈতিক দল ও স্বার্থগোষ্ঠীকে আকর্ষণ করেছে। এদের সিংহভাগই নেপালি ডায়াসপোরার নানান স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে- AIGL, PP, CPI, CPI(M), INC, GNLF, CPRM, BJP, GJM, DDUL, TMC ইত্যাদি। এরা সকলেই পাহাড়ের রাজনীতিকে নিজের নিজের খাতে বইয়ে দেবার চেষ্টায় ব্যস্ত। কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম তৃণমূল কংগ্রেস। কারণ, রাজনীতির চোরাস্রোত থাকলেও এই প্রথম একটি রাজনৈতিক দল লেপচাদের অনুকূলে প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিয়েছে-পার্বত্য রাজনীতির ইতিহাসে যা এতকাল অসম্ভব বলে মনে করা হতো। অবশ্য অদূর অতীতে শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী অনেক স্তোকবাক্য দিয়েছিলেন তার সাক্ষ্য আছে। আর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তো নেপালী ডায়াসপোরার শক্তিতেই বলিয়ান।

রাজনীতির বাড়বাড়ন্ত থাকলেও মৌলিক সমস্যাকে নিয়ে কোন আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়নি। বিশেষত, নেপালী ডায়াসপোরার রাজনীতিকে এমনভাবে নির্মাণ ও প্রশয় দেওয়া হয়েছে যে মনে হবে লেপচা নামে কোন জনজাতি নেই। তাই তাদের মাতৃভূমি ও ভূমিপুত্রের মর্যাদা অনৃত বিষয় মাত্র। অজস্র প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য চুক্তি ও বোঝাপড়ার লম্বা তালিকা থাকলেও ভূমিপুত্র লেপচাদের কখনোই একটি পক্ষ হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। অথচ ক্রমবর্ধমান, যার একটি কারণ অবশ্যই অনুপ্রবেশ, নেপালি ডায়াসপোরাকে কাছে পাওয়ার আশায় জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে লজ্জাকর

প্রতিযোগিতা চলেছেই। একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করার চক্রান্ত অবশ্য ঔপনিবেশিক কাল থেকেই চলেছে[৫]।

দুই

২০১৩ সালের প্রথমদিকে লেপচাদের বিনাশসাধনের বিষয়টি প্রকাশ্যে চলে আসে নেপালী ডায়াসপোরার এক নেতার মন্তব্যের মধ্য দিয়ে। বিনাশের প্রকল্পটি, অবশ্য, একেবারে আনকোরা নয়। ১৯৬০-৮০র সময়কালে এই বিতাড়ন ও বিনাশের চেষ্টা চলে কিছুটা গোপনে। বাঁচার তাগিদে বহু লেপচা ঘরছাড়া হন। কিন্তু প্রকাশ্যে ঘোষণা করে লেপচা বিতাড়নের পরিকল্পনা এই প্রথম। নেপালী নেতা বিমল গুরুং, যিনি এককালে সুভাষ ঘিষিং' এর দক্ষিণহস্ত ছিলেন, তার মন্তব্য 'GJM নেতৃত্বের কথা অনুযায়ী না চললে লেপচাদের পাহাড় থেকে বিতাড়িত করা হবে[৬] অর্থাৎ নিজেদের মাতৃভূমি থেকে লেপচারা বিতাড়িত হবেন অভিবাসী নেপালীদের দ্বারা। দু–একটি রাজনৈতিক দল ছাড়া এই সীমাহীন ঔদ্ধত্যের কোন প্রতিবাদ বড় দলগুলি করেনি। এমনকি যে পৌরসমাজ এখন প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছে তাও ছিল নীরব। পরবর্তী সময়ে সমতলের একটি -'প্রতিবাদী' মানবিক অধিকার রক্ষাকারী গোষ্ঠী নেপালীদের ওপর 'রাজ্য সরকার অত্যাচার করছে' এই মন্তব্য করে সরব হয়ে ওঠে। লেপচাদের অস্তিত্বের সংকটকে তারা ধর্তব্যের মধ্যেই আনেনি। সুতরাং 'প্রতিবাদী' হওয়াটা শ্রেণীবিন্যাসে কার কোথায় কতটা সুবিধা হতে পারে তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

লেপচারা নেপালী নন। সংস্কৃতি ও মানসিকতার দিক থেকেও তারা পৃথক জনগোষ্ঠী। কালিম্পং -দার্জিলিং এর 'Gentlemen Tribe' বলতে একমাত্র লেপচাদেরই গণ্য করা যেতে পারে। লেপচা জনসম্প্রদায় কারা তা নিয়েও পরিচয়ের রাজনীতিতে ব্যস্ত নেপালী ডায়াসপোরা। তারা নেপালী জনগোষ্ঠীগুলিরই অন্তর্ভূক্ত একটি গোষ্ঠী বা জাতি (Caste) এমন প্রচারের উদাহরণ, নেপালী ইতিহাসকার ও প্রাবন্ধিকদের রচনায় ভূরিভুরি রয়েছে। আবার ইদানীং লেপচাদের 'কিরাত' সম্প্রদায়ের লোক বলে তারা নেপালীদের জাতভাই এমন প্রচারও জোর কদমে চলেছে। নেপালের একটি গোষ্ঠী এই প্রচারকে ইন্ধন দিয়েছে[৭]। পরিচয়ের রাজনীতির এই বির্বতন উদ্দেশ্যহীন বলা সঙ্গত হবে না। কারণ লেপচাদের জাতিসত্তার আন্দোলন যতই গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে ততই এই ধরনের প্রচারগুলি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। ভূমিপুত্রদের জাতিসত্তার উত্থান তথাকথিত 'গোর্খা' জাতিসত্তার ভীতির কারণ হয়েছে এবং সেই কারণেই পৃথক পরিচয়কে গ্রাস করে এটা এক ধরনের Ethnocide এর কৌশল গ্রহণ।

বর্তমানে নেপালের ইলাম অঞ্চল, সিকিম, দার্জিলিং ও কালিম্পং–পার্বত্য অঞ্চল এবং সন্নিহিত পাদদেশ সমতল লেপচাদের প্রাচীন 'Mayel-lyang' এর অংশ– লেপচাদের আদি বাসভূমি। তার বহুল প্রমাণও রয়েছে। পূর্ব হিমালয়ের জনজাতিগুলির আধুনিক নৃতাত্ত্বিক–

প্রত্নতাত্ত্বিক-ভাষাগত গবেষণাগুলির পর্যবেক্ষণ : খৃষ্টপূর্ব ৫০০০-৩০০০ বছর পূর্ব থেকেই এই অঞ্চলে আদি লেপচাদের অস্তিত্বের প্রমাণ রয়েছে[৮]। এই অঞ্চলের স্থাননাম এবং জৈবজগতের প্রায় সব বস্তু ও প্রাণীর নাম লেপচা ভাষার। স্মরণে রাখা দরকার, ১৯৯২ সাল পর্যন্ত এই পার্বত্য এলাকায় স্বীকৃত সরকারী ভাষাগুলির একটি অন্যতম ভাষা ছিল লেপচা ভাষা (Rong-ring)। ১৮৩৫ সালে প্রণীত 'দার্জিলিং ডিড ' যে ভাষাগুলিতে লিপিবদ্ধ হয় তার একটি ছিল লেপচা। নেপালী ভাষার কোনো ঐতিহ্যগত অস্তিত্ব ছিল না। একদা (১৭৮৮-৮৯) নেপালের রাজা দার্জিলিং অঞ্চল ও সিকিম দখল করেন সাম্রাজ্যবাদী অভিযানের অঙ্গ হিসেবে। পরবর্তীকালে (১৮১৫-১৬) ব্রিটীশ সেনা নেপালীদের বিতাড়িত করে ঐ এলাকা সিকিম শাসকদের ফিরিয়ে দেয়। ইদানিং এই সাম্রাজ্যবাদী দখলদারীকে উপজীব্য করেই 'দার্জিলিং কালিম্পং অঞ্চল নেপালীদের' এই জিগির তোলা হচ্ছে। সৌভাগ্যক্রমে বর্তমান যুক্তরাজ্যের শাসকরা এমন জিগির তোলেননি যে ভারতবর্ষটা আদতে তাদেরই। শুধু তাই নয়, নেপালি ডায়াসপোরার আধিপত্যকে নিরঙ্কুশ করার প্রয়াস চলেছে ইতিহাসের বিকৃতি বা স্বনির্মাণের মধ্য দিয়ে। লক্ষ্য করার বিষয় হলো- এই ধরনের প্রচার চলেছে অধুনা ১৯৮০-৯০ এর দশক থেকে।

১৮১৫ সালের সিগৌলী চুক্তির একবছরের মধ্যে নেপালী সেনাদের দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করা হয়। কিন্তু নেপালী ও ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থরক্ষার লড়াই ছিল এটি- তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সিকিম, কালিম্পং ও দার্জিলিং এর ব্রিটীশ আধিপত্য সুনিশ্চিত হওয়ার পর ঔপনিবেশিক নীতির স্বার্থেই একটি বিপরীতমুখী পরিবর্তন সূচিত হয়– ব্রিটীশ শাসক ও নেপালের তৎকালীন রাজার মধ্যে সখ্যতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়[৯]। নিজেদের অধীনস্থ এলাকায় আধিপত্যকে দীর্ঘস্থায়ী করার মানসেই এই সম্পর্কের পরিবর্তন। তথাকথিত 'গোর্খা' নামধেয় নিরাপত্তারক্ষীদের আবেষ্টনীতে কালিম্পং, দার্জিলিং এর ব্রিটীশ বাণিজ্যনীতি ও আধিপত্যকে অমর-অজেয় করার প্রয়োজনই ছিল মূল বিষয়। আনুষঙ্গিক কিছু সমস্যা ও বিপদের আশঙ্কাও ব্রিটীশ আধিকারিকদের ব্যতিব্যস্ত করেছিল : (ক) ব্রিটীশরাজের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ লেপচা ভূমিপুত্রদের আনুগত্যহীনতা ও তজ্জনিত ভীতি[১০]। (খ) সমতলের ব্রিটীশ বিরোধী জাতিয়তাবাদী আন্দোলন কোনভাবেই পাহাড়ের 'প্রবাসের ইংল্যান্ড'-কে উত্তপ্ত না করুক এই ভাবনা, (গ) কালিম্পং ও দার্জিলিংকে ঔপনিবেশিক শহর তথা শাসনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকাঠামো অব্যাহত রাখার ভাবনা, এবং (ঘ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দীর্ঘস্থায়িত্বের ফলে উপনিবেশগুলি থেকে সৈন্য সংগ্রহ করার মারাত্মক তাগিদ ইত্যাদি।

এই পটভূমিতে অন্ধ আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা ভাড়াটে সৈন্যের জন্য ব্রিটীশ ঔপনিবেশিক চাহিদা থেকেই জন্ম নিল 'অকুতোভয়' ও 'অনিঃশেষ' শ্রমের বিরতিহীন উৎসবের তত্ত্ব এবং মিথ : 'গোর্খা' mercenary-র বীরগাথা। দার্জিলিং শহর পত্তনের দুই ব্রিটীশ নায়ক

ক্যাম্পবেল্ ও লয়েড্ স্বভাবতঃই প্রকাশ্যে আমন্ত্রণ জানালেন নেপালের নেপালীদের। অনতিবিলম্বে শুরু হলো নেপালীদের শেষহীন অনুপ্রবেশ প্রক্রিয়া যা আজও চলেছে ভিন্নরূপে, ভিন্ন প্রকরণে। এর স্বাভাবিক কিন্তু আশঙ্কাজনক পরিণতি কালিম্পং-দার্জিলিং এর ক্রমবর্ধমান ডায়াসপোরা। স্বাধীনতা উত্তরকালে ব্রিটীশ শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ নেতৃবর্গ ও রাজনৈতিক দলগুলির বদান্যতায় এই অনুপ্রবেশের ধারায় কোন ছেদ পড়েনি। প্রশ্রয়ের রাজনীতি তখন গুরুত্ব পেয়ে গেছে এবং নিছকই ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যার নেপালী ডায়াসপোরা এখন নিয়ন্ত্রক শক্তি, নিয়ন্ত্রিত প্রজাবর্গ নয়। খুব স্বাভাবিকভাবেই অনুপ্রবশকারীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব নিয়েও চলেছে দুর্নীতি ও রাজনীতি।[১১] এখানে রাষ্ট্রের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে। প্রাপ্ত তথ্য অন্ততঃ তাই বলে। ইদানীং 'বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ' নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছেন, অথচ নেপালিদের অনুপ্রবেশ নিয়ে তিনিই নীরব। এটিকে প্রশয়ের রাজনীতির BJP-Type বলা যেতে পারে। সর্বোচ্চ আদালত থেকে কিছুকাল আগেও এ নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করা হয়েছে। কারণ, ব্যাপক বে-আইনী অনুপ্রবেশের ফলে যে সীমান্ত অঞ্চলগুলির জনবিন্যাস ও রাজনীতি অস্বস্তিকর রূপ ধারণ করেছে তার অন্যতম উদাহরণ হলো কালিম্পং -দার্জিলিং ও সংলগ্ন ভূভাগ। এই সামগ্রিক প্রক্রিয়ার মূল শিকার লেপচা ভূমিপুত্ররা।

তিন

নেপালীদের অনুপ্রবেশ এবং ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া শুধু ব্রিটীশ শাসক নয়, তৎকালীন নেপালরাজের মদতেই শুরু হয়েছিল। ভারতবর্ষ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করুক সেটি নেপালরাজের কাম্য ছিল বলে মনে হয় না। কারণ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের স্বাধীনতা প্রাপ্তি নেপালের স্বেচ্ছাচারী অগণতান্ত্রিক শাসনে বিঘ্ন ঘটাতে পারে এমন আশঙ্কা স্বেচ্ছাচারী নেপালী শাসকদের উদ্বিগ্ন করেছিল সন্দেহ নেই। ১৮৭৫ এর সিপাহী বিদ্রোহের দমনের ইতিহাস তার বড় উদাহরণ। 'গোর্খা' নামের আড়ালে ভাড়াটে নেপালী সৈন্যদের ব্যবহার করে এই মহাবিদ্রোহ দমন করা হয় ব্রিটীশ শাসক ও তৎকালীন নেপালরাজের প্রত্যক্ষ মদতে এবং উপস্থিতিতে। মূল ভয়টি ছিল ক্ষমতা হারানোর ভয়। এই ভীতি একদিকে যেমন ব্রিটীশ ও নেপালী শাসকদের পীড়িত করেছিল তেমনই কালক্রমে নেপালী ডায়াসপোরাকে চিন্তাগ্রস্ত করে তোলে। আমি এখানে ইঙ্গিত করছি মূলত ডায়াসপোরার এলিটবর্গকে। শুধু রাজনীতিতে নয়, নেপালী সাহিত্যে-প্রবন্ধে কবিতায় এই আশঙ্কা প্রত্যক্ষভাবে বা প্রতীকিরূপে বারংবার উল্লেখিত হয়েছে। যে প্রীতির সম্পর্ক ব্রিটীশ ও নেপালী প্রশাসকদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল সেই সম্পর্কেরই আর এক প্রকাশ ঘটেছিল ঔপনিবেশিক ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা নেপালী এলিট ও দার্জিলিং কালিম্পং এর ব্রিটীশ প্রশাসকদের মধ্যে। সম্পর্কটি গভীরভাবে দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক যা ঔপনিবেশিক শাসনে চালিকাশক্তিও বটে। কিন্তু ঔপনিবেশিক কায়েমের নিগড়ে পিষ্ট সাধারণ মানুষও অনেক

ক্ষেত্রে মনে করে বসেন সম্পর্কের অংশীদার তারাও -যা আদৌ সত্য নয়।

এই ঔপনিবেশিক টান-পরিয়ানের মধ্য দিয়ে তির্যকগতিতে নেপালী ডায়াসপোরার উত্থান ঘটে। এই উত্থান সার্বিক ভাবে নেপালী এলিটদের ক্ষমতা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া। এরা অনেকেই ছিলেন ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে শিক্ষিত ও দীক্ষিত এবং ক্ষেত্রবিশেষে খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত। জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছল্য এদের ছিল। লেপচাদের মাতৃভূমিতে নেপালিদের 'হোমল্যান্ড্' গড়ার কারিগর ছিলেন এরাই। এদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিল ব্রিটীশ বণিক, ধর্মযাজক এবং রাষ্ট্র আধিকারিকরা। কালিম্পং এর এক অতি পরিচিত ধর্মযাজক নেপালী 'হোমল্যান্ড্' এর এক প্রথম সারির সমর্থক ছিলেন।

নেপালী ডায়াসপোরার বাকি অংশ ছিল নিতান্তই সাধারণ শ্রমজীবি কৃষিজীবি জনতা। ১৮৩৫ সালে দার্জিলিং এবং ১৮৬৫ সালে কালিম্পং ব্রিটীশ শাসকদের করায়ত্ত হবার কয়েক দশকের মধ্যেই নেপালীরা কালিম্পং, দার্জিলিং ও সিকিম অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনবর্গ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সেনশাস রিপোর্টগুলির সঠিক বিশ্লেষণ করলে এই তথ্যই প্রমাণিত হয়। অনুপ্রবেশের প্রথমযুগে নতুন 'হোমল্যান্ড্' এর স্বপ্ন চাপা পড়েছিল ক্রুর নেপালীশাসকদের, যারা ছিলেন 'গোর্খা' ঐতিহ্যের ধারক, অত্যাচার থেকে মুক্তির স্বপ্নে বিভোর। লয়েড্-ক্যাম্পবেলদের নিয়ন্ত্রণ ও প্রশয় সেই স্বপ্ন বা আকাঙ্খাকে প্রবলতর করে তোলে। বিংশ শতকের প্রারম্ভেই এই পার্বত্য অঞ্চল মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণেই নেপালী ডায়াসপোরার দখলে চলে যায়। কিন্তু এই নতুন স্বপ্ননীড় হারানোর আশঙ্কাও তাদের কাছে পীড়াদায়ক ছিল প্রতি মুহূর্তেই। কারণ যতই চিল-চিৎকারে গলা ফাটানো হোক না কেন - এই অঞ্চলটি যে তাদের নয়–লেপচাদের, সেটা যেমন সর্বজন স্বীকৃত; তেমনই রাষ্ট্র ইচ্ছে করলে তাদের বিতাড়িত করতে পারে এই ভীতিও অমূলক ছিল না। যেমনটি কিছুকাল আগে ভুটান রাষ্ট্র করতে বাধ্য হয়। এই অস্বীকৃতির তকমাটি, যার প্রথম প্রশাসনিক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় সম্ভবত সর্দার প্যাটেলের বক্তব্যে, কোনকালে নেপালী ডায়াসপোরা-তা বিলোপ করতে পারবে বলে মনে হয় না।[১২]

চার

অতএব আশু কর্তব্য হলো, লেপচাদের মাতৃভূমিতে 'গোর্খাল্যান্ড্' গঠন করা। সে প্রয়াসের যে অন্ত ছিল না তা নেপালী এলিট্দের ঘনঘন পিটিশন জমা দেওয়ার ইতিহাসের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ঔপনিবেশিক ও উত্তর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র শাসকদের এবং রাজনৈতিক অনুঘটকগুলির বৃহদংশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে এই প্রয়াস যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৮৬৫ সালে কালিম্পং দখল করার অব্যবহিত পরেই এই অঞ্চলের অর্থনীতি ও রাজনীতিকে করায়ত্ত করা হয় পরপর বেশ কতকগুলি Survey - Settlement এর মাধ্যমে। এর পরিণতিতে একদিকে যেমন লেপচারা তাদের বহু পুরুষের ভিটেমাটি হারায় তেমন অন্যদিকে জমি তুলে দেওয়া হয় অনুপ্রবেশকারী, অবশ্য আমন্ত্রিতও বটে-তাদের হাতে

অর্থাৎ নেপালীদের হাতে। ১৯০৫ ও ১৯২০ সালের Survey-Settlement Report দু'টির তুলনা করলেই এই মালিকানার হাত বদলের বিষয়টি সহজেই প্রমাণ করা যায়[১৩]। ক্রমে নেপালী ঠিকদাররা 'তাদের দেশওয়ালী ভাইবোনেদের নিয়ে আসে জমি-জিরেত পাইয়ে দেবার নামে'। বলাবাহুল্য, ব্রিটীশ শাসকদের সম্মতিতেই এসব ঘটেছিল। এর মধ্য দিয়েই নেপালী অনুপ্রবেশকারী ও ব্রিটীশ শাসকদের পরস্পরের অস্তিত্ব রক্ষার সার্থক সম্পর্কটি আরো অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। কালিম্পং ও দার্জিলিং এর পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে 'হোমল্যান্ড' তৈরীর রাজনীতি এই সম্পর্কের মধ্যেই পুষ্টি লাভ করেছিল। অন্যভাবে বলা হয়, ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রশ্রয়েই 'গোর্খাল্যান্ডে'র রাজনীতি জন্মলাভ করেছে এবং শাখাপ্রশাখায় বিস্তার লাভ করেছে।[১৪]

অস্বাভাবিক হলেও বিংশ শতকের প্রথম পর্বেই লেপচা ভূমিপুত্রদের বিনাশ সাধনের সবরকম প্রচেষ্টাই চলেছিল : ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল, লেপচারা 'Dying race'। কিন্তু অনুপ্রবেশের উত্তরাধিকার বহন করে চলা বিমল গুরুং এর মতো, লেপচাদের তাদের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়নের হুমকি দেখানোর হাস্যকর চেষ্টা তখনো করা হয়নি। অবশ্য সেকালের শিক্ষিত নেপালী এলিটবর্গ সে মূর্খামি না করলেও ভিন্ন প্রক্রিয়ায় লেপচাদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছিলেন। নিজেদের 'হোমল্যান্ড্' এর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার প্রয়োজনে কিছু লেপচা ও ভুটিয়া (তিব্বতী) নেতাদের স্তোকবাক্য দিয়ে দলে টেনে 'Ne-Bu-La' আন্দোলন শুরু করা হয় ১৯৩০ সালে। এই দলে টানার রাজনীতি প্রমাণ করে নেপালী এলিটরা নিজেদের 'বিদেশী' তকমা নিয়ে ভীত। যাইহোক অনতিবিলম্বে এই সত্যটি প্রকাশিত হয়ে পড়ায় লেপচা ও ভুটিয়া নেতৃবর্গ ঐ আন্দোলন থেকে নিজেদের সরিয়ে নেন। কিন্তু দ্রুত বর্দ্ধমান নেপালী জনসংখ্যার শক্তিতে বলিয়ান নেপালী এলিটরা ততদিনে সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে পড়া লেপচা-ভুটিয়াদের হেলায় পরিত্যাগ করেন।[১৫]

এই পর্বের আলোচনা শেষ করার আগে আরো কিছু বিষয়কে বিশ্লেষণের আওতায় আনা জরুরী। যেমন, নেপালী ডায়াসপোরা এবং তার এলিট নেতৃবর্গের ভূমিকা। কারণ শুধুমাত্র লেপচা জনজাতি নয় পার্বত্য অঞ্চলের এবং সর্বোপরি দেশের সামগ্রিক অস্তিত্বে ও তার প্রভাব পড়ে। কালিম্পং-দার্জিলিং এর নগরপত্তনে ভাড়াটে শ্রমিকরা মূল নেপাল থেকে আগত সন্দেহ নেই। তবে আমন্ত্রক ব্রিটীশ শাসক এবং আমন্ত্রিত নেপালীরা উভয়েই নিজ-নিজ স্বার্থ সিদ্ধির দিকটাকেই প্রাধান্য দিয়েছে - উদারতা বা আত্মোৎসর্গের কোনো ব্যাপার সেখানে ছিল না। অন্যদিকে লেপচা জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ব্রিটীশ শাসকদের কোনো ব্যাপারে সহযোগিতা করেনি – না নগরপত্তনে, না চাকর সাহেবদের মুনাফালাভে। এর ফলে ঔপনিবেশিক তথা পুঁজি অর্থনীতি ও রাজনীতিতে যে অসুবিধের সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর করার চেষ্টা করা হয় নেপালী অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা। স্বভাবতই সেকালের নেপালী নেতৃত্বের ব্রিটীশভজনা অত্যন্ত প্রকট। এবং হাতে গোনা কয়েকজন ব্যক্তি ছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ

নেতৃত্বের কাছেই ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সাফল্য একেবারেই কাম্য ছিল না।

নেপালী অনুপ্রবেশ এবং স্থিতু হবার প্রক্রিয়া শহর গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই সমানভাবে চলেছে। কিন্তু গ্রামের কৃষিব্যবস্থা ব্রিটীশ সিন্দুকে রাজস্ব বৃদ্ধি ঘটালেও পাহাড়ের রাজনীতিতে কৃষকের পরিবর্তে নাগরিক এলিটদের ভূমিকা ও প্রভাব ছিল প্রায় নিরঙ্কুশ।অথচ ঔপনিবেশিক পুঁজির দৌরাত্ম্যে ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে গ্রামজীবন এবং তার প্রাকৃতিক পরিমন্ডল ও সংস্কৃতি। শৈলশহর পত্তনে ও ক্রমবর্ধমান নেপালীদের বসতিস্থাপনে নির্মূল হয়েছে অগুন্তি বৃক্ষ মহীরুহ। ১৯২৫ সালে প্রাকৃতিক বিপর্যয় সংক্রান্ত একটি সরকারী রিপোর্টে তা স্বীকার নেয় ব্রিটীশ সরকার। একালে ১৯৮০ র দশকে 'গোর্খাল্যান্ড' আন্দোলনের সময় থেকে এযাবৎ পাচার হয়েছে প্রাচীন অরণ্যের বহু বৃক্ষরাজি। এগুলি কি আন্দোলনের স্বাভাবিক উপজাত সমস্যা- নেপালী নেতৃবর্গের নীরবতা এ যাবৎ বহাল আছে। জমির মালিকানা ও ব্যবহার সংক্রান্ত ব্রিটীশ নীতিতেও লাভবান হয়েছে নেপালী ডায়াসপোরা। জমি সংক্রান্ত বিবাদগুলিতে ব্রিটীশ অনুগ্রহ লাভ করেছে তারাই। এমন কি অনেকক্ষেত্রে জমির মালিকানা কেড়ে নিয়ে তা লিজে ভোগ করার সত্ত্ব দেওয়া হয়েছে খাজনার বিনিময়ে। এতে নেপালী অনুপ্রবেশকারীদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়নি; ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে লেপচারা। কারণ যাদের কোনো মালিকানাই ছিল না তাদের কাছে লিজই পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা। শুধু তাই নয় অনুপ্রবেশ লিজ প্রদান এবং পরিকাঠামো নির্মাণে অধিগৃহীত হয়েছে লেপচাদের জমিগুলিই। এমন কি এক একটি গ্রাম দখল করে সমস্ত লেপচা অধিবাসীদের পুর্নবাসন দেওয়া হয়েছে প্রত্যন্ত অঞ্চলে। দার্জিলিং এলাকার চা বাগানগুলির অধিকাংশই বিতাড়িত লেপচাদের।

অতি অল্প সময়ে জনঘনত্ব অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় পাহাড়ের নৈসর্গিক ভারসাম্য যেমন বিঘ্নিত হয়েছে তেমনই ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি। 'গোর্খাল্যান্ড' আন্দোলন এই পরিস্থিতিকে আরো ভয়াবহ করে তুলেছে। ঘিসিং এর নেতৃত্বে পরিচালিত চল্লিশ দিনের পাহাড় বনধে ধ্বংস হয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জলসরবরাহ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, ঐতিহ্যময় ঘরবাড়ি এবং অন্যান্য পরিষেবা। এর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ২০১৩ সালে বিমল গুরুং এর নেতৃত্বাধীন বনধে। কাটমানি ও তোলাবাজির দৌরাত্ম্য, দাদাগিরি বা বেআইনিভাবে যত্রতত্র বিপজ্জনক আবাস নির্মাণের প্রবণতায় পড়েনি কোন ছেদ। এই ধরণের কার্যকারণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই একজন চতুর্থশ্রেণীর কর্মী হয়ে উঠেন একটি মহাকুমার দন্ডমুন্ডের কর্তা; বা একজন বাসডিপোর স্টার হয়ে উঠতে পারেন টেনিস কোর্টসহ বহুবিধ সম্পত্তির মালিক[১৬]। শিক্ষা ব্যবস্থার নৈরাজ্য নিয়ে বাক্যব্যয় করা অপ্রয়োজন, কারণ অনেকগুলি প্রজন্ম ইতোমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সন্দেহ নেই। বলিপ্রদত্ত হয়েছে আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান–গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থা- ঘিসিং এর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপেই যার সূত্রপাত ঘটেছিল। এর ফলে গ্রামগুলি উন্নয়ন ও পরিষেবা থেকে বঞ্চিত

হলো তাই নয়; ব্রিংস হলো সার্বিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়াটি। অন্যভাবে বলা যায়, 'গোর্খাল্যান্ড্' আন্দোলন চরিত্রগত দিক থেকে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের আন্দোলন । বিরোধীপক্ষ, নেপালী ছাড়া অন্য জাতি ও জনজাতির অস্তিত্ব এসবই আক্রান্ত হয়েছে এই একাধিপত্যের শাসনে। ইদানিং অবশ্য গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা পঞ্চায়েতের পুনরুত্থানের জন্য দরবার করা শুরু করেছে। কিন্তু তাকিয়ে দেখলে বোঝা যায় পঞ্চায়েত নিয়ে নেপালী নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গির কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। ঘিসিং এর কাছে পঞ্চায়েতগুলি ছিল বিকেন্দ্রীকরণের হাতিয়ার হিসেবে সবিশেষ বিপজ্জনক। গুরুং এর কাছে পঞ্চায়েত পরিণত হতে চলেছে আধিপত্য তথা কেন্দ্রীভবনের এবং নজরদারির হাতিয়ার। স্মরণে রাখা দরকার, ঘিসিং ও গুরুং উভয়েই একসময়ের সহযাত্রী; গুণগত ও মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা অনুচিত হবে না যে, পাহাড়ের জনপ্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থাটাই দূষিত হয়ে পড়েছে এই একাধিপত্যের কারণে। এই প্রসঙ্গে এ জাতীয় আন্দোলনের তাত্ত্বিক শূন্যতা বা ভড়ং এর দিকটিও উল্লেখ করা জরুরী। কালিম্পং অঞ্চলে দুই পর্বের 'গোর্খাল্যান্ড্' আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা থেকে বলা যেতেই পারে- এই জাতীয় আন্দোলনগুলি অনেকাংশে বিব্রিংসী; সে তুলনায় গঠনমূলক বা সমপ্রতিনিধিত্বমূলক নয়। স্বশাসনের বা মানবিক অধিকাররক্ষার নামে 'গোর্খাল্যান্ড্' আন্দোলন অগণতন্ত্র, স্বার্থপূরণ, দুর্নীতি, মিথ্যাচার এবং সংখ্যালঘু জনজাতিগুলির বিলোপ সাধনে অধিক আগ্রহী। সুতরাং এ জাতীয় আন্দোলন মানেই বিকেন্দ্রীকরণ, জনগণের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে উন্নয়ন এবং সর্বোপরি জাতিসত্তার স্বতন্ত্র পরিচিতি লাভ- এমন তত্ত্বকথার পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন।

শুধুমাত্র জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্যের দাবিটিও এখানে প্রশ্নাতীত নয়। কালিম্পং-দার্জিলিং-ডুয়ার্সের কোন জাতি ও জনজাতির কোন্ সম্প্রদায়ের জাতিসত্তার পরিচিতির দাবি করতে চায় 'গোর্খাল্যান্ড্' আন্দোলন ? বলা বাহুল্য নেপালী ডায়াসপোরার ! তাহলে ভূমিপুত্র লেপচাদের জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্যের দাবিটি কোথায় স্বীকৃতি পাবে ? ডায়াসপোরার স্বশাসন আগে না ভূমিপুত্র লেপচাদের স্বশাসনের দাবিটি আগে ? লেপচা উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের অব্যবহিত পরেই বহু গুণিজন মন্তব্য করেছিলেন : 'পাহাড়ে বিভাজনের রাজনীতি চালানো হচ্ছে'। অথচ দীর্ঘ দু'শো বছর নেপালীরা ক্রমাগত লেপচাদের কোণঠাসা করে চলেছে, সে ব্যাপারে কোনো বক্তব্য রাজনৈতিক মহলে শোনা যায়নি বা গুণিজনসমৃদ্ধ কোনো গণ চ্যানেলে বা সংবাদপত্রে। প্রকৃত পরিচয়ে লেপচা জনজাতি ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনদর্শনের নিজস্বতা নিয়ে এক স্বতন্ত্র মানবগোষ্ঠী।[১৭] নেপালী নামের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের কোনো স্বাভাবিক নৈকট্য নেই; কিন্তু প্রান্তিক হওয়ার কারণেই ভূমিজ লেপচারা বারংবার বিক্রিত হয়েছে। ক্রেতাদের মধ্যে একদিকে রয়েছে তিব্রতী, ভুটানী, নেপালী ও ব্রিটীশ শাসকরা; অন্যদিকে উপনিবেশ-উত্তর যুগে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলগুলি। অবিরাম নেপালী

অনুপ্রবেশের ফলে লেপচারা শুধুই জমিজমা ভিটেমাটি হারায়নি। হারাতে বসেছে জনজাতির সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান চিহ্নগুলিও। একই সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে নেপালিরা লেপচাদের রাজনৈতিক পরিসর থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টায় রত। তথাকথিত 'গোর্খাল্যান্ড্' কেন্দ্রিক আন্দোলনের প্রয়াস আসলে লেপচাদের দাসত্বের বাঁধনে বেঁধে বিক্রয় করার অধুনাতম প্রচেষ্টা মাত্র। প্রাসঙ্গিকভাবে আরো একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত বলে মনে করি : নেপালি ডায়াসপোরা আত্মিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক দিক থেকে নেপাল রাষ্ট্রের সঙ্গে গভীর সম্পর্কের বাঁধনে আবদ্ধ। আজও, অতএব, 'গোর্খাল্যান্ড্' আন্দোলন কতটা সেই বন্ধনের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে- সেটাও বিশ্লেষণ করা দরকার। প্রশ্রয়ের রাজনীতি থামিয়ে যে জনগোষ্ঠীর যা প্রাপ্য তা মিটিয়ে দেওয়াই শ্রেয়।

বাস্তবে 'গোর্খাল্যান্ড্' আন্দোলনকে আমরা বড়ো একপেশে ভাবে দেখতে অভ্যস্ত : যেন নেপালিদের 'মাতৃভূমিকে' ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার দখল করে রেখেছে। এই অতিকথনটি তিরোহিত না হলে এই আন্দোলনটির চরিত্র, তার বহুস্তরীয় জটিল প্রক্রিয়া এবং সম্প্রদায় নির্বিশেষে জনমানসের ভূমিকাকে যথোচিত ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়; রাজনীতি করা সম্ভব। লেখার শুরুতে সঙ্গীত শিল্পীর রচনা বা বায়ব রাজনীতির উল্লেখ করেছিলাম, যে গুলির পক্ষপাতদুষ্টতা এবং অনৃতভাষণকে চিহ্নিত করা ও প্রতিবাদ করাটা জরুরী। তা না হলে লেপচা ভূমিপুত্ররা যেমন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তেমনই 'বৃহৎ নেপাল' নির্মাণের প্রকল্পটি ভারতীয় সার্বভৌমত্বের বিনিময়ে সাফল্যলাভ করবে। তার চেয়ে বড়ো বিষয় হলো, ভারতের এই অতিসংবেদনশীল সীমান্ত অঞ্চলটির প্রতি একাধিক শক্তিধর প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নজর রয়েছে সে বিষয়ে আমাদের সকলেরই সচেতন হওয়া প্রয়োজন।[১৮]

তথ্যসূত্র ও টীকা :

১. দীপক দে, ২০১১. প্রসঙ্গ দার্জিলিং, গোর্খাকে. কলকাতা : অনামিকা প্রকাশন.
ইদানিং যে 'গোর্খা' শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে তার বিতর্কিত উৎসের কারণে 'নেপালী' শব্দটিই ব্যবহৃত হবে। শব্দ ব্যবহারের রাজনীতি পরিহার করার আর একটি কারণ হলো ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানোর প্রয়াসকে সমূলে বিনাশ করা। তাছাড়া কতগুলি জনগোষ্ঠীকে তথাকথিত 'গোর্খা' তকমায় 'কসাই' বলে অভিহিত করা অনুচিত। অপর জাতিসত্তাকে সম্মান দেখানো বা সমদর্শী বলে গণ্য করা সম্ভব নয় - 'গোর্খা' শব্দের ইতিহাস ও বর্তমান তাই বলে।

২. প্রশ্রয়ের রাজনীতি একটি রাজনৈতিক কৌশল সন্দেহ নেই। তার কিছু সদর্থক দিকও আছে। কিন্তু প্রান্তবর্তী জনসম্প্রদায়ের কতটা স্বস্তি তাতে হতে পারে সে উত্তরটা অনতিবিলম্বে জানা দরকার। এই কৌশল সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পড়ে দেখা যেতে পারে। Bethany Lacina, September 8.2012. India's slibilizing segment states. *www. rochester edu/ college. site* visited on 1 May 2013.

৩. নীলাঞ্জন হাজরা, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৩. ভিক্ষের চকোলেট খেয়ে পাহাড় কাঞ্চনজঙ্ঘার হাসি

হাসবে ? *এই সময়*, কলকাতা : *Times of India* প্রকাশনা প্রণবকান্তি বসু, ২৪ অক্টো. ২০১৩. 'রিঞ্জু ডোমো কি বাঙালি, পশ্চিমবঙ্গ কী বলবে ?' *এই সময়*, কলকাতা : *Times of India* প্রকাশনা Anjan Dutta. 21 Aug. 2013. "*The wounded soldiers*", Times of India. Kolkata.

৪. Basant B Lama, 2009. The Story of Darjeeling, Nilima Yongone Lama Publications, Dnotill, Kurseong.

৫. বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই লেপচাদের "মুমূর্ষ জাতি" বলে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল দেখুন :
C.A. Bell, 1905. *Final report on the Survey and seltlement of the Kalimpang Goverment Estate in the district of Darjeelling*. 1901-1903, Calcutta: Bengal Secretaritate Press.

৬. সঞ্চয় চক্রবর্তী, ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩. ''গোর্খাল্যান্ডের দাবি মানতে হবে লেপচাদেরও ফের অশান্তির ছকে গুরুংরা'', *এই সময়*. কলকাতা.

৭. *Gorkhas of Dehradun*, gorkhas of dehradun . worldpress. com/history of rais. Site visited on 10 June 2013.
এই লেখাটির আলাদা একটি গুরুত্ব রয়েছে। কারণ লেখাটিতে একদিকে যেমন রয়েছে ভারত বিদ্বেষ, তেমন অন্যদিকে 'গোর্খা' সত্তার পুনর্নির্মাণের প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায়। নেপালী ডায়াপোরার 'গোর্খা' সত্তা নিয়ে মাতামাতির উদ্দেশ্য গভীর অর্থব্যঞ্জক সন্দেহ নেই।

৮. George Van Drien, 2002. *Languages of the Himalayas : An ethnolinguistic Handbook of the greater Himalayan Region*. Leiden : Brill Academic Publishers.

৯. Kanchanmoy Mojumdar, 1975. *Nepal and the Indian nationalist movement*. Calcutta : Firma K.L.Muknopadhyay.

১০. Report on Darjeeling, prepard by W.B. Jeakson. 1854. *Selections from the Records of Bengali*. No. XVII.

১১. D.P. Kar, 2012. *The Gorkhaland movement a clandestine invasion*. Siliguri : N.L. Publishers.

১২. R. Moktan, 2004. *Sikkim, Darjeeling, Compendius of documents*. edited & compiled, Kalimpong.

১৩. *ibid.*, C.A. Bell, 1905.
H.C.V. Puilpot, 1925. *Final report on the survey and seltlement of Kalimpong Goverment Estate*, 1919-1921. Calcutta : Bengal Secretariate Book Depot.

১৪. জহর সেন, ২০১৩. *হিমালয়চর্চা ও দার্জিলিং প্রসঙ্গ*, পৃ. ৭০-৭৩. কলকাতা : চিকিতুষী প্রকাশনী.

১৫. K.S. Singh (ed.), 1982. *Tribal Movement in India*. New Delhi : Manohar Publishers, pp. 341-359.

১৬. দেবাঞ্জন দাস, ''জনপ্রিয়তার সঙ্গে বেড়েছে সম্পত্তি এখন ৭০ একরের খামারবাড়ির মালিক গুরুং''. *বর্তমান*. কলকাতা. ২৯ আগষ্ট, ২০১৩.

১৭. Lyangsong Tamsang, complied, transled a edited. 2008. *Lepcha Folklore and Folk song*. Kolkata : Sahitya Academy.
বইটির ভূমিকাটি গুরুত্বপূর্ণ।
D.T. Tamlong, 2011. *Mayel Lyang and the Lepchas* About Sikkim and Darjeeling. Published by Anima Tamlong. Darjeeling.

১৮. গৌতম সরকার, ''গোর্খাল্যান্ডে মদত চিনের দাবি গোয়েন্দা রিপোর্টে'', *এই সময়*. কলকাতা. ২৮ আগষ্ট ২০১৩।
দেবাঞ্জন দাস, ''গুরুংয়ের পাশে নেপাল, ছবি বেরোছ চীনের কাগজে'' *বর্তমান*, কলকাতা. ৩০ আগষ্ট ২০১৩.

সেবক জানা ও অসীম কর্মকার

খাদ্য নিরাপত্তায় ভারত

খাদ্য নিরাপত্তার ধারণাটি গত কয়েক দশক ধরে পরিবর্তিত হয়েই চলেছে। প্রথম দিকে খাদ্য নিরাপত্তার ধারণায় খাদ্যের জোগানের দিকটিকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হ'ত, যেখানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে যথেষ্ট খাদ্যের লভ্যতাকে (availability) প্রাধান্য দেওয়া হত। ১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনে খাদ্য নিরাপত্তার ধারণাটি প্রসঙ্গে বলা হয় 'availabilaty at all times of adequate world food supplies of basic foodstuffs to sustain steady expansion of food consumption and to offset fluctuation in production and prices.' সবুজ বিপ্লব খাদ্য উৎপাদন বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু দেখা যায় জাতীয় স্তরে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংম্ভরতা অর্জন করলেও দেশের এক বিশাল জনসংখ্যা ক্ষুর্ধাত থাকছে। ১৯৯২ সালে FAO এর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে খাদ্য সুরক্ষাকে 'As an access by all people at all times to the food needed for a healthy life.' বলে ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে খাদ্য নিরাপত্তার ধারণাটি তিনটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে :

(ক) খাদ্যের লভ্যতা (Availability) : খাদ্যের লভ্যতা বলতে বোঝায় জাতীয় স্তরে খাদ্যের জোগানের পর্যাপ্ততা জোগানের ঝুঁকি, জাতীয় স্তরে খাদ্যবন্টনের ক্ষমতা এবং কৃষি গবেষণা খাতে সরকারি বিনিয়োগ।

(খ) খাদ্য অর্জনের ক্ষমতা (Affordability) : এটি বোঝায় ভোগকারীদের খাদ্যক্রয়ের ক্ষমতা। খাদ্যদ্রব্যের দাম পরিবর্তনজনিত আঘাত (price shock) এবং এই আঘাত সহ্য করার জন্য সরকারি কর্মসূচী।

(গ) খাদ্যের গুণগত মান : এটি মূলত বোঝায় খাদ্যের পুষ্টিগত মূল্য। যা পরিমাপের সূচকগুলি হল – খাদ্য বৈচিত্র্য, পুষ্টিগতমান, প্রোটিন গুণ ইত্যাদি।

আলোচ্য নিবন্ধে আমরা মূলত ভারতে বর্তমান খাদ্য নিরাপত্তার মূল বিষয়গুলি আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

খাদ্য নিরাপত্তা ও ভারত

বলা হয় যে ভারতবর্ষ ১৯৮০ র দশকেই খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে গেছে। ১৯৯১-তে শুরু হয় অর্থনৈতিক সংস্কার প্রক্রিয়া। দেখা গেল অর্থনৈতিক সংস্কারের আগে কৃষিবৃদ্ধির হার ছিল জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের থেকে বেশি। ১৯৯০ এর দশকে কৃষি বৃদ্ধির হার ভীষণভাবে কমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের থেকে নেমে যায়। ফলে মাথাপিছু খাদ্যশস্য জোগানের পরিমাণ সংস্কারের প্রথম যুগে কমে যায়। একথাও সত্যি যে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য শুধু খাদ্যের জোগান বাড়ালেই হবে না; চাই প্রকৃত খাদ্যবন্টন ব্যবস্থা। তাই স্বাধীনতা উত্তর কালে চালু হয় রাষ্ট্রের ভর্তুকির মাধ্যমে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ (Food Management) নীতি। ফুড কর্পোরেশন অব্ ইন্ডিয়া (FCI) নূন্যতম সহায়ক মূল্যে (MSP) কৃষকের কাছে খাদ্য সংগ্রহ করত এবং গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে কম দামে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ রেশন দোকানের মাধ্যমে তা বিক্রি হত। ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত গণবন্টন ব্যবস্থার (Public Distribution System) সুবিধা নিতে পারত সকল গ্রামীণ ও শহুরে পরিবার। ১৯৯৭ সাল থেকে সরকারি ভর্তুকি ও খরচ কমানোর জন্য চালু হয় TPDS (Targeted Public Distribution System)। এই ব্যবস্থায় পরিবারগুলিকে APL (Above Poverty Line) ও BPL (Below Poverty Line) শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। নতুন ব্যবস্থায় BPL পরিবার কম খাদ্যশস্য পাওয়ার সুযোগ পায়।

এর ফলে সাধারণ শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে বিভাজন ও বিভেদ সৃষ্টি হয়। কাউকে বলা হল এপিএল আর অন্যদের বলা হল বিপিএল। অথচ এই বিভাজন নিখুঁত করার কোনো পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়নি। ফলে এই ইস্যুটি নতুন করে সামাজিক সংঘাত বেছে নেয়। মূল সমস্যার বিরুদ্ধে গরিব মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে লড়াইকে উসকে দেওয়া হয়। আসলে এই বিভাজনের মাধ্যমে সরকার খাদ্যবন্টনের দায় অনেকটাই কমিয়ে ফেলে। যার ফলে সরকারের সুবিধা হয় নানাভাবে: এতে রেশনে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের পরিমাণ কমে যায়; তার ভরতুকির পরিমাণও কমে যায়। কৃষকদের কাছ থেকেও তার খাদ্যশস্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন কমে যায়। কৃষক তখন খোলাবাজারে ব্যবসায়ীদের কাছে বাধ্য হয়ে খাদ্যশস্য বিক্রি করে। এইভাবে সরকার তার মজুত ভান্ডার ছোটো করে ব্যবসায়ীদের মজুতদারিতে উৎসাহ দেয়। অন্যদিকে এপিএল গ্রাহকদের রেশনে জন্য পণ্যসামগ্রীর দাম বাজারদরের কাছাকাছি রেখে দেওয়ার জন্য রেশনদ্রব্য কেনা তাদের কাছে লাভজনক হয় না। মনে রাখা দরকার, গণবন্টন ব্যবস্থা খোলাবাজারের সমান্তরালে এমন এক ব্যবস্থা যা যথেচ্ছ মুনাফার লক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের যথেচ্ছ মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করে ও প্রতিরোধ করে, শুধুমাত্র তা মাথাগোনা কিছু গরিব মানুষকে কিছু খাদ্য সস্তায় সরবরাহ করে না।

১৯৯৭ সাল থেকেই খাদ্য ভর্তুকি কমানোর জন্য গণবন্টন ব্যবস্থায় বিক্রয় মূল্য (issue price) বাড়তে থাকে সব ধরনের পরিবারের জন্য। ফলত রেশন দোকানে বিক্রির পরিমাণ কমতে থাকে। আর FCI- এর গোডাউনে খাদ্যের মজুত বাড়তে থাকে। ১৯৯৭ সাল ও ২০০৪ সালে খাদ্য সঞ্চয়ের পার্থক্য দাঁড়ায় প্রায় ১০০ মিলিয়নটন। এটা সত্যিই লজ্জাজনক এইজন্য যে ভারতবর্ষে যেখানে এক বিশাল সংখ্যক জনগণ ক্ষুধার্ত সেখানে ভারত খাদ্য রপ্তানি শুরু করে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যারা মূলত এই খাদ্যকে ব্যবহার করে গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে বাড়তে থাকে অপুষ্টি। গবেষণায় দেখা গেছে যে জনসংখ্যার একটি বড়ো অংশ যারা নিয়ম অনুযায়ী BPL তালিকাভূক্ত হওয়ার যোগ্য তারা ভুলভাবে তালিকা থেকে বাদ গেছে। ২০১০ সালেও দেখা যায় সরকার বস্তুতপক্ষে মজুতকারীর ভূমিকা পালন করেছে। ২০১০ সালে যখন দু' সংখ্যার মুদ্রাস্ফীতি চলছে তখন দেখা যাচ্ছে FCI এর গুদামে ১৭ মিলিয়ন টন খাদ্য ইঁদুরে খাচ্ছে যা ২১ কোটি ক্ষুর্ধাত মানুষকে অনাহার থেকে বাঁচাতে পারে। এটা লক্ষ্য করার ব্যাপার যে সরকারি বন্টন ব্যবস্থ্যার (PDS) উপর গ্রামীণ জনগণের নির্ভরশীলতা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বেড়েছে। NSSO এর সমীক্ষা ২০১১-১২ সালে গ্রামীণ পরিবারগুলির ৫০ শতাংশ PDS থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করেছে, যেখানে ২০০৪-০৫ সালে এই পরিমান ছিল ২৩ শতাংশ। আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়-সাম্প্রতিক কালে সরকারি বন্টন ব্যবস্থার দুর্নীতি কয়েকটি রাজ্য সাফল্যের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে।

খাদ্য নিরাপত্তার প্রধান অংশ হল খাদ্যের জোগান। সবুজ বিপ্লবের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষের খাদ্যশস্যের জোগান যেখানে দৈনিক ৩৯৫ গ্রাম/বছর, তা ২০১১ সালে বেড়ে হয়েছে ৪৬২ গ্রাম (পরিশিষ্ট তালিকা)। এটা আরও বেদনাদায়ক যখন আমরা দেখি চাল ও গমের লভ্যতা খানিকটা বাড়লেও অন্যান্য শস্য-ছোলা ও ডালের মাথাপিছু লভ্যতা বাড়ার বদলে কমে গেছে। কলাইয়ের লভ্যতা উক্ত সময়ের মধ্যে বছরে মাথা পিছু ২২.১ কেজি থেকে কমে হয়েছে ১৪.৪ কেজি। খাদ্যশস্যের লভ্যতা যেমন ভোগকে প্রভাবিত করে, তেমনি ভোগ নিয়ন্ত্রণ করে পুষ্টিকে। NSS এর বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে পুষ্টি গ্রহণ (nutritional intake) গ্রাম ও শহর উভয় থেকেই কমে যাচ্ছে। তালিকা -১ থেকে আমরা দেখতে পাই যেখানে ১৯৭২-৭৩ সালে দৈনিক মাথাপিছু শক্তি গ্রহণের পরিমাণ ছিল ২২৬৬ কিলো ক্যালরি, তা ২০০৯-১০ সালে কমে হয় ২১৪৭ কিলো ক্যালরি। শহরে ও গ্রামে মাথা পিছু প্রোটিন গ্রহণের পরিমাণও দেখা যাচ্ছে কমে গেছে। অথচ অবাক বিষয় যে ফ্যাট গ্রহণ কিন্তু বেড়েছে। অতিরিক্ত ফ্যাট গ্রহণ স্থুলতা, টেনশন, ডায়াবেটিস ডেকে আনছে। ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে (NFHS) এর সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে শিশুর অপুষ্টির ভয়াবহ চিত্র। ১৯৯৮-৯৯ সালের তুলনায় ২০০৫-০৬ সালে Under -weight শিশু ৪৭% থেকে কমে হয়েছে মাত্র ৪৫.৯% —

তালিকা -১, ভারতে পুষ্টি গ্রহণ

NSS বছর	শক্তি (মাথা পিছু দৈনিক কি.ক্যা.)		প্রোটিন (মাথা পিছু দৈনিক গ্রাম)		স্নেহ (মাথা পিছু দৈনিক গ্রাম)	
	গ্রাম	শহর	গ্রাম	শহর	গ্রাম	শহর
১৯৭২-৭৩	২২৬৬	২১০৭	৬২.৭	৫৬.৭	২৪.৫	৩৬.৭
১৯৮৩-৮৪	২২২১	২০৮৯	৬২.০	৫৭.০	২৭.০	৩৭.০
১৯৯৩-৯৪	২১৫৩	২০৭১	৫৬.৭	৫৭.০	৩৬.৭	৪২.০
১৯৯৯-২০০০	২১৪৯	২১৫৬	৫৯.১	৫৮.৫	৩৬.১	৪৯.৬
২০০৪-০৫	২০৪৭	২০২০	৫৭.০	৫৭.০	৩৫.৫	৪৭.৫
২০০৯-১০	২১৪৭	২১২৩	৫৯.৩	৫৮.৮	৪৩.১	৫৩.০

উৎস: এন.এস.এস. রিপোর্ট, বিভিন্ন বছর।

২০১৩ সালের Global Hunger Index এর রিপোর্ট অনুযায়ী পৃথিবীর ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা ও ক্ষুধার মাত্রা ভয়াবহ। রাষ্ট্রপুঞ্জের FAO এর তথ্য অনুযায়ী পৃথিবীতে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় ৮৭ কোটি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষুধার্ত মানুষের বাস দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার নিম্ন–সাহারা অংশে। তালিকা –২ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্ষুধার সূচকের ভিত্তিতে ভারত BRICS এবং তার প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে পিছিয়ে। আরও দেখা যাচ্ছে ১৯৯০ সালের তুলনায় এই ব্যাপারে চিন এমনকি বাংলাদেশও ভারতবর্ষের তুলনায় ২০১৩ সালে অনেক সফল।

তালিকা -২, ক্ষুধা সূচক

দেশ	১৯৯০	২০১৩
ব্রাজিল	৭.৮	<৫
রাশিয়া	<৫	<৫
ভারতবর্ষ	৩২.৬	২১.৩
চিন	১৩.০	৫.৫
দক্ষিণ আফ্রিকা	৭.২	৫.৪
বাংলাদেশ	৩৬.৭	১৯.৪
পাকিস্তান	২৫.৯	১৯.৩

উৎস : *IFPRI (2013).*

এ প্রসঙ্গে BRICS অন্তর্ভূক্ত দেশগুলির একটি তুলনা করা যেতে পারে। BRICS অন্তর্ভূক্ত দেশগুলি হল ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন ও দক্ষিণ আফ্রিকা। এই পাঁচটি দেশে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৪০% বাস করে এবং পৃথিবীর মোট GDP র ২৫% এই দেশগুলির। দেশগুলির মধ্যে তুলনা করলেই বোঝা যায় খাদ্য বঞ্চনার তীব্রতা অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় ভারতবর্ষে অনেক বেশি। খাদ্য বঞ্চনার মাত্রা ভারতবর্ষে যেখানে ১২৫, রাশিয়াতে তা মাত্র ১২ ও দক্ষিণ আফ্রিকাতে ১৬। খাদ্যের লভ্যতা ও খাদ্য ক্রয়ের ক্ষমতা ইত্যাদি খাদ্য নিরাপত্তার

সূচকগুলির সাপেক্ষে বিচার করলে দেখা যায় ভারত বেশ কয়েকটি সূচকের নিরিখে অন্য দেশের থেকে পিছিয়ে আছে।

তালিকা-৩, অন্তর্ভূক্ত দেশগুলির খাদ্য নিরাপত্তার চিত্র

	ব্রাজিল	রাশিয়া	ভারতবর্ষ	চীন	দক্ষিণ আফ্রিকা
মোট ভোগে খাদ্যদ্রবের অংশ দারিদ্র সীমারেখার নীচে	১৯.৮	৩৫.৪	৪৯.৫	৩৯.৮	১৭.৮
বসবাসকারী লোকের শতাংশ	১০.৮	০.১	৬৮.৭	২৭.২	৩১.৩
মাথাপিছু GDP(SPPP)	১২,১০০	১৭,৬০৩	৩,৯১০	৯,৪৫০	১১,৯৫০
কৃষি আমদানি শুল্কের হার	১০.৩	১৪.৩	৩১.৪	১৫.৬	৯.১
গড় খাদ্যের যোগান	৩,১৭৩	৩,১৭২	২,৩২১	৩,০৩৬	৩,০১৭
কৃষিতে সরকারি বিনিয়োগ (কৃষি GDP র শতাংশ)	৪	৪	১	১	৫
কৃষি উৎপাদনের অস্থিরতা	০.০৫	০.২৬	০.০৬	০.০২	০.১৯
রাজনৈতিক স্থায়িত্বের ঝুঁকি (০-১০০)	২৫	৫৫	২৫	৫০	৩০
দুর্নীতি	৩	৪	৩	৪	২
খাদ্য বৈচিত্র্য	৬৪	৫৬	৩৮	৪৫	৪৪
অপুষ্টির হার	৬.৯	৫	১৭.৫	১১.৫	৫
খাদ্য বঞ্চনা (মাথাপিছু দৈনিক কি.ক্যাল).	৫৫	১২	১২৫	৭৬	১৬
মানব উন্নয়ন সূচক (০ - ১)	০.৭৩	০.৭৯	০.৫৫	০.৭০	০.৬৩
নারীর আর্থিক সুযোগ (০-১০০)	৬১.০৬	৫০.০২	৪৮.৮৩	৫১.৮৩	৬২.৭৭
গণতন্ত্রের সূচক (১-১০)	৭.১২	৩.৭৪	৭.৫২	৩.০০	৭.৭৯

উৎস : Economist Intelligence Unit (2013).

ভারতে কৃষি সংকট

ভারতের মোট শ্রম শক্তির ৫৮% এবং গ্রামীণ শ্রম শক্তির ৭০% কৃষিতে নিযুক্ত আছে অন্যদিকে, উৎপাদনের নিরিখে কৃষির গুরুত্ব কিন্তু কমে যাচ্ছে। ১৯৭৩ সালে যেখানে মোট উৎপাদনে কৃষির অংশ ছিল ৪১%, তা এখন কমে হয়েছে প্রায় ২০ শতাংশ। কৃষিতে সংকটের অন্য একটি উৎস হল কৃষির গড় জোতের আয়তন নাটকীয়ভাবে কমে যাওয়া। ১৯৬১ সালে গড় জোতের আয়তন যেখানে ছিল২.৬৩ হেক্টর, এখন তা কমে দাড়িয়েছে ১.০৬ হেক্টর। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে অসমভাবে বন্টিত কম জনসংখ্যার বড় জোত ও বড় সংখ্যার ছোট জোত। জোত ছোট হওয়ার কারণগুলি হল পরিবারের মধ্যে জমির ভাগাভাগি,

বড় জোতের মালিককে জমি বিক্রি, কৃষি জমির অন্য ব্যবহারে রূপান্তর, এবং কৃষি জমিকে বড় প্রোজেক্ট যেমন বাঁধ ইত্যাদি তৈরির জন্য ব্যবহার। নয়া উদারীকরণ নীতির ফলে কৃষিতে সরকারি বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে, বাড়ছে বেসরকারি বিনিয়োগ। ১৯৭১ সালে যেখানে বেসরকারি বিনিয়োগ ছিল ৬০%, তা ২০০৩ সালে বেড়ে হয়েছে ৭৫%। অবশ্য শতাংশের বিচারে কৃষি ভর্তুকি বেড়ে চলেছে, যা মূলত ব্যয়িত হয় সারের ভর্তুকি এবং স্বাস্থ্য সহায়ক মূল্য দেওয়ার জন্য। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এর বেশীরভাগই ধনী কৃষকদের পকেটে যায়।

কৃষির এই কাঠামোগত পরিবর্তন কিন্তু কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারেনি। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে কৃষির উৎপাদনশীলতা লক্ষণীয়ভাবে কম। এটা সত্যি, স্বাধীনতা- পরবর্তীকালে সরকারের কৃষির উপর গুরুত্ব প্রদান ভারতবর্ষের গ্রামীণ অর্থনীতি বাঁচিয়ে রেখেছিল। কিন্তু গ্রামীণ পরিকাঠামোগত বিনিয়োগ বেশ কিছু ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনগণের দুর্দশার কারণ হয়েছে। এই ৬০ বছরের মধ্যে সরকার প্রায় ৪০০০ বড় বাঁধ তৈরির প্রকল্প হাতে নিয়েছে এবং তার ফলে ২ কোটি থেকে ৫ কোটি লোক উৎখাত হয়েছে। কৃষিতে নব্য উদারীকরণ নীতি কৃষি ঋণের পরিমান সংকুচিত করেছে। বাড়ছে শিল্প কৃষি; বীজ শিল্পের বেসরকারীকরণ। কৃষকেরা নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে শিল্প তৈরি বীজের ওপর। জিন প্রযুক্তি নির্ভর খাদ্য (genetically modified food) যা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে তাও কর্পোরেট কৃষির উপর নির্ভরতা বাড়িয়ে তুলবে।

শহরে খাদ্য উৎপাদন খবুই সংকুচিত। আধা শহরগুলিতে দেখা যায় গৃহ উদ্যান (home-garden)। এটাও দেখার ব্যাপার যে ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে নিরাপত্তার মাত্রাটি আলাদা। কেরালাতে জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি হওয়া সত্ত্বেও খাদ্য নিরাপত্তার দিক থেকে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এই রাজ্য অনেকটা এগিয়ে। এর একটি অন্যতম কারণ হল কেরালাতে প্রায় ৫০ লক্ষ গৃহ-উদ্যান খাদ্যের জোগানে একটি পরিপূরক ভূমিকা পালন করছে।

কর্পোরেট কৃষি মানুষের খাদ্যের চাহিদা পুরণের পক্ষে অনুকূল নয়। তৃতীয় বিশ্বে কর্পোরেট কৃষি খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়েছে ঠিকই, তবে তা করছে লক্ষ লক্ষ মানুষকে জমি থেকে উৎখাত এবং ক্ষুধার সাম্রাজ্যে নিক্ষেপ করে। পাশাপাশি জল ও বাতাসকে দূষিত করে; এমনকি জমির উর্ববতা শক্তিকে □বংস করে। এতে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। তাছাড়া উদার অর্থনীতির মাধ্যমে যে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ও খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে, তা আসলে বহুজাতিক কর্পোরেট কৃষি সংস্থার (আর্চার ডানিয়েল মিডল্যান্ড, মনসান□ ইত্যাদি) করায়ত্ত। এরাই প্রকারান্তরে আন্তর্জাতিক খাদ্য বাণিজ্য, সার, শিল্প, বীজ ও কীটনাশক, আধুনিক শিল্পজাত কৃষি উপকরণ এমনকি কৃষিভিত্তিক শিল্প (প্রসেসিং) নিয়ন্ত্রণ করে। এইভাবে গুটিকয় সংস্থা কৃষি উৎপাদনের একচেটিয়া কারবার করছে। অসম্ভব ক্ষমতার অধিকারী এগ্রিবিজনেস ও ফুড কর্পোরেশনগুলি একদিকে যেমন কৃষকদের

কাছ থেকে কাঁচামাল ক্রয়ের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে, অন্যদিকে তেমনি বাজারে সাধারণ ক্রেতার কাছে খাদ্য বিক্রির মূল্যও নিয়ন্ত্রণ করে। আর এ কাজ করছে সরাসরি তাদের বাজার শক্তিকে ব্যবহার করে এবং পরোক্ষে বিভিন্ন সরকার, আই এম এফ, বিশ্বব্যাংক এবং ডব্লিউ টিও কে ব্যবহার করে।

বিশ্বায়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা

২০০৭ এবং ২০০৮ সালে বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকট দেখা যায় যা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরী করে। ২০০৮ সালে ২০০৭ সালের তুলনায় গমের দাম বাড়ে ১৩%, সোয়াবিনের দাম বাড়ে ৮৭%, চালের দাম বাড়ে ৭৪%, এবং মেজের দাম বাড়ে ৩১%। কিন্তু এই দামবৃদ্ধির কারণ কি ? বিভিন্ন কারণের মধ্যে মূল কারণগুলি হল– প্রথমত, ইন্টারন্যাশনাল ফুড্ পলিসি রিসার্চ ইনসিটিউট (IFPR) ও ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের মতে খাদ্যশস্যের একটি বড় অংশ ব্যবহৃত হচ্ছে জ্বালানির কাজে। দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন অনেক বেশি পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। খাদ্যশৃঙ্খল (Food Chain) এর প্রতিটি স্তরে তেল আজ অপরিহার্য— তা, হতে পারে রাসায়নিক, গুদামঘর, পরিবহন ইত্যাদি স্তরে। তেলের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাই খাদ্যদ্রব্যের দামবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। তৃতীয়, আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হ'ল ফাটকাবাজি। মজুতকরণের মাধ্যমে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে দাম বাড়ালে, বাড়ে মুনাফার বহরও। ২০০৩ সালে তদানীন্তন সরকার ৫৪ টি দ্রব্যের forward trading এর উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা তুলে নেয়। বাজারে উদারীকরণের ফলে বিভিন্ন রকম উপকরণ যেমন 'commodity derivative', 'option' এর ব্যবহার শুরু হয় যা উৎপাদনের বদলে ফাটকাবাজদের সাহায্য করে। চতুর্থ কারণটি হল, খরা ও বন্যা, যা গম উৎপাদনকারী দেশগুলিতে উৎপাদনের ক্ষতিসাধন করেছে।

এসব কারণ ছাড়া আর একটি বড় কারণ হল কাঠামোগত কারণ। বিগত চল্লিশ বছর ধরে Merger ও Acquisition এর মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থাপনার জগতেও একটি অসম ক্ষমতা সম্পর্কের জন্ম হয়েছে। আজকে খাদ্যের বাজারও নিয়ন্ত্রণ করছে বহুজাতিক সংস্থাগুলি। তাছাড়া ধনিক শ্রেণির চাহিদা বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে রপ্তানিমুখীনতা খোলাবাজারে খাদ্যপণ্যের দাম বাড়িয়ে চলছে। ভারতে ১৯৯১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে খাদ্যশস্য উৎপাদনে জমির পরিমান ১.২ কোটি হেক্টর বা ৯ % কমে গেছে। তাছাড়া, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি উন্নত দেশগুলিতে সস্তায় খাদ্যপণ্যের জোগান দেবে; কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি থেকে শ্রমিক যেতে পারবে না। অন্যদিকে , পণ্য ও পুঁজির কিন্তু সারা বিশ্বব্যাপী অবাধ গতিবিধি। বিশ্বায়ণ ও বাণিজ্য উদারীকরণের ফলে বিগত দু -দশকে ভারতবর্ষে খাদ্য ও কৃষি ব্যবস্থাপনায় এক ধরনের স্থিতিহীনতা দেখা দিয়েছে। এই স্থিতিহীনতার দুটি দিক – একদিকে কৃষি সংকট ও অন্যদিকে খাদ্যদ্রব্যের মুদ্রাস্ফীতি। ফলত দেখা দিচ্ছে কৃষকদের স্বেচ্ছামৃত্যু। ন্যাশনাল

ক্রাইম ব্যুরোর মতে, এই সংখ্যাটি ১৯৯৫ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে ছিল প্রায় ২.৫ লক্ষ, যার মধ্যে ৮৩ শতাংশ পুরুষ।

ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেল্‌থ সার্ভের সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতবর্ষের ৪৫ .৯ শতাংশ শিশু উচ্চহারে অপুষ্টির শিকার। রাষ্ট্রসংঘের 'ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম' এর রিপোর্ট অনুযায়ী ৯১ .২৫ লক্ষ মানুষ প্রতি বছর মারা যায় অপুষ্টিজনিত কারণে, দিনে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ। রাষ্ট্রসংঘের 'হাঙ্গার টাস্‌ফোর্স' – এর রিপোর্ট বলছে বিশ্বের প্রতি ৫ জন ক্ষুদ্র কৃষকের মধ্যে ৩ জনই ক্ষুধা বা অপর্যাপ্ত খাদ্যের শিকার। তেন্ডুলকর কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৮৭ সালের পর থেকে মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণের পরিমান ক্রমাগত কমছে। কৃষক মৃত্যু ও অপুষ্টি এগুলি কিন্তু পরস্পর-বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়। এর মূল কারণ লুকিয়ে আছে বাণিজ্যিক বিশ্বায়ন (corporate globalization) এ। ১৯৯১ সালে বিশ্ব অর্থভান্ডার ও বিশ্বব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত সংস্কার ও ১৯৯৫ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর যে নিয়মাবলি চালু হয় তাতে খাদ্য নিরাপত্তার সরকারি কাঠামোটি ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা হয়। বর্তমানে বাণিজ্য ও সরকারি ভরতুকি বড়ো বড়ো বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি মুনাফা বৃদ্ধির সহায়ক হচ্ছে। ভারতে আয়ের উচ্চতম ১৫-২০ শতাংশ ভোগ করে ধনিক শ্রেণি, যা জাতীয় আয়ের ৬০-৭০ শতাংশ। উচ্চ আয়ের লোকেদের চাহিদা মূলত ডিম, মাছ, মাংস ইত্যাদি প্রাণীজ প্রোটিন। অপরদিকে, সরকার নিয়োজিত অর্জুন সেনগুপ্ত কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে ৭৭ শতাংশ মানুষ দৈনিক ২০ টাকার কম আয় করেন। ফলে বাস্তব বড়ো ভয়াবহ। The Social Cost of Economic Globalisation : An Indian Perspective (2009) নিবন্ধে বন্দনা শিব মন্তব্য করেছেন : "The World Bank's Structual Adjustment Programme and the WTO rules have jointly worked to dismantle the public framework for food soverignty- A way to food security. They have forced the integration of India's food and agricultural systems of rich countries. Besides, the process of corporate globalization has essentianlly been a mechanism of exploitation of the vast army of cheap labour."

পুঁজিবাদী বিশ্বায়নই যে গোটা খাদ্য ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল ও সংকটগ্রস্ত করেছে সেটা নিয়ে কোনো কথা না বলে নব্য উদারনীতির ব্যাখাকার এবং আই এম এফ, বিশ্বব্যাংক, ডব্লিউটিও, এমনকি ফাও পর্যন্ত বিশ্বায়ন, উদারনীতি আর বেসরকারিকরণের মাধ্যমে কৃষি সহ ভারতে সমগ্র অর্থনীতিকে দেশি-বিদেশী পুঁজির হাতে ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেন। এতে খাদ্যশস্যের আন্তর্জাতিক বাজারের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় মুষ্টিমেয় কিছু বহুজাতিক সংস্থার হাতে। এরাই ভারত সহ তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশের ভাগ্যবিধাতা; এরা তৃতীয় বিশ্বে দ্রুত নগরায়ণ সুপারমার্কেট ব্যবস্থার প্রসার ঘটায়; ছোটো ছোটো কৃষকদের উৎপাদন বিপণনের স্থানীয় বাজার ধ্বংস করে সুপারমার্কেট ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, ঠিকা চাষের চুক্তিতে জড়িয়ে

ফেলে, কৃষকদের স্বাধীনভাবে চাষ করার অধিকার লুন্ঠন করে। তাই এই বিশ্বব্যবস্থার শরিক ভারতও, সেহেতু ভারতের কৃষিও আজ গভীর সংকটে। কৃষিপণ্যের বাজারে বিদেশি পণ্যের অবাধ প্রবেশ সস্তার বিদেশি পণ্য ভারতীয় কৃষিকে ক্রমাগত অলাভজনক করে তুলেছে। ফলে কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় মুলধন সংগ্রহে কৃষককে ঋণনির্ভর হতে হচ্ছে। সে ঋণও আবার প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ফলে কৃষকরা খাদ্যশস্য উৎপাদন থেকে সরে এসে শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনে কিংবা রপ্তানিমুখী পণ্য উৎপাদনে জোর দিচ্ছে। এতদ্‌সত্ত্বেও লাভের মুখ না দেখতে পেয়ে তারা জমি থেকে উৎখাত হয়ে যাচ্ছে। উৎপাদিত ফসলে লাভজনক দাম পাওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় কৃষকরা সব ফসল বিক্রি করেও খরচ তুলতে পারছে না। ফলে নিজেরাই অভুক্ত থাকতে বাধ্য হচ্ছে বা আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে। মুক্ত বাজার বা ফ্রি মার্কেট অর্থনীতিতে উৎপাদন করা পণ্যে লোকসান হওয়ায় তারা উৎপাদন কমাতে বাধ্য হয়। উৎপাদন কমলে খাদ্যে ঘাটতি দেখা দেয়। এভাবে অনিশ্চয়তার মধ্যে ঢুকে পড়ছে খাদ্যব্যবস্থা। তখন নিরাপত্তা দুর অস্ত। এমন এক অস্থিতিশীল ও অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে তৎকালীন ভারত সরকার জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা বিল প্রবর্তন করে ২২ ডিসেম্বর, ২০১১ সালে 'to treat the basic food not as an option or luxury, but as a right, যাতে গরিবদের খাদ্যের অধিকার সুনিশ্চিত থাকবে। এই বিল এখন কার্যকরী। খাদ্য নিরাপত্তাকে অনিশ্চিত করার যাবতীয় নীতি অক্ষত ও অব্যাহত রেখে, তাকে বৃহৎ পুঁজির মুনাফার কাজে ব্যবহৃত করে ভারতবর্ষের আপামর গরিবগুর্বোদের ক্ষুধার নিরসন এই খাদ্য নিরাপত্তা আইনের উদ্যোগে ঘটবে কি ? এটাই এখন প্রশ্ন।

কাতারের দোহাতে ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন (WTO) এর বর্তমান বাণিজ্য চুক্তি (trade negotiation) শুরু হয়। এটি দোহা রাউন্ড বা দোহা ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডা (DDA) নামে পরিচিত। WTO হল একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যার উদ্দেশ্য হল পৃথিবী জুড়ে মুক্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্থাপন ও তার রক্ষণাবেক্ষণ। এর সদস্য দেশগুলি যৌথভাবে তাদের আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক কমিয়ে ফেলার চেষ্টা করে। এর প্রতিটি সদস্য বাণিজ্যের ব্যাপারে অন্য সদস্যদের সঙ্গে সমান ব্যবহারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু দোহা রাউন্ডে এখন অচলাবস্থা তৈরী হয়েছে। ২০০৮ জেনেভা বৈঠকে ভেঙে যায় কৃষি পণ্যের আমদানি সংক্রান্ত নীতিতে সমঝোতা না হওয়ায়। সেই অচলাবস্থা এখনও থেকে গেছে। খাদ্য নিরাপত্তা আইন কার্যকরী করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্তরে সমস্যাগুলি মাথা চাড়া দিচ্ছে। সমস্যার একটি কারণ লুকিয়ে আছে WTO-র নিয়মাবলী, যেগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলির Price Support এর মাধ্যমে ভর্তুকি ব্যবস্থাটিকে বাধা নিষেধের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। বস্তুতপক্ষে ভারত, চিন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশগুলির Amber box বা blue box ভতুর্কির অধিকার নেই। তাদের আছে AMS (Aggregate Measures of Support) যা কোনো একটি বিশেষ শস্যের জন্য, উৎপাদন মূল্যের ১০%। ভারতবর্ষ যে

ন্যূনতম সহায়কমূল্যে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে তার খরচের পরিমাণ এই সীমার মধ্যে থাকতে হবে। এখন ভর্তুকির হিসেব করার সময় বর্তমান সহায়ক মূল্য (MSP) থেকে ১৯৮৬-৮৭ সালের External Reference Price (ERP) বিয়োগ করা হয়। উদাহরণ হিসেবে চালের বর্তমান ERP কেজি ১৯.৬৫ টাকা। তাহলে কেজি প্রতি ভর্তুকির পরিমান হল ১৬.১০ টাকা। স্পষ্টত এই ভর্তুকি বেশি হচ্ছে কারণ ERP টি ১৯৮৬-৮৮ সালের উরুগুয়ে রাউন্ডের নিরিখে করা। তাই ভারত ও চীন সহ G-33 ভুক্ত দেশগুলি ERP বৃদ্ধির মাধ্যমে এই হিসেবের সংশোধন করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছে।

ভারতবর্ষ ২০১৪ সালের জুলাই মাসে জেনিভাতে অনুষ্ঠিত WTO সম্মেলনে Trade Facilitation Agreement (TFA), যা উন্নত দেশগুলির খুব প্রিয় তাতে স্বাক্ষর করেনি। কারণ তাতে ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা আইন সরকারের পক্ষে মেনে চলা সম্ভব নাও হতে পারে।

খাদ্য সুরক্ষা আইন (National Food Security Act, 2013)

ভারতবর্ষের খাদ্যসুরক্ষা আইন ২০১৩–লোকসভাতে পাশ হয় ২৬ আগষ্ট, রাজ্যসভাতে ২ সেপেম্ব্রের। এই আইনের মূল বক্তব্যগুলি এইরকম :

(১) অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা (AAY) ভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তি ন্যূনতম মাসে ৩৫ কেজি করে খাদ্যাশস্য TPDS এর মাধ্যমে পাবে। AAY নয় এমন পরিবারগুলি পাবে নূন্যতম মাসে ৫ কেজি খাদ্যশস্য। এই সুযোগ পাবে গ্রামীণ জনসংখ্যার ৭৫% এবং শহরে জনসংখ্যার ৫০%।

(২) AAY পরিবারগুলিতে খাদ্যশস্য বন্টিত হবে চাল ৩ টাকা কেজি প্রতি, গম ২ টাকা কেজি প্রতি, জোয়ার বাজার ১ টাকা দরে।

(৩) যোগ্য লোকেরা যদি এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে তারা পাবে খাদ্য নিরাপত্তা ভাতা বা allowance।

(৪) আইনটি TPDS কে আরও কার্যকরী করার জন্য তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের পক্ষপাতী। ভবিষ্যতে খাদ্যশস্যের পরিবর্তে ফুড কুপন ও নগদ টাকা প্রথা চালু করার প্রস্তাব আছে।

(৫) আইনে নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলা হয়েছে। প্রতিটি পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলাই গৃহের প্রধান এবং তিনি পাবেন biometric food security ration card.

খাদ্য নিরাপত্তা আইনটির দিক ভালো করে তাকালেই বোঝা যাবে এটি বর্তমান চালু TPDS ব্যবস্থার একটি পরিবর্ধিত রূপ। নতুন আইনে অন্তোদ্যয় অন্ন যোজনা (AAY) পরিবারগুলিকে বেশি সুযোগ দেওয়া হয়নি। কিন্তু মাসিক ৩৫ কেজি চালের যোগান আইনসম্মত করা হয়েছে। অন্যদিকে AAY নয় এমন BPL পরিবারগুলির ক্ষেত্রে বরাদ্দ চালের পরিমাণ কমে গেছে। তাহলে এই আইনের সুবিধাভোগী কারা ? আসলে এই সুবিধা পাবে নতুন পরিবারগুলি যারা TPDS এ সুযোগ পেতো না। আইনটিতে মোটের উপর ৬৭% জনসংখ্যাকে এই সুযোগে আনার কথা বলা বলেছে। বর্তমানে TPDS ব্যবস্থায়

এই সুযোগ পাচ্ছে ২২% জনসংখ্যা। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই APL পরিবারগুলি এই সুযোগ পাবে Non-AAY পরিবারগুলির কম বরাদ্দ থেকে।

আইনটি বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সমালোচিত হয়েছে।

১) ফিসক্যাল ঘাটতি ঃ ২০১৩-১৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের ফিসক্যাল ঘাটতি ছিল ৪.৫%। ২০১৪-১৫ সালে এটি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আইনটি কার্যকরী করতে হলে বছরে মোট ৬১.২ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য লাগবে। এর জন্য খরচ লাগবে ১৩০০ কোটি টাকা (GDP র ১.১ শতাংশ)। কেজি প্রতি চালের ভর্তুকি প্রায় ১৮ টাকা। তাই খাদ্য ভর্তুকিও বাড়বে।

তালিকা - ৪, ভারতে খাদ্য ভর্তুকি

		২০১২-১৩	২০১৩-১৪
(ক)	খাদ্য ভর্তুকি	৩৪.৩%	৪০.৭%
(খ)	সার ভর্তুকি	৩৬.৬%	২৯.৮%
(গ)	পেট্রোলিয়াম ভর্তুকি	৩৯.১%	২৯.৪%
	মোট (কোটি টাকা)	২,৪৭,৮৫৪	২,৩০,৯৭১

উৎস : ইউনিয়ন বাজেট, ২০১৩-১৪, ভারত সরকার।

উপরের তালিকা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে খাদ্য নিরাপত্তা আইনের কারণে খাদ্য ভর্তুকি বাড়লেও সারের ভর্তুকি ও পেট্রোলিয়াম ভর্তুকি শতাংশের বিচারে কমে যাচ্ছে।

আইনটি সঠিকভাবে কার্যকর করতে খাদ্য সংগ্রহ (Procurement) বাড়াতে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রভাবশালী কৃষক লবিগুলি চাইলে সংগ্রহ মূল্য বাড়াতে যাতে তারা লাভবান হতে পারে।

এই আইন কার্যকরী করার ব্যয়ভার কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার গুলিকে বহন করতে হবে। অপেক্ষাকৃত গরিব রাজ্যগুলির কাছে তা বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে। যদি রাজ্যগুলি এই ব্যয়ভার বহন করতে ইচ্ছুক না হয় বা রাজি না হয় হয় তাহলে এই আইনের রূপায়ণ সম্ভব হবে না।

তৃতীয় সমস্যাটি হল সুবিধা প্রাপকদের অর্থাৎ 'দরিদ্র'দের চিহ্নিত করা। এ বিষয়ে অনেক কমিটি হলেও দেখা যাচ্ছে যে সত্যিকারের দরিদ্রের একটি অংশ সুবিধাভোগ থেকে বঞ্চিত থেকেই যাচ্ছে।

খাদ্য আইনের আরও কতকগুলি দুর্বলতা হল – কতদিনের মধ্যে এই আইন কার্যকরী করতে হবে তার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয় নি, আইনটিতে খাদ্য জোগানে বেসরকারি ঠিকাদারদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। খাদ্য জোগানের ব্যাপারে স্ব-সহায়ক দলের ভূমিকাকে স্বীকার করা হয় নি।

আইনটিতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে রাজ্যসরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়নি।

সুবিধাভোগীদের চিহ্নিতকরণের কাজ ও রাজ্য সরকারগুলিতে দেওয়া হয় নি। আইনে ধরে নেওয়া হয়েছে যে রাজ্যগুলিতে এ ধরনের কোনো কর্মসূচী নেই। কিন্তু বাস্তব হ'ল প্রায় ১৫ টি রাজ্য যেমন — ছত্রিশগড়, বিহার, মধ্যপ্রদেশে এ ধরণের কর্মসূচী বর্তমান।

সমালোচকরা বলেন খাদ্য সুরক্ষা আইন খাদ্য নিরাপত্তার কথা বললেও পুষ্টি নিরাপত্তার ব্যাপারে তা নীরব। মাথা পিছু মাসিক ৫ কেজি চাল পুষ্টি নিরাপত্তাকে কখনই সুনিশ্চিত করতে পারে না। ভারতে মত গরিব দেশে খাদ্য নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলি হল 'প্রোটিন নিরাপত্তা' (Protein Security) এবং 'ছদ্ম ক্ষুধা'(Hidden Hunger)। প্রোটিন নিরাপত্তার জন্য চাই ডাল, দুধ, মাছ মাংস ইত্যাদির পর্যাপ্ত জোগান। দ্বিতীয়টির কারণ হল অনুখাদ্য (micro nutrients)-আয়রণ, আয়োডিন, জিঙ্ক, ভিটামিন ইত্যাদির অভাব।

কমিশন ফর অ্যাগ্রিকালচারাল্ কস□অ্যান্ড প্রাইসেস (CACP) এর মতে ২০০৯-১৩ এই সময়কালে যে মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে তার জন্য দায়ী খাদ্যদ্রব্যের দাম বৃদ্ধি। CACP র মতে মুদ্রাস্ফীতির জন্য মূলত দায়ী ক্রমবর্দ্ধমান ফিসক্যাল্ ঘাটতি, বিশ্ববাজারে দাম বৃদ্ধি, এবং ক্রমবর্দ্ধমান কৃষি মজুরি। কৃষিতে প্রকৃত মজুরি যদি সত্যি বৃদ্ধি পায় তাহলে উৎকৃষ্টতর খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়বে।

ভারতে খাদ্য সার্বভৌমত্ব

খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব এই দুটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। খাদ্য নিরাপত্তা বলতে বোঝায় সব মানুষের বস্তুগত (Physical) ও আর্থিক (Economic) ক্ষমতা আছে কিনা খাদ্য অর্জনের ব্যাপারে। অন্যদিকে খাদ্য সার্বভৌমিকতার ধারণা অনেক ব্যাপক। এখানে শুধু খাদ্য অর্জনের লভ্যতা বা ক্ষমতা নয়, তাকে হতে হবে প্রতিটি গোষ্ঠীর মানসিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখন কৃষক, ভোগকারী ও সুশীল সমাজ চায় না যে তাদের খাদ্যের উপর বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণ থাকবে ও তা আন্তর্জাতিক বাজারের খেয়ালখুশি দ্বারা প্রভাবিত হবে। উন্নতশীল দেশগুলিতে ছোট ছোট জমিতে কৃষি উৎপাদন খাদ্য সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খাদ্য সার্বভৌমত্বে বলা হচ্ছে এটি একটি দেশ ও দেশবাসীদের অধিকার যে তাদের খাদ্যব্যবস্থা (খাদ্যের উৎপাদন, বন্□ ও ভোগ) কেমন হবে তা তারাই নির্ধারণ করবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুফল দেখা যায় অনেক সময় অপেক্ষাকৃত ধনী দেশগুলি এবং বড় কৃষকরা উপকৃত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমে যাওয়ার শিকার হচ্ছে অপেক্ষাকৃত ছোট চাষি। এই সমস্যার মোকাবিলায় অনেক দেশের চাষিরা একসঙ্গে হাত মিলিয়েছে। জন্ম নিয়েছে আন্দোলন – La Via Campesina (স্প্যানিশ ভাষায় এই শব্দের অর্থ –কৃষকদের পথ)। এই আন্দোলন যেমন রাজনীতিবিদদের এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলির উপর চাপ বাড়িয়েছে, তেমনি পৃথিবীর বহু দেশে ভূমিহীন গরীব কৃষকদের

সমর্থন জুগিয়েছে। ১৯৯৬ সালে বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনে La Via Campesina খাদ্য সার্বভৌমত্বের ৭টি নীতির কথা বলা হয়েছে– মানবিক অধিকার হিসেবে খাদ্য, কৃষি সংস্ত্র, প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ, খাদ্য-বাণিজ্যের পুনর্সংগঠন, ক্ষুধার বিশ্বায়নের সমাপ্তি, সামাজিক শান্তি এবং গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ।

২০০৭ সালের নাইলেনি, মালিতে খাদ্য সার্বভৌমত্বের অর্জনের এক নয়া অঙ্গীকার করা হয়, যেখানে বাজারি চাহিদা ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের দাবি খর্ব করে খাদ্য সুরক্ষাকে বাস্তবায়িত করা যায়। এই খাদ্য সার্বভৌমত্বের কয়েকটি বিশেষ দিক আছে –
(১) খাদ্যকে মূল মানবিক অধিকার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়; (২) কৃষি সংস্ত্র যেন কৃষকদের অনুকূল হয়; (৩) প্রাকৃতিক সম্পদ যেন সুরক্ষিত থাকে; (৪) খাদ্যের বাণিজ্যকে পুনঃসংগঠিত করা যাতে স্থানীয় উৎপাদন এবং নায্য দাম সুরক্ষিত থাকে; (৫) সামাজিক শান্তি স্থাপনে খাদ্য যেন কখনো বিবাদের অস্ত্র হয়ে না দাঁড়ায়। তা ছাড়া সমস্ত স্তরে কৃষিনীতি কী হবে তা ঠিক করবে কৃষকরাই। আজ অবধি কম-বেশি যে কোনো মূল্যে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির হার দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই, যদিও তা বিশ্ব আর্থিক মন্দা বা ইউরোপীয় সার্বভৌমত্বের ঋণ সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত। তথাপি বলব সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ দ্বারা খাদ্য সুরক্ষাকে ফলপ্রসু করতে ভবিষ্যতে কৃষির উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে, যা হবে 'balanced, inclusive and sustainable growth'। নান্য পন্থাঃ।

উপসংহার

ভারতে খাদ্য নিরাপত্তা আইন (NFSA–2013) ভারতে জনগণের খাদ্য সুরক্ষার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। কিন্তু আইন শেষ কথা নয়; খাদ্যের উৎপাদন, বন্ন ও ভোগ আজ একটি বিতর্কিত বিষয়। জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশ আজও সাধারণ জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় উপাদান একটু খাদ্যের জন্য হাড়ভাঙা লড়াই করছে। বিশ্বায়নের ফলে খাদ্য শৃঙ্খলের (food chain) অনেকটাই আজ বাণিজ্যিক শক্তির করায়ত্ত। খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা আজকের পৃথিবীতে এক গভীর সংকট হিসেবে দেখা দিচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন ২০১৩ সালের খাদ্যের উৎপাদনকে দ্বিগুণ বাড়াতে হবে। খাদ্য আইনটিকে প্রকৃতভাবে কার্যকরী করে তুলতে হলে চাই প্রকৃত রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও স্বচ্ছ সরকারী ব্যবস্থাপনা।

নব্য উদারনীতি চালু হওয়ার পর একে রাষ্ট্রীয় ইমারত ও জনকল্যাণমূলক সুরক্ষা বলয় ধ্বংস হতে শুরু করে। অর্থনীতিতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ এখন যারপরনাই শিথিল। রাষ্ট্রীয় শিল্পের একটি বড়ো অংশে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সামাজিক সুরক্ষার ভিত্তিভূমিকে ধসিয়ে দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে গণবন্ন ব্যবস্থাকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে সাধারণ মানুষের কাছে অত্যাবশকীয় পণ্য পৌঁছে দেবার ব্যবস্থাও ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। দেশি–বিদেশী বৃহৎ পুঁজির স্বার্থবাহী নীতি রূপায়ণ করতে সরকার মোটেই পিছপা নয়। তাহলে সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষাকারী নীতি ও কর্মসূচী অস্তিত্ব কোথায় ? এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজা আজ খুব জরুরি।

পরিশিষ্ট তালিকা – জাতীয়স্তরে ভারতে খাদ্য নিরাপত্তা (মিলিয়ন টন)

সাল	খাদ্যশস্যের নীট উৎপাদন	নীট আমদানি	সরকারি মজুতের পরিবর্তন	মাথাপিছু খাদ্যশস্যের লভ্যতা (গ্রাম)	সরকারি সংগ্রহ	সরকারি বন্টন
১৯৯১	১৫৪.৩	–০.১	–৪.৪	৫১০.১	১৯.৬	২০.৮
১৯৯৫	১৬৭.৬	–২.৬	–১.৭	৪৯৫.৪	২২.৬	১৫.৩
২০০০	১৮৩.৬	–১.৪	১৩.৯	৪৫৪.৪	৩৫.৬	১৩.০
২০০৫	১৭৩.৬	–৬.০	–২.৪	৪২২.৪	৪১.৫	৩১.০
২০০৬	১৮২.৫	–২.৩	–১.৮	৪৪৫.৩	৩৭.০	৩১.৮
২০০৭	১৯০.১	–৪.৭	১.৭	৪৪২.৮	৩৫.৮	৩২.৮
২০০৮	২১০.২	–৯.৭	১৭.০	৪৩৬.০	৫৪.২	৩৪.৭
২০০৯	২০৫.২	–৪.১	১১.৫	৪৪৪.০	৬০.৫	৪১.৩
২০১০	১৯০.৮	–২.২	–০.৫	৪৩৭.১	৫৬.১	৪৩.৭
২০১১	২১৪.২	–২.৯	৮.৩	৪৬২.৯	৬৪.৫	৪৭.৯

উৎস : আর্থিক সমীক্ষা, ভারত সরকার, বিভিন্ন বছর।

তথ্যসূচী :

1. T. Angoti, 2012, "The Urban – Rural Divide and Food Sovereignty in India", *Journal of Developing Societies,* Vol. 28, No.4.
2. Economist Intelligence Unit, 2013. *Global Food Security Index 2013 – An Annual Measure of the State Global Food Security*, http://foodsecurity index.eiu.com/
3. R.W. Fogel, 2007, "Capitalism and Democracy in 2040: Forecasts and Speculations". *NBER Working Paper, No. 13184,* (Cambridge, MA:NBFR)
4. IFPRI 2013. *Global Hunger Index, The Challenge of Hunger: Building Resilience to Achieve Food And Nutrition Security.* Bonn.
5. Biswajit Chatterjee and Asim K Karmaker, (eds.), 2011. *Food Security in India.* New Delhi. Deep & Deep Publication.
6. Asim K. Karmakar and Sebak Kumar Jana, 2014. "Food Sovereignty: A Way to Achieve Food Security in India", *Bihar Economic Journal,* Vol. 3, No.1.
7. Asim K. Karmakar, and Debasis Mukhopadhayay, 2014. "Towards a Prudent Policy for Food Security In India", *US-China Law Reviews,* Vol. 11, Number 2, 221-262, February.
8. Jim O' Neill, 2011, *The Growth Map: Economic Opportuity in the BRICs and Beyond.* England Portfolio : Penguin.

রুদ্র প্রসাদ রায়

কর্মের অধিকার ও আইনি নিশ্চয়তা রক্ষায় মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের ভূমিকা:একটি বিশ্লেষণের প্রয়াস

'কর্মের অধিকার' অপেক্ষাকৃতভাবে একটি আধুনিক ধারণা। ফরাসি বিপ্লবের ফলশ্রুতিস্বরূপ ১৭৯৩ সালের ফরাসি সংবিধানে 'কর্মের অধিকার' সর্বপ্রথম আইনি স্বীকৃতিলাভ করে। কর্মের অধিকার সম্পর্কে ১৭৯৩-এর ফরাসি সংবিধানে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনতা রয়েছে নিজস্ব সম্ভ্রম বজায় রেখে পছন্দমত কর্ম নির্বাচন করার। পরবর্তীকালে ১৮৪৮ সালে যে ফরাসি সংবিধান প্রণীত হয়, সেই সময় থেকেই কর্মের অধিকারের গ্রহণযোগ্যতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আবার অনেকে দাবী করেন যে, কর্মের অধিকার হল বুর্জোয়া বিপ্লবের অন্যতম সামাজিক বৈশিষ্ট্য এবং বর্ধিষ্ণু পুঁজিবাদের ফলশ্রুতি, যা সামন্তবাদী যুগের সমাপ্তিকে সূচিত করে[১]।

কর্মের অধিকারকে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বাক্ষর রাখে। জাতিপুঞ্জ তৈরির সাথে সাথেই[২] ১৯৪৮ সালে 'মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষনাপত্র' (Universal Declaration of Human Rights) প্রকাশ করে, যেখানে 'কর্মের অধিকার'কে 'মানবাধিকার' হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঘোষণাপত্রের ২৩ নং ধারানুসারে :

> i) "Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

2) Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

3) Everyone who works has the right to just and favourable remunaration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necesary, by other means of social protection.

4) Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests."[২]

এরপর প্রায় দুই দশক অতিক্রম করে ১৯৬৬ সালে জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় দুটি আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র অনুমোদিত হয় - (i) সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র (ICCER) এবং (ii) অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র (ICESCR) যেগুলি ১৯৭৬ সাল থেকে কার্যকর হয়। চুক্তিপত্রের ৬ নং ধারানুসারে,

"The States Parties to present Convenant recognize the right to work, which includes the right of everyone to opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts, and will take appropriate steps to safeguard this right, and (ii) The steps to be taken by a State Party to the present Convenant to achieve the full realization of this right shall include technical and vocational guidance and training programmes, policies and techniques to achieve steady economic, social and cultural development and full and productive employment under conditions safeguarding fundamental political and economic freedoms to the individual."

চুক্তিপত্রের ৭ নং ধারায় আরো বলা হয়েছে যে,

"(i) Remunaration which provides all workers, as a minimum, with a decent living for themselves and their families in accordance with the provisions of the present convenant."[৩]

ভারতবর্ষের কর্মের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা লক্ষ্য করা যায় স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে। ভারতীয় সংবিধান রচয়িতাগণ রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিতে কর্মের অধিকারকে সংযুক্ত করেছেন। সুতরাং একথা বলা যায় যে, কর্মের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে না রেখে, বিষয়টিকে রাষ্ট্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর ছেড়ে দেন। ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতিসমূহের ৪১ নং ধারায় লিপিবদ্ধ আছে "The state shall within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases

of unemployment, old age, sickness and disablement and in other cases of undeserved want."[৪]

এক

২০০১ সালে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সংযুক্ত প্রগতিশীল জোট (United Progressive Alliance) সরকার কেন্দ্রে আসার পর তাদের পূর্বঘোষিত নির্বাচনী ইস্তাহার অনুযায়ী 'সর্বসাধারণের ন্যূনতম অনুক্রম' (Common Minimum Programme) এর একটি গুরুত্বপুর্ণ অঙ্গ হিসাবে জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন (National Rural Employment Guarantee Act) প্রণয়নের বিষয়টিকে চিহ্নিত করেন, যার মধ্য দিয়ে 'কর্মের অধিকার' এর আইনি সুরক্ষার বিষয়টি অনেকাংশেই সুনিশ্চিত হয়। এ প্রসঙ্গে সরকারের ঘোষণাটি হল -"The UPA Government will immedietly enact a National Employment Guarantee Act. This will provide legal guarantee of at least 100 days of employment to begin with an asset-creating public works programmes every year at minimum wages for at least one able - bodied person in every rural, urban poor and lower - middle class household."[৫] এছাড়াও সরকার একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় 'ভারত নির্মাণ'[৬] নামে যে গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে, সেখানেও গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনি প্রকল্পটিকে অগ্রাধিকার ক্ষেত্র হিসাবে তুলে ধরা হয়।

অনেকে কর্মনিশ্চয়তা আইনকে, বিগত দুই শতাব্দী ধরে সংস্কার প্রক্রিয়ায় যে অন্তর্ভূক্তি -রহিত বৃদ্ধি (non-inclusive growth) ঘটেছে তারই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করেন। নাগরিক সমাজ ও আন্দোলনকারীদের নিরন্তর প্রচেষ্টা যা দেশের নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে সচরাচর দৃষ্ট ও সাধারণ কৌশল, তারই স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হল জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন এবং তার দেশব্যাপী রূপায়ণ। এই আইনি প্রকল্পটি হল এক এবং অদ্বিতীয়, যা আকারে সুবৃহৎ[৭]। এই কর্মসূচীর সংকল্প হল দীর্ঘ সময়ব্যাপী কাজ দেওয়া এবং সর্বোপরি সামাজিক ও স্থায়িত্বশীল সম্পদ তৈরীর বিষয়কে মাথায় রেখে এটি পরিচালিত হবে। প্রকল্পটিতে কাজ করার ক্ষেত্রে 'স্ব-লক্ষ্যের' (Self-targeting) সুযোগ নিহিত রয়েছে এবং এর মধ্য দিয়ে চিরস্থায়ী দারিদ্র, খাদ্যাভাব, পরিযান (Migration) প্রভৃতির মত জটিল ও কঠিন সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

জটিল গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পটির মধ্য দিয়ে মূলত আট ধরনের কাজ করা হয়, যেমন - জলসম্পদ সংরক্ষণ; বন্যা প্রতিরোধ; নালা-নর্দমা-সংস্কার; গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনর্গঠন; মৃত্তিকা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বৃক্ষরোপণ ও অরণ্য সম্পদ তৈরী; তপশিলী জাতি ও উপজাতিভূক্ত পরিবার, ইন্দিরা আবাস যোজনার সুবিধাভোগী (Beneficiaries) এবং দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারগুলির ভূমি উন্নয়ন প্রভৃতি। বর্তমানে ভারত সরকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ভূমি উন্নয়নের ক্ষেত্রেও ১০০ দিনের কাজের বন্দোবস্তের

ক্ষেত্রটিকে প্রসারিত করেছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে যে সমস্ত কৃষকদের ৫ একরের কম জমি রয়েছে, তাদের জমিতে পুকুর খননের ব্যবস্থা করা যায়। এছাড়াও কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে যে সমস্ত অন্যান্য প্রকল্পের কাজ করা যায়, যে সব ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারের সাথে পরামর্শ করে বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এ প্রসঙ্গে *The Hindu* পত্রিকার প্রতিবেদনটি প্রণিধানযোগ্য :

> The Ministary of Rural Development has made it clear that works on the land of Scheduled Castes and Scheduled Tribes house-holds with the individual landowner possessing a jobcard alone shall be taken up. Only upon staturation of these two categories in the gram panchayat concerned work on lands of small and marginal farmers will be considered for the second round investment.
>
> The Ministary allows works relating to irrigation facility, land development and horticulture and plantation to be taken up with the condition that these meet the MNREGA-prescribed labour-material ratio of 60:40. Of the numerous irrigation facilities appeared, the Ministary is particular that digging of well be taken up only with the clearance of state goverment water department regarding water availability.[৮]

পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানগুলি হল জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের প্রধান পরিকল্পনা-রূপায়নকারী এবং তদারকী সংস্থা। গ্রামসভাগুলি নিজস্ব এলাকাগত অধিক্ষেত্রে (Territorial Jurisdiction) আবশ্যিকভাবে পরিকল্পিত কাজ সম্পাদন করবে এবং সামাজিক হিসাব নিরীক্ষা (Social Audit) পরিচালনা বহন করবে। কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে মোট ব্যয়ের ৯০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার এবং ১০ শতাংশ রাজ্যসরকারগুলি বহন করবে, এ সম্পর্কে আইনে বলা হয়েছে।

For this programme the Central Government will bear the following costs:

> (i) The entire cost of wages for unskilled manual works.
>
> (ii) 75 percent of cost of meterials and wages for skilled & semi-skilled works.
>
> (iii) Administrative expenses as may be determined by the central goverment. This includes inter alia, the salary and allownces of programme-officers and their support staff and work-site facilities.
>
> (iv) Administrative expenses of the Central Employment Guarantee Council.

The State Government will bear the following costs:

> (i) 25 percent of the cost of materials and wages for skilled and semi-

skilled works.

(ii) Unemployment allowance payable in case the state government can not provide wage employment within 15 days of application.

(iii) Administrative expenses of the State Employment Guarntee Council.[৯]

দুই

ভারতবর্ষে গ্রামীণ অর্থনীতিতে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে পরিচালিত কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের ইতিহাস বেশ পুরানো। উদাহরণ হিসাবে, *Maharastra Employment Guarantee Scheme* (*MEGS*), 1973; *National Rural Employment Guarantee Programme* (*RLEGP*) 1980; *Jawhar Rozgar Yojana* (*JRY*), 1989. *Employment Assuanence Scheme* (*EAS*), 1993; *Jawhar Gram Samriddhi Yojana* (JGSY), 1999; *Sampoorna Gramin Rozgar Yojana* (*SGRY*), 2011; *National Food for work Programme* (*NFWP*), 2004[১০]; প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অন্যতম ভিত্তিই হল মানুষের দারিদ্র ও দুর্দশা কমানোর ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্র কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের ইতিবাচক অভিজ্ঞতা। ভারতবর্ষের কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের সর্বপ্রথম প্রচেষ্টাই হল মহারাষ্ট্রের প্রকল্পটি। ১৯৭৩-৭৪ সালের প্রচন্ড খরার ফলে মহারাষ্ট্রের মানুষকে যে নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা নিবারণের জন্যই মূলত প্রকল্পটি শুরু করা হয়। মহারাষ্ট্রে প্রকল্পটিতে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ৩,৫৯৭ মিলিয়ন (১ মিলিয়ন ১০ লক্ষ) কর্মদিবস সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্রসেচ, ভূমি ও জলসম্পদ সংরক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও অরণ্যসম্পদ সৃষ্টি, স্থানীয় রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করা হয়েছে[১১]। যে অভিজ্ঞতা কেন্দ্র সরকারকে জাতীয় স্তরে এরূপ একটি প্রকল্প নির্মানের উৎসাহ জোগায়। এরই ফলশ্রুতিতে ২০০৫ সালের ৭ই সেপ্টেম্বরের কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন UPA সরকার 'জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন' প্রণয়ন করে এবং ২০০৬ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে সমগ্র দেশের ২০০ টি দরিদ্রতম জেলায় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পটি প্রাথমিক পর্যায়ে রূপায়িত হয়।

'কর্মের অধিকারে'র ধারণাটি আজ নতুন কোনো বিষয় নয়। রাষ্ট্রের কার্যপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিতেই নাগরিকদের 'উপযুক্ত কর্ম' (Decent Work) প্রদানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ভারতে স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায় থেকে গ্রামোন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে যে সমস্ত জনকল্যাণকর প্রকল্প (Welfare programme) গ্রহণ করা হয়েছে সব গুলির প্রায় একই প্রকার ভাগ্য হয়েছে। প্রত্যেকটি প্রকল্পের ক্ষেত্রেই কতকগুলি সাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যেমন - প্রচন্ড পরিমাণে ফাঁক-ফোকর, যাতে করে প্রকল্পগুলিতে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হত তার ন্যূনতম অংশই জনগনের হাতে পৌঁছাতো। ফলে প্রকল্পগুলি মূল উদ্দেশ্যই ব্যার্থতায় পর্যবাসিত হত। এছাড়াও গ্রামোন্নয়নের কর্মসূচীগুলির

ব্যর্থতার পেছনে আরো বেশকিছু কারণকে দায়ী করা যায়। যেমন - স্বত্ব বা অধিকার সম্পর্কে জনগণের সচেতনতায় অভাব, দুর্নীতি রোধে প্রকৃত আইনী সুরক্ষার অভাব, সঠিক হিসাব-নিরীক্ষা পদ্ধতির অভাব এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হল, আমলাতান্ত্রিক সংকীর্ণতা ও লাল ফিতার ফাঁসের জন্য অপর্যাপ্ত রূপায়ণ। এছাড়াও সমস্ত প্রকল্পগুলিকেই বিচার করা হত 'উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া'(Ascribed from top to bottom) উন্নয়নের প্রয়াস হিসাবে, ফলত যাদের জন্য উন্নয়ন সেই সমস্ত স্থানীয় জনগণকে প্রকল্পগুলিতে অন্তর্ভুক্ত খুব স্বল্প পরিমাণে করা হত এবং সরকার ও লক্ষ্য-গোষ্ঠীর মাঝে থাকত বহুবিধ মধ্যস্থতাকারী সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ। ফলে যাদের জন্য উন্নয়ন তাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সঠিকভাবে অংশীভূত করা যেত না। তদুপরি দুর্বল তদারকি এবং রক্ষাবন্ধের (Monitaring and Safeguard) অভাবে প্রকল্পগুলি রূপায়ণে যথেষ্ট পরিমাণে ফাঁক-ফোকর এবং অদক্ষতা পরিলক্ষিত হয়। আর ঠিক এই জায়গাতেই মহাত্মা গান্ধীর জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পটি অন্যতর। এটি হল গোটা বিশ্বের মধ্যে সর্ববৃহৎ অধিকারমূলক এবং সর্বোপরি আইনি নিশ্চয়তা প্রদানকারী সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প, যা অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে হস্তসাধিত কাজ করতে ইচ্ছুক সমস্ত মানুষের কাছে উন্মুক্ত।

আইনগতভাবে 'কর্মের অধিকার'কে বিধিবদ্ধ করার প্রয়াসই প্রকল্পটিকে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করেছে এবং এই সুবৃহৎ প্রকল্পটি উভয়ত সম্পদের পরিধি ও পরিবারগুলির কাজের চাহিদার দিক থেকে অনন্যতর। এখনো পর্যন্ত সরকারি তথ্যানুসারে প্রকল্পটিতে পরিবারগুলির কাজের চাহিদা ক্রমান্বয়িকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৬-০৭ অর্থবর্ষে, যেখানে কাজের চাহিদা ছিল ২১ মিলিয়ন পরিবারের তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০০৭-০৮ অর্থবর্ষে ৩৪ মিলিয়ন, ২০০৮-০৯ অর্থবর্ষে ৪৫ .১১ মিলিয়ন এবং ২০০৯-১০ অর্থবর্ষে (২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত) ৪৪ .৯১ মিলিয়ন।[১২] এই অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, এই আইনি প্রকল্পটির সম্পর্কে জনগণের প্রচুর প্রত্যাশা তৈরী হয়েছে। কারণ গ্রামীণ মানুষজন বিশ্বাস করেন যে কর্মের সুযোগ প্রদান এবং উৎপাদনমুখী সম্পদ সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতির রূপান্তর এবং সর্বোপরি তাদের দারিদ্রাকীর্ণ গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটানোর সক্ষমতা প্রকল্পটি রয়েছে। সুতরাং আশা করা যায় যে প্রকল্পটি কর্ম প্রদান এবং উৎপাদনমুখী সম্পদ সৃষ্টি এই দ্বিবিধ সুবিধার দ্বারা গ্রামীণ স্তরে পরিযান (Migration) এর সমস্যাটি দূরীভূত করতে সক্ষম হবে। তাছাড়া, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পটি অন্যান্য প্রকল্পগুলির থেকে পৃথক এই অর্থ যে, প্রকল্পটিতে দুর্নীতি রোধের জন্য সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী আইনী বন্দোবস্ত রয়েছে। তদুপরি স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা (Transparency and Accountability)[১৩] রক্ষার্থে আইনগত ভাবে কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প অন্যান্য প্রকল্পগুলির থেকে সবচেয়ে তাৎপর্য্যপূর্ণভাবে ভিন্ন এই অর্থে থেকে যে, এখানে গ্রামীণ শ্রমিকদের 'কর্মের অধিকার' কে আইনগত ভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে ও তা সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

তিন

ভারতবর্ষে ২০০৫ সালের ৭ই সেপেম্বর জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন (National Rural Employment Guarantee Act) পাশ হয় যা. কর্মের অধিকার ও তার আইনি নিশ্চয়তা বিষয়টিকে সুরক্ষা প্রদান করে। ২০০৯ সালের ২রা অক্টোবর এ আইনটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) , যা লোকমুখে '১০০ দিনের কাজ' নামে সমধিক পরিচিত। এই আইনের মূল বিধানটি হল গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী যে সমস্ত পরিবারে প্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছর অতিক্রান্ত) মহিলা ও পুরুষ অদক্ষ শ্রমিকের কাজ করতে উৎসাহ প্রকাশ করবেন তাদের বছরে মোট ১০০ দিন কাজের নিশ্চয়তা প্রদান করা। বছরে ১০০ দিন কাজ একটি পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য মিলে বিভিন্ন সময়ে করতে পারবেন। এ সম্পর্কে জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা (২০০৯) অমিতা শর্মা বলেছেন "An Act to provide for the enhancement of livelihood security of the households in rural areas of the country by providing at least one hundred days of guaranteed wage employment in every financial year to every households." ।[১৪]

মহাত্মা গান্ধী কর্মনিশ্চয়তা আইনের আলোচনার শুরুতেই উঠে আসে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের (Scheme) প্রসঙ্গ। ভারত সরকার ২০০৫ সালে আইনটি প্রণয়ন করে এবং আইনটি সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য প্রকল্পটির রূপরেখা তৈরী ক'রে ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সমগ্র দেশে ২০০টি দরিদ্রতম জেলায় প্রথম পর্যায়ে রূপায়ণের কাজ শুরু করে। ২০০৭-২০০৮ অর্থবর্ষে এর সাথে আরো ১৩০ টি জেলায় এবং ২০০৮-২০০৯ অর্থবর্ষের শুরুতে অর্থাৎ ১লা এপ্রিল ২০০৮ দেশের অবশিষ্ট জেলা গুলিতেও প্রকল্পটি রূপায়িত হয়। জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা আইনটির/প্রকল্পটির বহুমাত্রিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে :

১. গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষজনকে পরিবার পিছু অন্তত ১০০ দিন কাজের এবং স্বভাবতই মজুরি নিশ্চয়তা দেওয়ার মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করা।

২. গ্রামাঞ্চলে স্থায়িত্বশীল সামাজিক সম্পদ (Durable Social Asset) সৃষ্টি, জলসেচের সুযোগ বৃদ্ধি, মৃত্তিকা সংরক্ষণ প্রভৃতি উদ্যেগের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির দ্বারা গ্রামীণ পরিবারগুলির ভবিষ্যৎ উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৩. গ্রামের মানুষজনকে একাধারে খরা ও বন্যার মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কবল থেকে রক্ষা করার উপযোগী পরিকাঠামো নির্মাণ করা।

৪. গ্রামীণ সমাজের সর্বাপেক্ষা পিছিয়ে পড়া অংশ বিশেষত মহিলা, তপশিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত ব্যক্তিবর্গের ক্ষমতায়ন ঘটানো।

৫. বিভিন্ন দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং জীবিকা অর্জনের প্রকল্পগুলির মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে সহভাগী বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে সুদৃঢ় করা।

৬. তৃণমূল স্তরে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা এবং গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করা।

৭. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার বৃদ্ধি করা।[১৫]

চার

জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা আইন অনুযায়ী প্রত্যেক জবকার্ড (Jobcard) ধারী গ্রামীণ পরিবারকে চাহিদার ভিত্তিতে বছরে কমপক্ষে ১০০ দিন কাজ দেবার কথা বলা হয়েছে। এই জবকার্ডটিকে ১০০ দিন কাজের 'গ্যারান্টি কার্ড' (Guarantee Card) বলা যায়। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা আইন অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বসবাসকারী পরিবারের প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যরা অদক্ষ শ্রমিকের কাজ করতে আগ্রহী থাকলে গ্রাম পঞ্চায়েত বা কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের-প্রোগ্রাম অফিসারের কাছে জব কার্ডের জন্য লিখিত ভাবে আবেদন জানাবেন। এই জবকার্ডটি আসলে ১০০ দিনের কাজে নিবন্ধীকরণের প্রমাণপত্র। জব কার্ডটি এমনভাবে তৈরী হবে, যাতে আবেদনকারী পরিবারের সকল প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের তথ্য ও ছবি থাকবে; যাতে করে চাইলে পরে পরিবারের যেকোন সদস্য ১০০ দিনের কাজ করতে পারেন।[১৬] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে জবকার্ডের নথিভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে দারিদ্র্যসীমা (Poverty Line) কোন বাধা নয়। বি.পি.এল (Below Poverty Line) পরিবারের সাথে সাথে এ.পি.এল (Above Poverty Line) পরিবারের সদস্যরাও জবকার্ড পেতে পারেন। এজন্য তাদের লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে।শর্ত হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বসবাস, পরিবারের ১৮ বছর অতিক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য এবং অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে রাজী থাকা বাধ্যতামূলক। বর্তমানে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই ১,১২,৬৮,৪৯৩ টি জবকার্ড রয়েছে।[১৭] আইনানুযায়ী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে নথিভূক্ত হলেই বা শুধুমাত্র জর্বকার্ড থাকলেই চলবে না। কাজ পেতে হলে পরিবারের ইচ্ছুক সদস্যকে একনাগাড়ে ১৪ দিন কাজ চাইতে হবে। কিন্তু বিস্ময়কর বিষয় হল যে, বিগত ৭ বছরে কোন সময়েই একনাগাড়ে ১৪ দিন কাজ চায়নি এমন জবকার্ডধারীর সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে মোট বন্টিত জবকার্ডের অর্ধেকেরও বেশি। সুতরাং ভাবার সময় এসে গেছে যে, এমন পরিবারগুলিতে সত্যিই জবকার্ড রাখার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা। তবে এক্ষেত্রে এমন সংস্থান রাখা যেতে পারে, যখন এই ধরনের জবকার্ডগুলিকে 'অলস' বা 'অব্যবহৃত' জবকার্ড হিসাবে ঘোষণা করা যায় কিনা। তবে এক্ষেত্রে এমন সংস্থান রাখা যেতে পারে, যখন এই ধরনের জবকার্ডধারীরা একনাগাড়ে ১৪ দিন কাজ করার জন্য আবেদন করবেন তখন এই জবকার্ডগুলিকে সচল করা হবে। জবকার্ডধারী যে কোন পরিবারের সদস্য বছরের যে কোন সময়ে গ্রামপঞ্চায়েতের কাছে আবেদন করে কাজ চাইতে পারেন।

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা আইনে সুনির্দিষ্ট করা আছে যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বসবাসকারী জবকার্ডধারী পরিবারগুলি গ্রামপঞ্চায়েতের কাছে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে

প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসারের কাছে বছরের যে কোন সময় লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে একটানা ১৪ দিন কাজ চাইতে পারেন। কাজের আবেদনপত্র পাওয়ার সাথে সাথে তারিখ সহ প্রাপ্তি স্বীকারের রসিদ দিতে হবে এবং ১৫ দিনের মধ্যে কাজ দিতে হবে। ১৫ দিনের মধ্যে কাজ দেওয়ার মত কোন প্রকল্প বা গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে সেই মুহূর্তে না থাকলেও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতে পরিচালিত অন্য কোন প্রকল্প যা পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ বা অন্য কোন সরকারি বিভাগ রূপায়ণ করেছে, সেখানে কাজ দিতে হবে। এক্ষেত্রে গ্রামপঞ্চায়েতের সদস্যদের বা প্রোগ্রাম অফিসারের মাধ্যমে অন্য কোন কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে কাজের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে কাজ দেবার নির্দেশ পাঠাবে। যেভাবেই হোক কাজ দিতে হবে কাজ চাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে। এভাবে কোন পরিবারকে বছরে সর্বাধিক ১০০ দিন কাজ দেবার বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আবেদনকারীকে তার বাসস্থানের ৫ কিলোমিটারের মধ্যে কাজ দিতে হবে। কর্মক্ষেত্রে দূরত্ব কোন কারণে ৫ কিলোমিটারের মাত্রা অতিক্রম করলে নির্ধারিত মজুরির ১০ শতাংশ হারে ভর্তুকি প্রদান করতে হবে। এইভাবে কাজ চাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে কাজ দেওয়ার বিষয়টি গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী মানুষের কর্মের অধিকারের ও আইনি নিশ্চয়তার বিষয়টিকে যথাযথ সুরক্ষা প্রদান করে। তদুপরি ৫ কিলোমিটার দুরত্বের মধ্যে কাজ দেওয়া এবং দূরত্ব ৫ কিলোমিটার অতিক্রম করলে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ মজুরী কর্মনিশ্চয়তা আইনের বিধিবদ্ধতা ও বাস্তবতাকেই প্রমাণ করে।

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা আইন ও প্রকল্পের নির্দেশিকায় 'বেকার ভাতা' (Unemployment Allowance) এর প্রসঙ্গটি সুনির্দিষ্ট করা আছে। সেখানে বলা হয়েছে যে কোন পরিবারের সদস্য বা সদস্যরা কাজ চাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে কাজ দিতে না পারলে যতদিন পর্যন্ত কাজ না দেওয়া যাচ্ছে ততদিন ওই পরিবারটি বেকারভাতা পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, কাজ চাওয়ার ১৫ দিন পর থেকে প্রথম ৩০ দিন পর্যন্ত ওই বেকার ভাতার পরিমাণ হবে এই প্রকল্পে নির্ধারিত অদক্ষ শ্রমিকের মজুরির এক চতুর্থাংশ। ৩০ দিন পর থেকে ওই অর্থবর্ষের বাকি দিনগুলির জন্য বেকার ভাতার পরিমাণ হবে মজুরির অর্ধাংশ।[১৮] এখানে মনে রাখা দরকার যে বেকার ভাতার প্রসঙ্গ তখনই উঠবে যখন লিখিতভাবে কাজ চাওয়ার (এক নাগাড়ে অন্তত পক্ষে ১৪ দিন) ১৫ দিনের মধ্যে কাজ সম্ভবপর হয়নি। কাজ চাইতে গেলে যেমন লিখিতভাবে আবেদন করতে হয়, তেমনি লিখিত আবেদনের মাধ্যমেই বেকারভাতা চাইতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কোন প্রাকৃতিক পরিস্থিতি না থাকে, সেক্ষেত্রে উপযুক্ত যুক্তি সাপেক্ষে বেকারভাতা দেওয়া থেকে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব। এছাড়াও কোনও নথিভুক্ত আবেদনকারী যদি কাজ দেওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে কাজে যোগ না দেন বা কাজটি গ্রহণ না করেন অথবা এক সপ্তাহের বেশি সময়ব্যাপী যদি অনুমতি ব্যাতিরেকে কাজ থেকে অনুপস্থিত থাকেন, সেক্ষেত্রে তিনি বেকার ভাতা পাবার

যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। এই বিষয়টির সাথেও 'কর্মের অধিকার' সম্পৃক্ত রয়েছে। যদি কোন কারণে গ্রামপঞ্চায়েত উপযুক্ত আবেদনকারীকে কাজ দিতে অক্ষম হয়, তাহলে আইনানুসারে ১৫ দিন পর থেকে বেকারভাতা দিতে বাধ্য থাকে। ফলত কাজ চেয়েও না পাওয়া ব্যক্তি বা পরিবারের সামনে উপার্জনের পথটি খোলাই থাকে।

জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র পরিবারগুলির কাছে নায্য মজুরীতে বছরে অন্তত ১০০ দিন কাজের সুযোগ এনে দিতে দায়বদ্ধ। এই প্রকল্পে ঠিকমতো সারা বছর ধরে কাজ দেওয়া সম্ভব হলে অনেক পরিবারের সদস্যরাই ঘর ছেড়ে অন্যত্র কাজ করতে যাওয়ার মত অসুবিধাজনক পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। এমনকি নিজেদের গ্রামেও অন্যের জমিতে ক্ষেত্র মজুর, রাজমিস্ত্রির সহকারি বা ইটভাটার শ্রমিকের কাজ না করে সরাসরি এই সরকারি প্রকল্পে কাজ করতে অধিকতর উৎসাহিত হবেন। তবে এই প্রকল্পের একটি সমস্যা হল কাজের মজুরি পেতে অনেকদিন লেগে যায়। কিন্তু সাধারণভাবে দেখা যায় যে অন্যের জমিতে কৃষি শ্রমিক, রাজমিস্ত্রির সহকারি বা ইটভাটার শ্রমিক হিসাবে কাজ করলে, দিনের মজুরি দিনেই পাওয়া যায়। ফলে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র 'দিন আনি দিন খাই' পরিবারগুলির কাছে এই দিনমজুরি অনেক বেশি আকর্ষণীয়—সে মজুরির পরিমাণ যাই হোক না কেন। এই সমস্যা দূরীকরণের জন্য জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা আইনে বিধান রয়েছে যে, কাজ করার ১৪ দিনের মধ্যে মজুরি দিতে না পারলে জবকার্ডধারী অদক্ষ শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ক্ষতিপূরণের মাত্রা ঠিক করে দেবেন এই বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ। পশ্চিমবঙ্গে এই দায়িত্বটি শ্রম মহাধ্যক্ষ ও তার অধস্তন আধিকারিকদের হাতে ন্যস্ত। সুতরাং কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে কাজ করেও মজুরী পেতে বিলম্ব হলে যে ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থাটি রয়েছে তা কর্মের অধিকারের একটি প্রায়োগিক দিকেরই অঙ্গ। মজুরী পাওয়ার বিলম্বের কারণে শ্রমিকদের যে ক্ষতি হয় তার পরিপূরক ব্যবস্থা করার মধ্যে দিয়ে কর্মের অধিকারের বিষয়টিকে অনেকখানি সুরক্ষা প্রদান করা গেছে।

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল অন্যান্য প্রকল্পের সাথে সমন্বয়ের সুযোগ। অন্যান্য প্রকল্পের সঙ্গে সম্বন্বয় সাধনের মাধ্যমে কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পটিকে আরো বেশি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর। একদিকে যেমন এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারি যে সমস্ত পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যরা নির্দিষ্ট মজুরিতে হস্তনির্ভর অদক্ষ শ্রমিকের কাজ করতে ইচ্ছুক তাদের বছরে অন্তত ১০০ দিন কাজের বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করা, অন্যদিকে গ্রামীণ অর্থনীতি, বিশেষত গ্রামীণ কৃষিকে পুনরুজ্জীবিত করার মধ্য দিয়ে আরো বেশি পরিমাণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। একাধারে স্থায়িত্বশীল সামাজিক সম্পদ সৃষ্টি এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পটি এককভাবে যথেষ্ট নয় বলে ধরে নেওয়া যায়। সেহেতু এই প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণের জন্য প্রকল্পটির

মাধ্যমে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ আছে তার সাথে যদি অন্যান্য বেশ কিছু প্রকল্পের সমন্বয় ঘটানো যায় সেক্ষেত্রে বিষয়টি অনেক বেশি কার্যকরী হবে, তা আশা করাই যায়[১৯]। একই সাথে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে থাকে। এই অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ নিজ নিজ স্তরে পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং পরিকল্পনা রূপায়ণের মাধ্যমে এলাকার মানুষের জন্য কাজ করে থাকে। অর্থ কমিশনের বরাদ্দকৃত টাকার কিছুটা অংশ যদি মহাত্মা গান্ধী কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বিত করা যায় তাহলে একদিকে যেমন গ্রামীণ এলাকার শ্রমিকের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যাবে, অন্যদিকে গ্রামীণ এলাকায় স্থায়ী সামাজিক সম্পদ (পুকুর, রাস্তাঘাট, বাঁধ ইত্যাদি) তৈরী করা সম্ভব হবে। একইভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলকেও ব্যবহার করা সম্ভব। কিন্তু এই ধরণের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে। প্রথমত, অন্যান্য প্রকল্পগুলির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের যে নিজস্ব সুযোগ রয়েছে তা সংকুচিত করে কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের সাথে সমন্বয় না করাই বাঞ্ছনীয়। বরং এই প্রকল্পের সাথে সমন্বয় যাতে ওই অর্থ ব্যয়ের বিনিময়ে রূপায়িত প্রকল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ সামগ্রিক ভাবে আরো অনেকটা বৃদ্ধি করতে পারে সে বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে। বরং অন্যান্য প্রকল্পের টাকা এবং কারিগরি জ্ঞান ও তদারকির ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বিত করা যায়। অর্থাৎ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের সঙ্গে অন্যান্য প্রকল্পের সমন্বয়ের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই হওয়া উচিত গ্রামীণ এলাকায় আরো বেশি কর্মসংস্থান এবং সামাজিক সম্পদ সৃষ্টির সুযোগ বৃদ্ধি করা।

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ই হল স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা। সামাজিক নিরীক্ষার মাধ্যমে জনসাধারণকে সরাসরি এবং প্রতিনিয়ত পরিকল্পনার সমস্ত বিষয়গুলি পরিদর্শনের সুযোগ প্রদান এই আইনের এক উদ্ভাবনী বৈশিষ্ট্য। এর মূল লক্ষ্য হল কর্ম সম্পাদন, আইনের প্রয়োগ ও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনগণের প্রত্যক্ষ দায়বদ্ধতা সুনিশ্চিত করা। সামাজিক নিরীক্ষার এক অতি সরল পদ্ধতি—জনশুনানির মাধ্যমে প্রকল্পের সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়বস্তু প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ বা এলাকার মানুষের সামনে তুলে ধরা এবং তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য, অভিযোগ ও সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। এরূপ জনশুনানি থেকে প্রাপ্ত সমস্ত অভিযোগের যথাযথ তদন্তের ব্যবস্থা করা ও তার সামাজিক নিরীক্ষা এই পদ্ধতির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষ।[২০] মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা আইনের ১৭ নং ধারায় সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনার কথা বলা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামসভায় সম্পাদিত কাজের সমস্ত নথিপত্র পেশ করার বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কর্মনিশ্চয়তা আইনের মাধ্যমে রূপায়িত সমস্ত কাজের সামাজিক নিরীক্ষা সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার জন্য কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন দপ্তর ২০১১

সালে এম.জি.এন.আর.ই.জি.এ. অডিট অফ স্পীন্সস্ রুল পাশ করে। এইভাবে এই প্রকল্পের সকল অংশগ্রহণকারী ও সুবিধাভোগীদের পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শনে প্রত্যক্ষ ভাবে অংশীভূত করার মাধ্যমেই কর্মনিশ্চয়তা আইনে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা রক্ষার বিষয়টিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। আর এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই জনশুনানির মাধ্যমে গ্রামীণ জনসাধারণকে একত্রে জমায়েত করে প্রকল্পের মধ্য দিয়ে রূপায়িত সমস্ত কাজের বিস্তারিত ব্যাখা বিশ্লেষণের দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। একটি খোলা জায়গায় জনশুনানির মাধ্যমে সামাজিক নিরীক্ষার কাজটি সম্পাদন করা হয়। জেলাশাসক বা তার কোন প্রতিনিধি জনশুনানির দিন উপস্থিত থেকে সভায় সভাপতিত্ব করেন। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই জনশুনানি আয়োজন করা হয়, সেই গ্রাম পঞ্চায়েতে এমনকি সেই পঞ্চায়েত সমিতির কোন সরকারি আধিকারিককে এই সভায় সভাপতিত্ব করতে দেওয়া হয় না। এই জনশুনানির সভায় গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সকল সদস্য, এলাকার বিধায়ক, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সহ গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক স্তরের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকেরা উপস্থিত থাকেন। নিরীক্ষা দলের একজন সদস্য উপস্থিত সকল ব্যক্তিবর্গের সামনে নিরীক্ষা-প্রতিবেদনটি (Audit Report) পড়ে শোনান। নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রত্যেকটি বিষয়ে সভাপতি উপস্থিত জনসাধাণের সঙ্গে আলোচনা করেন, তাদের মতামত গ্রহণ করেন এবং মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি সভায় কার্য-বিবরণীতে নথিভূক্ত করেন এবং সবশেষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন। জনশুনানির পর নিরীক্ষার প্রতিবেদন এবং সভার কার্যবিবরণীটি কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসারের নিকট প্রেরণ করা হয়। প্রোগ্রাম অফিসার প্রতিবেদন, কার্যবিবরণী এবং সামাজিক নিরীক্ষার তথ্যের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

পাঁচ

কর্মের অধিকারের নিশ্চয়তা ও আইনি সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে কর্মনিশ্চয়তা আইনের ভূমিকা কতখানি তা আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ না করলেই নয়–প্রথমত, তত্ত্বনির্ভর কাঠামোগত দিক থেকে জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের বুনিয়াদ হল কর্মের অধিকারের স্বীকৃতি ও আইনি সুরক্ষার ব্যবস্থাপনা। পরিবার পিছু বছরে ১০০ দিনের কাজের নিশ্চয়তা দেওয়া এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য, যেখানে কাজ দেওয়া হয় শ্রমিকদের চাহিদার ভিত্তিতে। এই দৃষ্টিভঙ্গটি 'স্ব-মনোনয়নের নীতি'র (Principle of Self-Selection)[২১] ওপর নির্ভরশীল। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, যে ব্যাক্তিটি অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে হস্তনির্ভর কায়িক পরিশ্রমের কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করবেন রাষ্ট্র তাকে কাজ দেবে। কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের এই পন্থাটিই হল মৌলিক ভাবে অতীতের অন্যান্য প্রকল্পগুলির থেকে পৃথক। কারণ গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রকল্পগুলিতে মূলত 'উপর থেকে নীচে' দৃষ্টিভঙ্গি (Top-down approach)

গ্রহণ করা হত। বর্তমান আলোচ্য ক্ষেত্রটি একটি স্পষ্ট সম্ভাবনার পথ উন্মোচিত করেছে, যেখানে নির্দিষ্ট পরিমাণ ন্যূনতম মজুরীতে কাজ করতে আগ্রহী দরিদ্র মানুষজন অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে হস্তনির্ভর কাজের অধিকার দাবী করতে পারেন। যা বিশেষভাবে তৃণমূলস্তরে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতিকে আরো শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। এ প্রসঙ্গে আরোও বলা যায় যে, গ্রামীণ দরিদ্র মানুষগুলির কর্মনির্বাচনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে— যা অতীত অভিজ্ঞতার থেকে অনেকাংশেই ভিন্নতর, যেখানে উন্নয়ন প্রশাসনের প্রশাসক তথা আমলাগণ অথবা রাজনীতিক ব্যক্তিবর্গ স্থির করতেন যে কি ধরনের সম্পদ তৈরী হবে। কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরীর বিষয়টিকে মাথায় রেখে এবং একই সঙ্গে ভাটার মরশুমে কর্মহীন গ্রামীণ শ্রমিকদের কাজের বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করার জন্য দীর্ঘস্থায়ী সমাজ উন্নয়ন প্রতিরূপ (Sustainable Community Development Model) তৈরীর প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।[২২] দ্বিতীয়ত, কর্মনিশ্চয়তা আইনে বলা হয়েছে যে, এই প্রকল্পে অদক্ষ শ্রমিকের কাজ করতে ইচ্ছুক গ্রামীণ পরিবারগুলিকে নিবন্ধীকরণের জন্য স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে আবেদন করতে হবে। এই প্রকার নিবন্ধীকরণের মধ্য দিয়ে আবেদনকারীদের জবকার্ডের স্বত্ব প্রদান করা হবে। এই জবকার্ডটি হল প্রাথমিক বাহ্যিক হাতিয়ার যা আবেদনকারীকে কাজের দাবী করতে সমর্থ করে এবং এটি হল শ্রমিকের কাজের অধিকারের নথি বা তথ্য। সুতরাং কাজ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি জবকার্ডের উপর ভিত্তি করে কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে কাজ দাবী করতে পারে, যা প্রকল্পটির চাহিদা নির্ভর (Demand based) রূপটিকে সুস্পষ্ট করে।[২৩] তৃতীয়ত, প্রকল্পটিতে আবেদনকারীকে কাজ চাওয়ার সাথে সাথে রসিদ প্রদানের ব্যবস্থা এবং ১৫ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কাজ দিতে না পারলে 'বেকার ভাতা' প্রদান করার কথা বলা হয়েছে। তদুপরি কাজ করার ১৪ দিনের মধ্যে পারিশ্রমিক দিতে না পারলে পরিবারগুলিকে মজুরীর সাথে সাথে বাড়তি ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধান গৃহীত হয়েছে। সুতরাং বিষয়গুলি একদিকে যেমন কর্মের অধিকারকে সুরক্ষিত করেছে সাথে সাথে প্রকল্পটির সময় সীমার নিশ্চয়তাকেও (Time-bound guarantee) প্রতিষ্ঠিত করেছে।[২৪] চতুর্থত, প্রকল্পটির নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যে কাজের জন্য আবেদনকারীকে স্থানীয় কাজে নিয়োগ অর্থাৎ কাজের ক্ষেত্রটিকে অদক্ষ শ্রমিকের বাসস্থানের ৫ কিলোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। কোন কারণ বশতঃ কর্মক্ষেত্রের সীমানা ৫ কিলোমিটার অতিক্রম করলে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ হারে মজুরী প্রদান বাধ্যতামূলক। এই নিয়ম স্থানীয় ভিত্তিতে কাজে (Local employment) নিয়োগের বিষয়টি সুনিশ্চিত করে।[২৫] পঞ্চমত, কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পটির সাথে কাজের নমনীয়তা (Flexbility of work) বিষয়টিও ভীষণভাবে জড়িয়ে আছে।[২৬] এখানে কাজে যোগ দেওয়া বিষয়টি সম্পূর্ণ ভাবেই নির্ভর করে গ্রামীণ পরিবারগুলির সদস্যদের ইচ্ছা–অনিচ্ছা এবং আগ্রহ–অনাগ্রহের উপর। তারা চাহিদা মত কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে।

উক্ত বিষয়টি আইনি প্রকল্পটির নমনীয় দিকটিকে উন্মোচিত করে। ষষ্ঠত, জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের ঠিকাদার বা যন্ত্রপাতির ব্যবহার কঠিনভাবে বর্জনীয়। অর্থাৎ কোনভাবেই প্রকল্পটিতে ঠিকাদার সংস্থা বা মাটিকাটা, বহনের অথবা অন্য কোন প্রকার কাজে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাবে না, তা আইনে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে। সপ্তমত, কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে মজুরি এবং উপকরণের অনুপাত হল ৬০ : ৪০। প্রকল্পের নির্দেশিকায় (Guidlines) বলা আছে যে মোট ব্যয়ের ৬০ শতাংশ অবশ্যই অদক্ষ শ্রমিকদের মজুরি হিসাবে দিতে হবে। আর বাকী ৪০ শতাংশ উপকরণের পেছনে ব্যয় করা যাবে। যার মধ্যে সুদক্ষ (Skilled) এবং অর্ধদক্ষ (Semi-Skilled) শ্রমিকদের মজুরীও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এই ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রকল্পটির মোট ব্যয়ের অধিকাংশ যাতে গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী অদক্ষ শ্রমিকের হাতে মজুরী হিসাবে পৌঁছায় তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রকল্পটিতে 'শ্রম নিবিড় কাজ' (Labour-intensive work)[২৭] এর নীতি গ্রহণের মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষজনের হাতে মোট ব্যয়ের গরিষ্ঠাংশ তুলে দিয়ে গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে। অষ্টমত, জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে আবেদন পদ্ধতিই হল কর্মের অধিকারের দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কর্মপ্রার্থীরা যদি কাজের যোগ্য হন তাহলে তাদের কাজের অধিকার রয়েছে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান বা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে আবেদন করে আইনটির মাধ্যমে কাজ পাওয়ার। সুতরাং একথা বলা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের মুখবন্ধেই কাজের অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদানের বিষয়টিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নবমত, সামাজিক নিরীক্ষা এবং অনুকূল সক্রিয় উদ্‌ঘাটন (Social audit & proactive disclosure)[২৮] প্রক্রিয়া হল কর্মনিশ্চয়তা আইনের অন্যতম রক্ষাকবচ। এর দ্বারা যেমন আইনী প্রকল্পটির স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা রক্ষা করা যায়, তেমনি জনগণের সম্মুখে সামাজিক নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তাদের 'তথ্য জানার অধিকার'[২৯] কেও স্বীকৃতি দেওয়া যায়। সুতরাং বলা যায় যে কর্মনিশ্চয়তা আইনটিতে সবদিক থেকে জনগণের অধিকার রক্ষার ইতিবাচক উপাদানগুলি মজুত রয়েছে।

উপসংহার

'মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন' মানুষকে নুন্যতম কাজের অধিকার প্রদান করেছে। এই আইন রূপায়ণে দেশ জুড়ে চলছে বিশেষ কর্মকান্ড। এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে কেবল মাত্র পশ্চিমবঙ্গেই প্রতিবছর প্রায় ৫০ লক্ষের মত পরিবারের সদস্যেরা কাজ পাচ্ছেন, মজুরী বাবদ পরিবারগুলির কাছে পৌঁছাচ্ছে সহস্রাধিক কোটি টাকা। ২০১১-১২ আর্থিক বর্ষে পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্পে প্রদেয় মজুরীর পরিমান ছিল ১৯২৮ .৩৮ কোটি টাকা।[৩০]

কর্মনিশ্চয়তা আইনে মানুষের বছরে অন্তত ১০০ দিন 'কাজের অধিকার' স্বীকৃতি পেয়েছে। সৃষ্টি হচ্ছে শ্রমদিবস; সৃষ্টি হচ্ছে সামাজিক সম্পদ। এখান থেকে কতকগুলি প্রশ্ন উঠে আসে- কাজের পরিমাণ যতটা বেড়েছে, কাজের গুণগত মান ততটা বেড়েছে কী ?

সরকার কি পারছে সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এই প্রকল্পের সুযোগ, কাজ চাইছেন এমন পরিবারগুলির কাছে সঠিক মাত্রায় পৌঁছে দিতে ? এই প্রকল্প কি এমন সম্পদ সৃষ্টি করতে পারছে যা কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম ? সব পরিবার কি এই আইনে প্রাপ্ত তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছে ? কাজের জায়গায় যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা অত্যাবশক, তা কী করা যাচ্ছে বিভিন্ন এলাকায় ? কেবলমাত্র একটা বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ হয়ে না থেকে এই প্রকল্প কি উন্নয়নের অন্যান্য উদ্যোগের সঙ্গে সমন্বয় ঘটাতে পারছে ? পরিকল্পনা প্রস্তুতি, প্রকল্পগুচ্ছ তৈরী, প্রাককলন প্রস্তুতি, প্রকল্পের প্রশাসনিক ও কারিগরি অনুমোদন-এসব কি আইনি নির্দেশিকা মেনে হচ্ছে ? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার সময় এবার এসেছে। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পকে কেবলমাত্র অর্থব্যয় ও শ্রমদিবস সৃষ্টির একটি প্রকল্প হিসাবে না দেখে, প্রকল্পটিকে গ্রামোন্নয়নের চালিকা শক্তি হিসাবে তুলে ধরার সময় এসেছে।

প্রকল্পের সংখ্যাগত মূল্যায়ণ থেকে গুণগত মূল্যায়ণে রূপান্তর ঘটানোর জন্য প্রয়োজন নিরন্তর চর্চার। এই আইনি প্রকল্পে ঠিক কী করতে চাওয়া হয়েছে, আর ঠিক কীভাবে করতে হবে, এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার ক্ষেত্রটিকে খুলে দেওয়া দরকার; দরকার স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার। গ্রামাঞ্চলের মানুষ জানুন সরকার কী করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, আর কতখানি তা রক্ষা করতে পারছে। তথ্যের অধিকার এখন আইন দ্বারা স্বীকৃত, কিন্তু তথ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে চলে চলবে না। এই আইনের মাধ্যমে স্বীকৃতি দিতে হবে উন্নয়নের ভাবনাকে, আর উন্নয়নের সূচীমুখ বুঝে নেওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের অধিকারকে। প্রকল্পের অভিমুখ সম্পর্কে যত বেশি চর্চা হবে, যত বেশি মানুষ জানবেন, বুঝবেন; ততটি প্রকল্পটি সমৃদ্ধ হবে। সাথে সাথে সমৃদ্ধ হবেন শ্রমিকেরা, সমৃদ্ধ হবেন আপামর জনসাধারণ। সবশেষে, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন প্রকৃত অর্থেই হয়ে উঠুক মানুষের কর্মের অধিকারের স্বীকৃতি— এই আশা যাতে বাস্তবায়িত হয় তার জন্য প্রয়োজন সর্বস্তরে নিরন্তর আলাপ-আলোচনা।

টীকা ও তথ্যসূত্র :

১. কৌস্তভ ব্যানার্জী, ২০১০, ''দ্য রাইট টু ওয়ার্ক ইন থিওরি এ্যান্ড প্র্যাকটিস : এ কেস স্টাডি অফ এন. আর. ই. জি. এ. ইন্ডিয়া'', *সোস্যাল্ ডেভালপমেন্ট রিপোর্ট-২০১০*. নিউ দিল্লি : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃ. ২.

২. ডাব্লু ডাব্লু ডাব্লু. ও এইচ সি এইচ. ও আর জি/ই এন/ইউ ডি এইচ আর/ডকুমেন্স্র/ইউ ডি এইচ আর ট্রান্সলেশনস/ ই এন জি. পি ডি এফ, প্রবেশকৃত - ২১.০৪.২০১৪.

৩. ই এন. উইকিপেডিয়া. ও আর জি/ .../আইসিসিপিআর, এবং ই এন. উইকিপেডিয়া. ও আর জি/ .../আইসিইএসসিআর, প্রবেশকৃত - ২১.০৪.২০১৪.

৪. পি. এম. বক্সি, ২০০৯. *দ্য কনসিটিউশন্ অফ ইন্ডিয়া*. দিল্লি : ইউনিভার্সাল ল পাবলিশিং কোং, পৃ. ৮৮.

৫. গভর্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, ২০০৭. *ন্যাশনাল রুর‍্যাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট (এন আর ই জি এ) সাম্ রিপোর্টস্ ফ্রম দ্য ফিল্ড, ২০০৬-০৭*. নিউ দিল্লি : মিনিস্ট্রি অফ রুর‍্যাল ডেভালপমেন্ট, পৃ. ২.

৬. 'ভারত নির্মাণ' এর লক্ষ্য মাত্রাটি সংযুক্ত প্রগতিশীল জোট সরকার গ্রামীণ ভারতের পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে স্থির করে, এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একাদশতম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০০৭-১২) তে জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনে প্রকল্প রূপায়ণের উপর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

৭. জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা আইনকে সার্বজনীন রূপ প্রদানের বিষয়টি আধুনিক ধারণা (২০০৮)। এই আইনকে সার্বজনীন করার ক্ষেত্রে তৎকালীন (২০০৮) জাতীয় কংগ্রেসের মহাসচিবের দাবিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৮. *দ্য হিন্দু*, ২৪ জানুয়ারী ২০১০, পৃ. ৬.

৯. গভর্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, ২০০৮. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৮.

১০. কৌশিক রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৭. *পভার্টি অ্যালেভিয়েশান এ্যান্ড প্রো-পুওর গ্রোথ ইন ইন্ডিয়া*. নিউ দিল্লি : এশিয়ান ইনসিটিউট অফ ট্রান্সপোর্ট ডেভালপমেন্ট, পৃ. ৪-৯.

১১. মহারাষ্ট্র এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কীম সম্পর্কে বিশদ জানতে দেখুন- *প্রোগ্রাম এভাল্যুশেন অর্গানাইজেশান : জয়েন্ট এভাল্যুশেন রিপোর্ট অন এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কীম অফ মহারাষ্ট্র*, ১৯৮০, পি ই ও স্টাডি নং ১১৩.

১২. ডাব্লু ডাব্লু ডাব্লু. এন আর ই জি এ. নিক্. ইন্, প্রবেশকৃত - ১৭.০৩.২০১০.

১৩. গভর্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, ২০০৮. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬১.

১৪. অমিতা শর্মা, ২০১০. *''দ্য মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুর‍্যাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট'', সাকসেসফুল ফ্লোর প্রোটেকশান এক্সপেরিয়েন্স*. ভল্যুম ১৮, নিউ দিল্লি, পৃ. ২৭২.

১৫. গভর্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, ২০০৮. *দ্য ন্যাশনাল রুর‍্যাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট (২০০৫)- অপারেশনাল গাইডলাইনস ২০০৮* (থার্ড এডিশান্). নিউ দিল্লি : মিনিস্ট্রি অফ রুর‍্যাল্ ডেভলাপমেন্ট, পৃ. ১.

১৬. *ঐ*, পৃ. ২২.

১৭. ডাব্লু ডাব্লু ডাব্লু. এন আর জি এ. নিক. ইন, প্রবেশকৃত - ২৭.০৯.২০১২.

১৮. গভর্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, ২০০৮. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭.

১৯. *ঐ*, পৃ. ৮৬-৮৭.

২০. *ঐ*, পৃ. ৬২-৬৩.

২১. কৌস্তভ ব্যানার্জী, ২০১০. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯.

২২. *ঐ*, পৃ. ১০.

২৩. অমিতা শর্মা, ২০১০. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭৪.

২৪. *ঐ*.

২৫. *ঐ.*

২৬. *ঐ.*

২৭. *ঐ.*

২৮. গভর্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, ২০০৮. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬২.

২৯. *ঐ*, পৃ. ৬৩.

৩০. ডাব্লু ডাব্লু ডাব্লু. এন আর ই জি এ. নিক. ইন, প্রবেশকৃত - ২৪.০৫.২০১২.

মানসেন্দু কুন্ডু

ল্যান্ডবন্ড : জমি অধিগ্রহণের এক সম্ভাবনাময় চাবিকাঠি

পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যা এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বিষয়ক পরিসংখ্যানের দিকে তাকিয়ে ভাবলে এ কথা অনস্বীকার্য যে এই রাজ্যে দ্রুত শিল্পায়ন জরুরী; এবং সেই শিল্পায়ন যেন বহু মানুষের স্থায়ী কর্মসংস্থানে সক্ষম হয়। অর্থাৎ, রাজ্যে এক শ্রমনিবিড় শিল্পায়নের প্রয়োজন। গত চার দশক ধরে চলা শিল্পায়নের খরা যদি আরো দীর্ঘায়িত হয় তাহলে অচিরেই এ রাজ্যে এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। বলা বাহুল্য, রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য শুধু শিল্পায়ন যথেষ্ট নয়; সঙ্গে প্রয়োজন কৃষির যথাযথ উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও সামাজিক ন্যায়ের সম্প্রসারণ। সিঙ্গুর – নন্দীগ্রাম পর্বের পরে এ কথা বলা অপ্রয়োজনীয় যে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নের পথে প্রথম প্রতিবন্ধকতা হ'ল জমির সংস্থান। অবশ্য জমি সংক্রান্ত এই সমস্যা শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সমগ্র ভারতেরই সমস্যা। জমি অধিগ্রহণের জন্য ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ঔপনিবেশিক আইন বাতিল করে নতুন এক আইন প্রণয়নের প্রয়োজনে কেন্দ্রের তৎকালীন 'ইউ পি এ' সরকার ২০১১ এর সেপ্টেম্বর মাসে লোকসভায় এক বিল পেশ করে। তার প্রায় দু' বছর পর ২০১৩ এর ২৯ আগষ্ট লোকসভায় এবং ৪ সেপ্টেম্বর রাজ্যসভায় কিছু সংশোধনী সহ তা অনুমোদিত হয়। রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়ার পর ২০১৪ এর পয়লা জানুয়ারী থেকে এই আইন জম্মু ও কাশ্মীর বাদে দেশের সর্বত্র চালু হয়।

এক

The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquistion, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013–আইনের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হল : (১) গ্রামাঞ্চলের জমির জন্য ক্ষতিপূরণের পরিমান হবে বাজার দরের চারগুণ; শহরাঞ্চলে এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বাজারদরের দ্বিগুণ; (২) বেসরকারী প্রয়োজনে জমি অধিগৃহীত হলে আশি শতাংশ জমিদাতার সম্মতি প্রয়োজন; (৩) অধিগ্রহণের আগেই সামাজিক ও পরিবেশগত সম্ভাব্য প্রভাবের মূল্যায়ণ জরুরী। জমি অধিগ্রহনের এই নতুন আইন সত্যিই কি পশ্চিমবঙ্গকে শিল্পোন্নত করতে পারে ? একাধিক কারণে তা পারে না বলে মনে হয়। প্রথমে শিল্পসংস্থাগুলির কথা ধরা যাক্। উপরে উল্লিখিত আইনের তিনটি শর্তই শিল্প স্থাপনে আগ্রহী সংস্থা ও ব্যক্তির পক্ষে হতোদ্যমকারী। শিল্পোদ্যোগীরা তাদের এই মনোভাব গোপন করেন নি। এ রাজ্যের বহু অঞ্চলে জমির উচ্চ মূল্য শিল্পায়নের সম্ভাব্য ক্ষেত্র হিসাবে পশ্চিমবঙ্গকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সারিতে ঠেলে দেয়। প্রথমত, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে কৃষি জমির বর্তমান বাজারদর অন্যান্য রাজ্যের একই ধরনের জমির চেয়ে বেশী। অনেকের কাছেই একথা নতুন নয়; কিন্তু যে কথা বহু মানুষ জানেন না এবং শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হয় তা হল পশ্চিমবঙ্গে এক বিরাট অংশে চাষের জমির দাম আমেরিকা বা ইংলান্ডের কৃষিজমির দামের তুলনায় বেশী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিদপ্তর প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী আগষ্ট ২০১৩ সালে সে দেশে চাষের জমির দাম ছিল গড়ে একর পিছু ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা (কমবেশী চার হাজার ডলার), দেশের সুজলা সুফলা বহু অঞ্চলে ও এই দাম সচরাচর চার লাখ টাকার বেশী নয়। তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা মোটামুটি যেসব অঞ্চলে উন্নত, সেখানে জমির দাম একর পিছু ছয় থেকে নয় লাখ টাকার বেশী বই কম নয়। হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান জেলার বহু অঞ্চলে এই দাম দশ, বারো কিংবা পনেরো লক্ষ টাকা ছুঁয়েছে। টেলিগ্রাফ্ পত্রিকায় প্রকাশিত এক তথ্য অনুসারে ইংলন্ডে কৃষিজমির অপ্রতুলতা সত্ত্বেও ২০১৩ সালের একর প্রতি দাম ছিল সাত লাখ টাকার কম (৬৬৮২ ব্রিটিশ পাউন্ড স্টার্লিং)।

এমতাবস্থায় বাজারদরের চারগুণ টাকা খরচ করে জমি কিনে কোনও শিল্প সংস্থা কেন পশ্চিমবঙ্গে শিল্প গড়তে আসবে ? তাছাড়া আশী শতাংশ কৃষকের সম্মতি আদায়ের প্রক্রিয়াও শিল্পোদ্যোগীকে হতোদ্যম করে। যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ চাষ জমির মালিকানা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের হাতে, অল্প জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রেও এক বিরাট সংখ্যক কৃষকের সঙ্গে দর কষাকষি ও তাদের রাজী করানো প্রয়োজন। সরকারী মধ্যস্থতা ব্যতীত কোন শিল্প সংস্থাই সহজে সরাসরি জমি ক্রয়ের এই জটিল প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। আপাতদৃষ্টিতে এই আইনকে কৃষক স্বার্থবাহী বলে মনে হলেও বাস্তব কিন্তু ভিন্ন কথা বলে। পশ্চিমবঙ্গের কৃষকের কথাই ধরা যাক। জমি হাতছাড়া হলে তাদের ক্ষতি ঠিক কি-সে হিসাব আইন প্রণেতারা বোঝেন নি বা বোঝার চেষ্টা করেন নি। কৃষকের আসল ক্ষতির হিসাব কষে পূরণ করার চেষ্টা করলে জমি অধিগ্রহণের এক সম্পূর্ণ ভিন্ন মডেল তৈরী হয়।

দুই

জমি কৃষককে যে সমস্ত নিরাপত্তা দিয়ে থাকে, বলা বাহুল্য, তার প্রথমটি হল ফসলের নিরাপত্তা। দীর্ঘকাল বড় ও মাঝারি কৃষক উৎপাদিত ফসলের এক অংশ দিয়ে পরিবারের খাদ্যের সংস্থান করেছে। আর উদ্বৃত্ত অন্য অংশ বাজারে বিক্রি করে সাংসারিক বাকী খরচ মিটিয়েছে। প্রান্তিক কৃষকদের অনেকেই উৎপাদনের অপ্রতুলতার দরুন বাজারে তেমন ফসল বিক্রি করতে না পারলেও তা দিয়ে অন্ততঃ বেশ কয়েক মাসের অন্ন সংস্থান করেছে। অন্নের যোগান দেবার পর জমি কৃষককে নিরাপত্তা দেয় তা হল প্রয়োজনে জমির এক অংশ বিক্রি করে সে তার মেয়ের বিয়ে বা ছেলেকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত করার বড় খরচের ধাক্কাটা সামলাতে পারে। পরিবারে কারো বড় কোন অসুখ হলেও চিকিৎসার খরচ মেটাতে জমির এক অংশ বিক্রিই তার ভরসা। তাই জমি চাষীর মনে এক গভীর নিরাপত্তা বোধ জাগায়; জমি বিক্রির টাকা কিন্তু সেই বোধ তৈরী করে না। তাই দায়ে না পড়লে, বাজারদরেও কোন কৃষক জমি বেচতে চায় না। ব্যক্তিগত গবেষণা ভিত্তিক নির্দিষ্ট উদাহরণ দেওয়া যাক। হুগলী জেলার আরামবাগ ব্লকে মুন্ডেশ্বরী নদীর ধারে কেশবপুর, মলয়পুর ও পূর্ব কৃষ্ণপুরের তিন ফসলি জমির দাম একর পিছু কম বেশী দশ থেকে বারো লাখ টাকার মত। অর্থাৎ কৃষক এক একর জমি বিক্রি করে সেই টাকা সরকারী ব্যাংকে দীর্ঘ মেয়াদে রাখলে বাৎসরিক সুদ হিসাবে পেতে পারে আশী হাজার থেকে এক লাখ টাকার মত। অথচ অধিকাংশ কৃষক জমিতে ধান, আলু ও তিল ফলিয়ে চাষের খরচ বাদ দিয়ে নীট আয় করেন একর পিছু সর্বাধিক পঁচিশ হাজার টাকার মত। জমি বেচে দিয়ে কেন কৃষক বেশী আয়ের সুযোগ নেয় না ? এ বিষয়ে ঐ তিনটি গ্রাম এবং পশ্চিমবঙ্গের আরো কিছু গ্রামে সমীক্ষা করে যে চিত্র পাই তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় দেশের আইন প্রণেতা, আমলা এবং অর্থনীতিবিদদের বাস্তববোধ এবং কান্ডজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, তাঁরা আর যাই হোক কৃষককে সম্পূর্ণভাবে চিনতে পারেন নি।

উপরোক্ত সমীক্ষা থেকে উঠে আসা কৃষকদের সম্মিলিত বক্তব্য তাদের মুখের ভাষাতেই এখানে উপস্থাপন করা হচ্ছে যা থেকে তাদের আবেগকে সম্পূর্ণ বোঝা যায়। মনে রাখতে হবে কৃষকের নিজস্ব অর্থনৈতিক হিসাব ও আবেগকে গুরুত্ব না দেওয়া থেকেই সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম সমস্যার উদ্ভব। তাদের ভাষায় – "জমি আমরা বেচব কেন ? জমি তো পার্মানেন্ট অ্যাসেট্। তুলনায় টাকা হাত গলে বেরিয়ে যেতে সময় লাগে না। হাতে টাকা থাকলেই হাত চুলকায় খরচ করবার জন্য। আর জমি বেচে হাতে লাখ লাখ টাকা আনা মানে খাল কেটে কুমির আনা। প্রথমেই আরম্ভ হবে গৃহবিবাদ। ছোট ছেলে বায়না ধরবে তার চাই মোটর সাইকেল, বড় ছেলের চাই মোবাইল ফোন বিক্রির ব্যবসার জন্য টাকা, বৌ চাইবে বড় টিভি, গয়না। সামনে মেয়ের বিয়ে থাকলে বরপণের টাকার পরিমান বেড়ে যাবে। আর মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়ে থাকলে জামাই মেয়ের হাত মারফৎ জানাবে বিয়ের

সময় তাকে দাবীমত সব কিছু দেওয়া হয় নি। এবার শ্বশুরের হাতে টাকা এসেছে। সুতরাং তার পাওনা যেন মিটিয়ে দেওয়া হয়। জমি – বিক্রি করে টাকা পাওয়ার কথা গ্রামে প্রত্যেকটা মানুষের জানতে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগবে না। এখানে খবর ছোটে বাতাসের চেয়েও তাড়াতাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশী, আত্মীয় – স্বজনের অনেকে আসবে ধার চাইতে। কেউ মেয়ের বিয়ের জন্য, কেউ চিকিৎসার জন্য, কেউ ঘর সারাবার জন্য, হাজার জনের হাজার সমস্যা। এরপর আসবে চিটফান্ডের দালাল। তাদের কেউ আমার আত্মীয়, কেউ বা প্রতিবেশী। এতজনের টাকার দাবীতে রাতের ঘুম ছুটে যাবে। বাড়ীতে, পাড়ায়, বাজারে – সব জায়গায় আমার টাকার দিকে সবার লক্ষ্য। যাকে 'না' বলব সেই পাঁচকথা শুনিয়ে দেবে। শহরে কেউ কারো তেমন খবর রাখে না। এখানে আমি আজ কি দিয়ে ভাত খাচ্ছি তা সকলের নখদর্পনে। হাতে অত টাকা এলে আমারও মাথা ঘুরে যেতে পারে। এইভাবে কতদিন টাকা ধরে রাখতে পারব ? দু'বছর কিংবা তিন বছর। তার চেয়ে দরকার নেই জমি বেচে উটকো ঝামেলা ডেকে আনার। জমি যাবে, জমির পর টাকা ও যাবে। এরপর মেয়ের বিয়েও দিতে পারব না, ছেলেকেও দাঁড় করতে পারব না। ছেলেটা চাকরী না পেলে তার ব্যবসা করে খাবার সংস্থান তো আমাকেই করে দিতে হবে। দরকারে সেদিন কিছু জমি বেচব; আজ নয়। তাছাড়া জমি বেচে পাওয়া টাকার দাম তো দিনে দিনে কমবে। উল্টো দিকে জমির দাম কিন্তু বাড়া ছাড়া কখনো কমেছে বলে শুনিনি। আর ব্যাংকে টাকা রেখে তার সুদে খাব, কিন্তু সুদের হার যে কমবে না তার গ্যারান্টি কি আছে ? একদিকে টাকার দাম কমবে, অন্যদিকে সুদও যদি কমে তাহলে তো জমি হারিয়ে না খেতে পেয়ে মরব। এরপরও কি শহরে মানুষকে বোঝাতে হবে কৃষক কেন জমি ছাড়তে চায় না ? জমি তারাই বেচে যাদের জীবনে অন্য কোনও আর্থিক নিরাপত্তা আছে। কিংবা তারা জমি থেকে অনেক দূরে বাস করে। নয়তো বর্গাদার ফসলের নায্যভাগ তাদের দেয় না বা সেই জমি অনুর্বর। অথবা অন্য কোনও কারণে তাদের সেই জমি হাতছাড়া হবার ভয় আছে"।

আগেই বলেছি উপরের এই বক্তব্য একা কোনও কৃষকের নয়। তাদের টুকরো টুকরো বক্তব্যের যোগফল। এই সম্মিলিত বক্তব্যের যথার্থতা বিষয়ে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে এই মতামতকে সমর্থন জানাচ্ছে একশ শতাংশ কৃষক। তাদের প্রায় সকলেরই বক্তব্য গরীব চাষীর হাতে এককালীন টাকা তার জীবনের নিরাপত্তা বাড়ায় না, বরঞ্চ তা বিঘ্নিত করে। এই সহজ কথাটা অল্প স্বল্প শিক্ষিত কৃষকের মত করে তারা বুঝলেন না যাদের হাতে নতুন আইন তৈরীর ভার ছিল। দেখেশুনে মনে হয় এঁরা গজদন্ত মিনারে বাস করেন। তাঁদের পা মাটিতে থাকলে তাঁরা সহজেই বুঝতেন জমি কৃষককে দুই ধরনের নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। এক, আংশিক বা সম্পূর্ণ অন্নসংস্থান। দুই, প্রয়োজনে জমি বিক্রি করে আপৎকালীন খরচের ধাক্কা সামলানো। এই দুই এর নিশ্চিত বিকল্প না করে জমি নেওয়া অনৈতিক। বাজারদরের কয়েকগুণ টাকা কৃষকের হাতে ধরিয়ে তাকে লোভের ফাঁদে

ফেলে হয়তো তার কাছ থেকে জমি নিয়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু জমি দিয়ে টাকা নিয়ে নেবার পর আর জীবনের সমস্যা তার সমাধান করা যাবে না। পারিপার্শ্বিক আর্থ–সামাজিক ব্যবস্থা ধীরে ধীরে তার হাত থেকে ঐ টাকা বার করে নেবে। সাধারণভাবে বলা যায়, যে কৃষক যত দরিদ্র ও যত কম শিক্ষিত তার টাকা তত দ্রুত বেরিয়ে যাবে। শালবনীতে জিন্দালদের কাছে জমি বেচে পাওয়া টাকা অনেক কৃষক ধরে রাখতে পারে নি। তাই কৃষকের আর্থিক নিরাপত্তা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রাখতে এক বিকল্প পরিকল্পনা প্রয়োজন।

তিন

কৃষকের প্রয়োজনকে মাথায় রেখে অধিগ্রহণের পরিকল্পনা করতে চাইলে পরিকল্পনাকারীর উচিত তার জীবনের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে তার ক্ষতির হিসাব কষা এবং যথাযথ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা। ক্ষতির পরিমাণকে এককালীন টাকার অঙ্কে হিসাব করার ভ্রান্ত অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। জমি যেহেতু কৃষককে নিয়মিত আয় ও আপৎকালীন আয় এই দুই –সুবিধাই দেয়, তাই জমির বিনিময়ে এই দুই আয়ই তার প্রাপ্য। উদাহরণ হিসাবে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে আরামবাগ ব্লকের তিন ফসলি জমি থেকে কৃষকের নীট আয় একর পিছু বছরে পঁচিশ হাজার টাকা। জমি দিলে এই টাকাটা বাৎসরিক পেনশন হিসাবে তার প্রাপ্য। মুদ্রাস্ফীতি হলে বা চাষ থেকে ঐ অঞ্চলে আয় বাড়লে কৃষকের বাৎসরিক পেনশনের পরিমান বাড়া উচিত। বলা বাহুল্য, এই সামান্য পেনশনই তাঁর একমাত্র প্রাপ্য নয়। জমির মালিকানা নিজের হাতে থাকলে তিনি তো ভবিষ্যতে নিজের প্রয়োজনের সময়ে জমি বিক্রি করে অর্থ সংস্থান করতে পারতেন। এবং সেদিন তিনি ভবিষ্যতের বর্ধিত দাম পেতেন। জমি অধিগ্রহণের কারণে তিনি এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন সেটা নিশ্চয়ই কাম্য নয়। তাই এক নায্য অধিগ্রহণ আইন অবশ্যই এক বিকল্প সুবিধার বন্দোবস্ত করবে যাতে কৃষক বঞ্চিত না হন। কিন্তু জমি অধিগ্রহণের পর কিভাবে সেটা সম্ভব ? ধরা যাক, এক একর জমির বিনিময়ে সরকার কৃষককে এককালীন টাকার পরিবর্তে এক'শ বিশেষ ল্যান্ড বন্ড দিল (Land Bond)। ঐ বন্ড যে কোন সময়ে কেবলমাত্র সরকারের কাছেই বিক্রয়যোগ্য এবং বন্ডের দাম ঐ অঞ্চলে জমির দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। অর্থাৎ জমির দাম বাড়লে বন্ডের দামও বাড়বে। আসলে এই বন্ড হল কৃষককে দেওয়া এক সরকারী অঙ্গিকারপত্র, যার মাধ্যমে কৃষক নিজের প্রয়োজনমত জমির ভবিষ্যৎ দাম পেতে পারে। অধিগ্রহণের পরে চাষী যেহেতু চাষ থেকে যে আয় হত তা পেনশন হিসাবে পাচ্ছে, সেহেতু দায়ে না পড়লে ল্যান্ডবন্ড বিক্রি করার কথা কৃষক ভাববে না। মনে রাখতে হবে, প্রয়োজনে এক বা একাধিক বন্ড সরকারকে বেচে টাকা নিয়ে নেওয়া যায়। জমির মালিকানা গেলে যেমন ঐ জমি থেকে ফসল পাওয়া যায় না, তেমনি বন্ড বেচে দিয়ে জমির দাম নিয়ে নিলে আর পেনশন পাওয়া যাবে না। ধরা যাক, এক একর জমির বিনিময়ে এক কৃষক এক'শটি বন্ড পেয়েছে। প্রতিটি বন্ডের জন্য তার বাৎসরিক পেনশন ২৫০ টাকা (কারণ একর পিছু আয় ছিল পঁচিশ হাজার টাকা)। এবার কুড়িটি বন্ড বেচে দিয়ে জমির দাম নিয়ে নিলে প্রাপ্য

বাৎসরিক পেনশন দাঁড়াবে কুড়ি হাজার টাকা। শিল্পায়ন সফল হলে জমির দাম তথা বন্ডের দাম বহুগুণ বাড়বে এই আশাতেও সে বন্ড ধরে রাখবে না, তাই কৃষক শিল্পপতিকে দূরে সরাতে চাইবে না, কাছে টানতে চাইবে। কারণ, শিল্প হলে কৃষকের লাভ বেশী।

অধিগ্রহণের এই ল্যান্ডবন্ড ভিত্তিক মডেল কৃষকের সঙ্গে শিল্প সংস্থার মেলবন্ধন ঘটায়, উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষের বাতাবরণ সৃষ্টি করে না; এবং শিল্পায়নের ফলে শিল্প সংস্থা ও সমাজের যে আর্থিক লাভ তার লভ্যাংশ থেকে জমিদাতাকে বঞ্চিত ও করে না। পক্ষান্তরে, এককালীন টাকা দিয়ে জমি নেওয়ার মধ্যে রয়েছে এক বৈষম্যের বীজ। ধরা যাক, বাজারদরের চারগুণ টাকার বিনিময়ে কোন জমি নিয়ে নেওয়া হল। ভবিষ্যতে ঐ অঞ্চলে শিল্পায়ন হলে স্থানীয় জমির দাম চারগুণ ছাড়িয়ে দশগুণ বাড়াও বিচিত্র নয়। সেক্ষেত্রে শিল্পায়নের জন্য জমি যে দিয়েছে তার তুলনায় বেশী লাভবান হবে ঐ অঞ্চলের সেই কৃষকরা যাদের জমি দিতে হয় নি। শিল্পায়নের পরে শেষোক্ত কৃষকরা তাদের জমি বিক্রি করলে চারগুণের পরিবর্তে দশগুণ দাম পাবে না। সুতরাং চারগুণ দাম পেয়েও জমিদাতা পরোক্ষে বঞ্চিত হচ্ছে। পক্ষান্তরে ল্যান্ডবন্ড ভিত্তিক অধিগ্রহণ ব্যবস্থায় এই বৈষম্য তৈরীর সুযোগ থাকে না। যেহেতু বন্ডের দাম জমির বাজারদরের উপর নির্ভরশীল সেহেতু জমির দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ডের দামও বেড়ে গিয়ে জমিদাতার ন্যায্য লাভের ব্যবস্থা করে। ল্যান্ডবন্ড ব্যবস্থা চাষীকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা দিতে পারে। প্রয়োজনে চাষী এক বা একাধিক বন্ড সরকারী ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখে ন্যায্য সুদে ঋণ পেতে পারে। যেমন এক সময় কিষাণ বিকাশপত্রের বিনিময়ে ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। গ্রামাঞ্চলে অল্প সুদে ঋণে পাওয়া অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যার। বন্ড ও পেনশনের এক ন্যায্য অংশ বর্গাদারেরও প্রাপ্য।

চার

বলা বাহুল্য, সরকারের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছাড়া ল্যান্ডবন্ড ব্যবস্থার প্রয়োগ সম্ভব নয়। জমির বিনিময়ে বাৎসরিক আয় ও ল্যান্ডবন্ড পাওয়ার জন্য কৃষক কেবলমাত্র সরকারের সঙ্গেই চুক্তিবদ্ধ হতে চাইবে। ঐ চুক্তির ফলে জমির মালিকানা সরকারের হাতে যাবে। এরপর সরকার সবদিক বিবেচনা করে ঐ জমি শিল্প সংস্থাকে হয় বিক্রি করবে, নয় লিজ দেবে। কৃষকের জমি নিয়ে তা শিল্পসংস্থাকে হস্তান্তরিত করার মাধ্যম হিসাবে কি সরকারকে খুব বেশী আর্থিক ঝুঁকি, কিংবা দায়ভার নিতে হয় ? এ প্রশ্নের উত্তর হল – না, সরকারের উপর বিরাট দায় চাপে না। ধরা যাক, কোনও এক অঞ্চলে জমির দাম একর পিছু দশ লাখ টাকা এবং সেখানে জমি থেকে চাষীর নীট বাৎসরিক আয় একর পিছু পঁচিশ হাজার টাকা। ঐ এলাকায় কোনো এক শিল্পসংস্থার শিল্প স্থাপনে পঁচিশ একর জমির প্রয়োজন। ঐ পরিমাণ জমির জন্য কৃষকের বাৎসরিক ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদেয় (২৫০০০ × ৫০০) ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। ল্যান্ডবন্ডের দাম মেটানোর জন্য সরকারকে এই মুহূর্তে বিশেষ টাকা খরচ করতে হচ্ছে না। কারণ, বন্ডের দাম বাড়ার সম্ভাবনা থাকায় কৃষক চেষ্টা করবে বন্ড ধরে রাখতে। প্রাথমিক গবেষণা থেকে এই লেখকের মনে হয়েছে, মোট বন্ডের দুই থেকে পাঁচ

শতাংশের দাম প্রতিবছর সরকারকে মেটাতে হবে। সেগুলি কৃষক সরকারকে বিক্রি করবে তার আপৎকালীন বড় খরচ মেটানোর জন্য। সুতরাং বন্ডের দাম বাবদ সরকারকে দিতে হবে বাৎসরিক (যতদিন জমির বর্তমান বাজারমূল্য বজায় থাকছে) এক কোটি থেকে আড়াই কোটি টাকা। তাহলে আপাততঃ পাঁচ শ' একর জমির জন্য কৃষকের বাৎসরিক আয় আর বন্ডের দাম বাবদ মোট প্রদেয় টাকার পরিমান দাঁড়াল সর্বাধিক তিন কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা। ঐ জমি নেবার জন্য কোনও শিল্প সংস্থা বাজারদরের চারগুণ টাকা দিলে সরকারের হাতে আসে দুশো কোটি টাকা। এই বিপুল পরিমান টাকা দিয়ে কৃষকদের জন্য আর একটু বর্ধিত বাৎসরিক পেনশন, বন্ড প্রদান ও কিছু টাকা এককালীন নগদ হিসাবে দেওয়া যায়। কোনও কৃষক পুরো টাকাটা একবারে নিতে চাইলে তিনি তা অবশ্যই পারেন। কিন্তু ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের অনেকেই পেনশন, বন্ড ও উপরি পাওনা নগদের দিকে ঝুঁকবেন। পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্য যেখানে জমির দাম এমনিতেই খুব বেশী, সেখানে চারগুণ দাম দিয়ে শিল্প সংস্থার জমি নেওয়ার সম্ভাবনা কম। সেক্ষেত্রে রাজ্যে শিল্প স্থাপনের স্বার্থে চারগুণের পরিবর্তে দেড় বা দুগুণ দামেও শিল্প সংস্থাকে জমি দেওয়া সম্ভব। আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কেন ল্যান্ডবন্ড ব্যবস্থায় সরকারের প্রাথমিক খরচ কম। প্রথমত, শিল্পসংস্থা থেকে পাওয়া টাকার একটা বড় অংশ সরকারী কোষাগারের থেকে যায়। দ্বিতীয়ত, শিল্পায়ণ সফল হলে সরকারের হাতে অতিরিক্ত রাজস্ব আসে। সুতরাং ল্যান্ডবন্ড ব্যবস্থা শুধু কৃষকের ভবিষ্যৎই সুরক্ষিত করে না, সরকারকেও আর্থিক সুবিধা দেয়; তাছাড়া কৃষককেও শিল্পের শুভাকাঙ্খী করে তোলে। ল্যান্ডবন্ড ব্যবস্থা যথাযথভাবে প্রযুক্ত হলে জমি অধিগ্রহণের এই মডেলই পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের জোয়ার আনতে সক্ষম।

তথ্যসূত্র :

1. *Land Value, 2013* (Summary) United Sates Department of Agriculture (Natural Agricultural Statistics Seminar), August, 2013.
2. Olivia Goldhill, 2014. "Farmland: Worth its weight is gold"? *The Telegraph,* London, 17 January, 2014.
3. Sanjoy Chakraborty, 2013. *The Price of Land : Acquisition, Conflict, Consequences,* Oxford University Press, New Delhi.
4. Buddhadev Ghosh, 2012. "What Made the 'Unwilling Formers' Unwilling?" A Note on Singur', *Economic and Political Weekly*, 11 August, Vol. XL VV II No. 31.
5. Goverment of India, 2013. "The Right to Fair Compensation and Transpenercy in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettllement Act 2013, *The Gazzete of India,* 27 September, Part II, Section I, No. 40.

সুজয়া সরকার

আধুনিক ভারতে নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রযুক্তির ব্যবহার

আধুনিক ভারত একদিকে যেমন নারী উন্নয়ন বিষয়ে ভাবিত; অন্যদিকে, প্রযুক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগেও বিভিন্ন আঙ্গিক তুলে ধরতে সচেষ্ট। নতুন ও উন্নততর ভারত গঠনের লক্ষ্যে তাই এক অন্যতম উদ্যোগ হল নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্নে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা। আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ নারীদের মানসিকতা ও প্রযুক্তি ব্যবহার দুই ভিন্ন মেরুর ভাবনা। কিন্তু অবস্থা ও পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই দুইয়ের মধ্যে মেলবন্ধন আজকের দিনের এক স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে।

এক

একথা আমাদের সকলের জানা যে তৃতীয় বিশ্বের দেশ ভারতে মহিলাদের জীবন সংগ্রামে ভরা। এখনও মহিলারা বাস্তব অবস্থার নিরিখে জীবন যাপনের সাধারণ সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণী। অথচ, পরিসংখ্যানগত তথ্য অনুযায়ী ভারতীয় অর্থনীতির এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মহিলাদের বিভিন্ন ধরণের কাজে অংশগ্রহণ। জাতীয় স্তরে শ্রমজীবীদের যে সংখ্যা তার এক-তৃতীয়াংশ মহিলা। পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের অবস্থান সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, স্বাস্থ্য বা পুষ্টি– সবদিক থেকেই অনেক নিচে। আবার এটাও সত্য যে বিশ শতকের শেষ পর্বের যে চিত্র, তার থেকে দেখা যায় যে প্রায় ৯০ শতাংশ গ্রামীণ মহিলার মধ্যে কাজে দক্ষতার অনুপস্থিতি। তাই তাঁরা বাধ্য

হন পুরুষদের তুলনায় কম পারিশ্রমিকের কাজ করতে– তা সে কৃষি বা শিল্পনির্ভর – যে ধরণের কাজই হোক না কেন। আবার জমির বা সম্পত্তির ওপরেও মহিলাদের সেরকম কোন নিয়ন্ত্রণ সচরাচর থাকে না।[১] তাই এই মহিলাদের সামনে বহু ধরণের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, যেমন – তাদের পুঁজি প্রায় শূন্য, বাজারের সাথে যুক্ত না থাকতে পারা এবং সর্বোপরি দক্ষতার অভাব। অর্থাৎ গ্রামীণ মহিলাদের সাধারণ যে জীবিকার আঙ্গিক, তার মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক তথা সামাগ্রিক উন্নয়নের পথ ও লক্ষ্য অনেক বেশি সমস্যাসঙ্কুল। তাই বলা যায় গ্রামীণ মহিলাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভারতের সামগ্রিক অর্থনীতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক অতি পরিচিত জ্বলন্ত সমস্যা। এই ধরণের চ্যালেঞ্জকে মাথায় রেখে এই কারণে আধুনিক বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হচ্ছে মূলতঃ গ্রামীণ মহিলাদের উন্নয়নের জন্য।

আধুনিক রাষ্ট্রনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য অনুযায়ী গ্রামীণ ভারত এখন এক দ্রুতগামী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে।[২] এখানে গ্রামীণ পরিবর্তনের অনুঘটকগুলি কাজ করে অনেক রূপে, অনেক ভাবে। এরই একটি অন্যতম বিষয় হল নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের তথা জীবিকা অর্জনের প্রশ্নে প্রযুক্তির ব্যবহার। একথা সত্য যে স্বাধীনতার পরবর্তীকাল থেকেই মহিলাদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বলা যায় ১৯৮০-র দশকের মধ্যভাগে সপ্তম পরিকল্পনার অংশ হিসেবে মহিলাদের সমান অধিকার অর্জন ও উন্নয়নকে যুগপৎ লক্ষ্য হিসেবে স্থির করা। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে মহিলাদের অবস্থানকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার চেষ্টা করা হল তাদের উন্নয়ন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে। নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে প্রযুক্তির প্রয়োগকে সংযুক্ত করার উদ্দেশ্যে নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। এরই এক দিক হল প্রযুক্তির ব্যবস্থাকে নারীর সহযোগী, এবং তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল, আয়াসসাধ্য করে তোলা।

দুই

বিজ্ঞানের উন্নতির প্রশ্নে স্বাধীন ভারতে বহু ধরনের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। বিজ্ঞানচর্চাকে সুষ্ঠু, নিয়মিত ও প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৭১ এর মে মাসে। এই বিভাগের উদ্দেশ্য হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের জন্য নতুন নতুন ক্ষেত্র নির্বাচন করা ও প্রয়োগ করা। স্বাধীন ভারতের একটি বিশেষ ভাবনা হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি– এই দু'টি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে সমানাধিকার, সামাজিক সাম্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব করে তোলা– এর মাধ্যমে ভারত যাতে বিশ্ব ব্যবস্থার মূলধারার সাথে সমমানের হয়ে উঠতে পারে।[৩] বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের লক্ষ্য বর্তমানে অনেক বেশি প্রসারিত। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ও গবেষণা অবশ্যই এর মৌলিক লক্ষ্য। পাশাপাশি এর আরেকটি কাজ হল দেশের সাধারণ মানুষ, যারা বেশিরভাগ সময় নজরের বাইরে থাকে, এবং যাদের

অধিকাংশই আপাতদৃষ্টিতে অনেক কম বিজ্ঞানমনস্ক, ফলতঃ অনেক কম বিজ্ঞান মুখী, – তাদের চোখে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারকে গ্রহণযোগ্য করা এবং তাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে এগুলিকে যুক্ত করে দেওয়ার চেষ্টা করা। এমনকি এই কাজের প্রয়োজনে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে দেশের প্রচলিত প্রযুক্তিকে আরও উন্নত করে তোলাও এর আরেকটি লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করা হয়েছে, তার মধ্যে একটি হল মহিলাদের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। এক্ষেত্রেও দু'টি বিষয়ের দিকে প্রধান লক্ষ্য রাখা হয়েছে। প্রথমত উচ্চ গবেষণার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা; দ্বিতীয়ত, দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মহিলাদের প্রযুক্তির শিক্ষা দিয়ে অর্থনৈতিক স্বনির্ভর বা স্বাবলম্বী হয়ে ওঠায় অনুপ্রেরণা দেওয়া।

আধুনিক ভারত তাই প্রত্যক্ষ করছে প্রযুক্তির ব্যবহারের বিভিন্ন আঙ্গিক। এর মধ্যে একটি হল মহিলা প্রযুক্তি উদ্যান (Women Technology Park)। বিশেষজ্ঞদের ধারণা অনুযায়ী এই বিশেষ উদ্যোগটি মহিলাদের কাছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগিক সুবিধা পৌঁছে দিয়ে তাদের ক্ষমতায়নকে আরও সুনিশ্চিত করে তুলবে। এটি নিঃসন্দেহে প্রথাগত পদ্ধতির চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র।[৪] গ্রামীণ ভারতের দরিদ্র মহিলারা কৃষিসহ অন্যান্য জমিকেন্দ্রিক কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজনীয় ন্যূনতম বন্দোবস্ত করতেও তাঁদের প্রচুর শারীরিক ও কায়িক পরিশ্রম করতে হয়। আধুনিক উন্নত প্রযুক্তি সম্পর্কে তাদের জ্ঞানও কম এবং তার ব্যবহার করাও তাদের পক্ষে একেবারেই সহজসাধ্য নয়। এই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এমন কোনো নতুন উদ্যোগের ভাবনার প্রয়োজন যার মাধ্যমে গ্রামীণ অঞ্চলে বসবাসকারী এই সমস্ত হতদরিদ্র পরিবারের মহিলাদের জীবিকা নির্বাহ সম্ভব হবে, তাদের তৈরি জিনিসের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং তার মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সম্ভব করে তোলা যাবে। এই ভাবনার বাস্তবায়নের অন্যতম একটি প্রয়াস হল মহিলা প্রযুক্তি উদ্যান।

তিন

মহিলা প্রযুক্তি উদ্যান বলতে এমন একটি কর্মকেন্দ্রকে বোঝায় যা আসলে কোন একটি অঞ্চলের মহিলাদের জন্য বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা। প্রধানত এলাকায় প্রাপ্ত কাঁচামালের সংস্থানের উপর নির্ভরশীল এই উদ্যানগুলি তার প্রক্রিয়াকরণের ফলে তৈরি হওয়া সমস্ত শিল্প এবং কর্মভিত্তিক উৎপাদিত বস্তুগুলিকে সহজেই বাজারজাত করার চেষ্টা করে। এই কাঁচামাল অবশ্যই স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদ, তথা বন, চাষযোগ্য অনুর্বর জমি, জলসম্পদ ও জলাভূমি, খনিজদ্রব্য, এমনকি পশুজাত দ্রব্য ভিত্তিক হয়। তবে প্রয়োজনে কিছু কিছু কাঁচামাল ও আনুষঙ্গিক সহায়ক অন্য রাজ্য বা বিদেশ থেকেও আমদানি হতে পারে। এই উদ্যানের আরেকটি বিশেষ ধারা হলো যে সকল মহিলা ভাগীদারেরই প্রয়োজনীয় দক্ষতার অধিকারী হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই দক্ষতা বংশানুক্রমিক না হলেও, তাদের

মধ্যে অবশ্যই প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করার সম্ভাবনা ও কর্মদক্ষতা থাকা জরুরী।[৫] এই উদ্যানের গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে যে সাধারণ সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয় তা হল– খোলামেলা জায়গায় অন্তত তিন চার একর জায়গা এর জন্য নির্বাচিত করা, রেল, সড়ক বা নদীপথে উদ্যানটির সাথে দেশের বিভিন্ন জায়গার যোগাযোগের দিকে নজর রাখা, পর্যাপ্ত পরিমাণ জল ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা যাতে থাকে– সেদিকে খেয়াল রাখা, উদ্যানটির জন্য নির্বাচিত জায়গার মধ্যে প্রস্তাবিত কর্মসূচী অনুযায়ী উপযুক্ত সংখ্যক ঘর, প্রশিক্ষণশালা, খামার, ছোটবাগান, কর্মশালা, পরীক্ষাগার, প্রক্রিয়াকরণকেন্দ্র, সংগ্রহশালা ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা। অর্থাৎ এর উদ্দেশ্য অবশ্যই স্থানীয় মহিলাদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, কর্মক্ষমতাবৃদ্ধি এবং কর্মোদ্যোগ সৃষ্টিতে সব রকমের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংগঠনিক সহায়তা ও প্রেরণা জোগানো। এক কথায় এই উদ্যান বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহারে, কর্মক্ষমতার বিকাশে এবং স্বনির্ভরতার যাত্রাপথে মহিলাদের জন্য একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।[৬] মূলতঃ পার্বত্য অঞ্চল, জলবায়ুগতভাবে শুষ্ক অঞ্চল এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিকে বেছে নেওয়া হয়েছে এই ধরণের প্রযুক্তি উদ্যান গড়ে তোলার জন্য।[৭] পশ্চিমে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, গোয়া, তামিলনাড়ু, কেরালা ও গুজরাটের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিকে নিয়ে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছে। অন্যদিকে হিমাচলপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির পার্বত্য অঞ্চলগুলিকে নিয়ে মহিলা প্রযুক্তি উদ্যানের ভাবনাও বাস্তবায়িত হয়েছে। এই উদ্যোগগুলির প্রধান লক্ষ্য হল নতুন নতুন প্রযুক্তি বিষয়ে মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা; তাদের প্রাত্যহিক জীবনে এগুলির সময়োচিত ব্যবহার, পাশাপাশি জমি, জল ও কৃষিসম্পদ– এই সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে তাদের সচেতন করা।[৮] আবার প্রযুক্তির ব্যবহারের বিষয়ে যেদিকগুলিতে বিশেষ নজর দেওয়া হয়, সেগুলি হল – প্রযুক্তির উপাদানগুলি যাতে সহজলভ্য হয় এবং স্থানীয় সম্পদের ব্যবহারের উপযোগী হয়। প্রযুক্তির ব্যবহারকে স্থানীয় দক্ষতার মাপকাঠিতে স্থির করাও গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তির ব্যবহার মূল্যের দিক থেকে স্বল্প মানের ও সামর্থ নির্ভর, লগ্নির দিক থেকে স্বল্প মূল্যের, বিক্রীত মূল্যের সত্ত্বর প্রাপ্তি, উৎপাদিত দ্রব্যের বিপণনের সংস্থান এসব কিছুই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রযুক্তির প্রয়োগ যাতে মহিলাদের একঘেঁয়ে খাটুনিকে কমায় সেদিকেও নজর রাখা খুব বেশি প্রয়োজন।

২০০১-০২ সাল থেকে মহিলা প্রযুক্তি উদ্যানের রূপরেখা প্রস্তুত হয়েছিল। এই ধরনের উদ্যোগে প্রথমপর্বে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া জনজাতির মহিলাদের দিকে। মহিলা প্রযুক্তি উদ্যানের প্রথম সফল উদ্যোগ হিসেবে উত্তরাঞ্চলের দেরাদুন ও কর্ণাটকের মনিপালকে ধরা হয়। রাজস্থানের বারমার, যেটি ভৌগোলিক দিক থেকে শুষ্ক অঞ্চল হিসেবে পরিচিত, সেখানেও এধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।[৯] ২০০৪-০৫ সালে আসাম, মহারাষ্ট্র, মেঘালয় ও তামিলনাড়ুতে এবং ২০০৫-০৬ সালে পন্ডিচেরি, কেরালা, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে মহিলা প্রযুক্তি উদ্যান প্রকল্প গঠন

করা হয়েছে। ২০০৬–০৭ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট ১৮টি মহিলা প্রযুক্তি উদ্যান স্থাপন করা হয়েছে। পরবর্তীকালে এর প্রসার আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০–১১ সালে এই ধরণের ২০টি উদ্যানের কথা জানা যায়।

চার

মহিলা প্রযুক্তি উদ্যানগুলির কার্যক্রম কি ধরণের হয়, তার কিছু নিদর্শন তুলে ধরা যেতে পারে। এই উদ্যানগুলির ক্ষেত্রে প্রথমদিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল শস্য উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত প্রযুক্তি, জমিকেন্দ্রিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার, ভেষজ উদ্ভিদের চাষ, মাটির জিনিস তৈরি ও প্রাকৃতিক রঙ তৈরির ওপর। মাশরুম চাষ, ফুলের চাষ, পশুপালন, মাছ চাষ বা তন্তুর ব্যবহার – এ সমস্তই উন্নত আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে করার জন্য এই প্রকল্পগুলিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। হ্যান্ডমেড্ কাগজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহারও মহিলাদের শেখানো হয়।

উত্তর-পূর্ব ভারতের দরিদ্র ও অশিক্ষিত মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় শস্য ও ফল উৎপাদনের সাথে যুক্ত পদ্ধতির উন্নতিকরণের বিষয়ে। সাতটি রাজ্যে মহিলাদের বিশেষ গুণযুক্ত ভেষজ উদ্ভিদের চাষ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারীকরণের কাজে যুক্ত করা হয়েছে। এই প্রকল্পটির মাধ্যমে ক্রমশঃ জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, আসাম, উত্তরপ্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলসহ পার্বত্য রাজ্যগুলিতেও কিভাবে কম খরচে কৃষির জন্য উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার সম্ভব সে বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা হয়।[১০]

পশ্চিমবঙ্গে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নয়াগ্রামে গঠিত মহিলা প্রযুক্তি উদ্যানের দায়িত্ব নিয়েছে ইন্ডিয়ান ইনসিটিটিউট অফ টেকনোলজি, খড়্গপুর। মূল লক্ষ্য হল, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং তার মধ্য দিয়ে মহিলাদের অবস্থার সুরাহার চেষ্টা করা। এখানে যে পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রাকৃতিক তন্তু, যেমন–সাবাই, সিসল বা মাদুর ঘাস থেকে উন্নতমানের দ্রব্য প্রস্তুত করা, বাঁশ, বেত এবং কাঠের তৈরি হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার। মহিলাদের কাজের সাথে যুক্ত বিভিন্ন সমস্যা শোনার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এর ফলে মহিলাদের স্বাভাবিক অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগগুলিকে তাই আয়াসসাধ্যভাবে নিজেদের মতো করে ব্যবহারে তাঁদের উৎসাহিত করাও সম্ভব হচ্ছে। যে প্রযুক্তিগুলি এখানে অনুসরণ করা হয় সেগুলি হল তন্তুকে রঙ করা এবং গন্ধহীন করা, ঘাসের তৈরি জিনিস উৎপাদনের জন্য যন্ত্র তৈরি করা, তন্তু দিয়ে শক্ত দড়ি তৈরির যন্ত্র তৈরি করা। একইসাথে এইসব ব্যবহারের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধির দিকেও মহিলারা লক্ষ্য রাখছেন। শুধু তাই নয়, এই অঞ্চলের উপজাতি মহিলাসহ গরীব মহিলাদের একটি 'কমন ফেসিলিটি সেন্টার' (সাধারণ উপযোগী কেন্দ্র) হয়ে উঠেছে এই মহিলা প্রযুক্তি উদ্যান। এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রথমপর্বে ৫৪ জন মহিলা বিভিন্ন ধরনের কর্মদ্যোগে নিয়োজিত হয়েছেন

এবং পরবর্তীকালে অন্যান্যদের উৎসাহিত করেছেন।[১১]

দেরাদুনে মহিলা প্রযুক্তি উদ্যানের সাথে যুক্ত মহিলারা নিজেদের উদ্যোগে সমবায় তৈরি করেছেন এবং এর মাধ্যমে স্বনিযুক্তির জন্য 'WISE' নামে একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এই সংগঠনে উত্তরাখন্ডের আড়াই হাজারের বেশি মহিলা সদস্য রয়েছেন, যাঁরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন সুবিধে নিয়ে বিভিন্ন ধরণের অর্থনৈতিক কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন।[১২] কোয়েম্বাটুরের করমডাই অঞ্চলে অবিনাশীলিঙ্গম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি মহিলা প্রযুক্তি উদ্যান গড়ে উঠেছে যার মূল লক্ষ্য হল ঐ অঞ্চলের গ্রামীণ মহিলাদের প্রশিক্ষণ দান। এই প্রযুক্তি উদ্যানে যে বিষয়গুলির ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, ভেষজ উদ্ভিদ চাষের প্রযুক্তি, ছাগল চাষ, কাগজের ব্যাগ তৈরি করা, বাদাম গাছের পাতা দিয়ে থালা তৈরি ইত্যাদি। এখানে ২০০৮-০৯ সাল থেকে ৫৫৬ জন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা ১৪টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৪২ শতাংশ মহিলা তাদের নিজেদের গ্রামে বিভিন্ন ধরনের কাজে নিযুক্ত হয়েছেন।[১৩]

কেরালায় যে মহিলা প্রযুক্তি উদ্যানটি গড়ে উঠেছে, সেখানে মূল প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে কিছু নির্দিষ্ট দ্রব্য উৎপাদনের জন্য – ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণসম্পন্ন অথচ কম শর্করাযুক্ত পাস্তা তৈরি, দুগ্ধজাত বিভিন্ন দ্রব্য, মাছের খাবার প্রস্তুত ইত্যাদি। মাশরুম চাষের জন্য প্রযুক্তিও এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই উদ্যানটির সাম্প্রতিক প্রধান লক্ষ্যগুলির মধ্যে রয়েছে মহিলাদের উপযোগী সৌরচুল্লি এবং ধূমহীন চুল্লির ব্যবহারের প্রশিক্ষণ। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, খাদ্য সংরক্ষণ ও মোড়কে ভরা (প্যাকেজিং), ফুলের চাষ এবং জৈবসারকেন্দ্রিক বিভিন্ন উদ্যোগ– সবই মহিলাদের সামনে প্রশিক্ষণের আকারে তুলে ধরা। মহিলারা যাতে স্বনির্ভরভাবে নিজেদের উদ্যোগের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের সুযোগ পায়, তার দিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে এর জন্য খরচ হিসেবে দেড় কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে।[১৪]

দেশের মধ্যে মোট ১৩টি কেন্দ্রে মহিলাদের ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, কম্প্যুটার ও ইনফরমেশন টেকনোলজির বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং প্রদর্শনীর জন্য উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ২টি কেন্দ্র রয়েছে মহিলা প্রযুক্তি উদ্যানের মধ্যে। যে জায়গাগুলিতে এই ধরনের কেন্দ্র গড়ে উঠছে, তার মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, সিকিম, জম্মু ও কাশ্মীর এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি রয়েছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল এই কেন্দ্রগুলি পরিচালনা করার দায়িত্ব মহিলাদেরই ওপর অর্পণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।[১৫]

পাঁচ

মহিলা প্রযুক্তি উদ্যান গ্রামীণ হতদরিদ্র মহিলাদের সামনে যে ধরণের আঙ্গিক উপস্থিত করেছে, তা নিঃসন্দেহে তাদের মানসিকতায় এক নতুন চেতনা সৃষ্টি করেছে। তবে এই

ধরনের উদ্যানের সাথে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নন, এমন মহিলাদের মধ্যে প্রযুক্তির এই ব্যবহারকে আরও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে-যেগুলির মূল কথা হল প্রযুক্তির ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে মহিলাদের অর্থ উপার্জনক্ষম করে তোলা। এক্ষেত্রে সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি প্রায় সমান্তরালভাবে এগিয়ে এসেছে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, যার ফলে নিঃসন্দেহে কিছুটা হলেও উপকৃত হয়েছেন নানান স্তরের অসংখ্য মহিলা।

২০০৪–০৫ সালে সারা দেশে এই ধরণের ৪৭টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগ, যেমন– জৈব উপায়ে শস্যবিনষ্টকারী পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ ও বিনাশ, বৃষ্টির জল সংগ্রহ, সোয়াবিন প্রক্রিয়াকরণ, আঙ্গুরা খরগোশের প্রতিপালন, প্রাকৃতিক জৈব রঙের উৎপাদন, টেরাকোটা শিল্পে প্রযুক্তি ব্যবহার, পানীয় জলে ফ্লুরাইড আছে কিনা তা পরীক্ষা করা, শস্য উৎপাদনের পর যে সমস্ত কাজ থাকে, সেগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়, সেগুলি গ্রহণযোগ্য কিনা সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা, মাছের চাষের ক্ষেত্রে পেরিফাইটন শ্যাওলাকে খাবার হিসেবে ব্যবহার করা, স্বল্পমূল্যে জলের পরিশোধন ব্যবস্থা, এমনকি ইলেকট্রনিক জিনিস তৈরি করা।[১৬] আবার ২০০৬-০৭ সালে প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহারের জন্য ৪৪টি প্রযুক্তিনির্ভর নতুন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন – মৌমাছি চাষ, কাগজ পুনরায় ব্যবহারের কৌশল, সুগন্ধি তেল ও ভেষজ উদ্ভিদের চাষের জন্য উপযুক্ত নার্সারি তৈরি, গ্রামীণ দুগ্ধ প্রকল্প ইত্যাদি।[১৭] ভারতের প্রায় সমস্ত অঞ্চলে মহিলারা পশুপালনকে তাদের জীবিকার উপায় হিসেবে মনে করেন। পশুখাদ্য উৎপাদনের জন্য তাঁদেরকে অনেক সময় অপব্যয় করতে হয়। তাই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলগুলিতে কিভাবে উন্নতমানের পশুখাদ্য উৎপাদনের কৌশল গ্রহণ করা যায়। মহিলাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে দেশের ১২টি অঞ্চলে, যেগুলি কৃষিপ্রধান এলাকা হিসেবে পরিচিত, সেখানে এই ধরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে প্রযুক্তির উন্নয়ন কাজে যুক্ত এজেন্সিগুলি এবং বিজ্ঞানের ব্যবহারের সাথে যুক্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির সহায়তার মাধ্যমে। এতে একদিকে যেমন মহিলারা সক্রিয় অংশগ্রহণ করবেন, অন্যদিকে সারাবছর ধরে তাঁরা উন্নতমানের পশুখাদ্যের যোগান পাবেন। এর জন্য ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন ধরনের শস্যের চাষ, কিছুটা জমিকে সংরক্ষণ করে সেখানে শুধুমাত্র পশুখাদ্য উৎপাদন করা বা বৈজ্ঞানিকভাবে অন্যান্য পদ্ধতি অনুসরণ, প্রযুক্তির সাহায্য গ্রহণ, দক্ষ ব্যক্তিদের দ্বারা মাঠ পরিদর্শন, সবসময় সতর্ক নজরদারি— সবকিছুর ওপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।[১৮] আবার ক্ষেত্র বা অঞ্চলবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। উত্তরাঞ্চলের চামোলিতে গাড়োয়াল পার্বত্য অঞ্চলের মহিলাদের বিশেষ প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সহযোগী সংস্থা হিসেবে ভূমিকা গ্রহণ করেছে হিমালয়ান এন্‌ভান্‌মেন্টাল স্টাডিজ

অ্যান্ড্ করসারভেশন্ অর্গানাইজেশন (Himalayan Environmental Studies and Conservation Organization), যা HESCO হিসেবে বেশি পরিচিত। বর্ষাকালে বৃষ্টির কারণে যেহেতু কাঠ ভিজে যায়, তাই তার অভাব মেটানোর জন্য আগুন জ্বালানোর ক্ষেত্রে অন্য ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার করা এদের প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য। উন্নতমানের পশুখাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার শেখানোও এদের আরেকটি লক্ষ্য।[১৯] এই ধরনের উদ্যোগের ফলে পার্বত্য-মহিলাদের দৈনন্দিন জীবনের পরিশ্রম কিছুটা কমে এবং সময়ও বাঁচে। আবার পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষদের কাছে ডাল জাতীয় খাবারের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে— তাদের স্বাদ ও গুণের জন্য। তাই উত্তরাঞ্চলের উত্তরকাশী জেলার চারটি গ্রাম— বন, মাল্লা, তুখান ও মুখভা এবং দেরাদুন জেলার আম্বিওয়ালা গ্রামে উন্নতমানের বীজ ও উন্নত কৃষি পদ্ধতির সাহায্যে মহিলাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০০৬-০৭ সালে ঐ এলাকা সংলগ্ন ১৫টি গ্রাম থেকে মোট ১২০ জন মহিলাকে এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।[২০] ঝাঁসিতে ইন্ডিয়ান গ্রাসল্যান্ড্ অ্যান্ড্ ফডার রিসার্চ ইনসিটিউট (Indian Grassland and Fodder Research Institute)-এর সাহায্যে গবাদিপশুর খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে জোর দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন পশুখাদ্য উৎপাদনের প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে গুণ ও পরিমাণ দুইদিক দিয়েই পশুখাদ্যের উন্নতি হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে প্রশিক্ষিত মহিলাদের অর্থ উপার্জনও অনেক বেশি সম্ভব হচ্ছে।[২১]

কোয়েম্বাটুর জেলার পোলাচি অঞ্চলে মহিলাদের শস্য উৎপাদনে পরবর্তীকালের প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। নেগামাম গ্রামে নারকেলকে তাড়াতাড়ি শুকনো করার জন্য সৌরশক্তি নিয়ন্ত্রিত সরু নলের মতো যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। এই নলের মধ্যে নারকেল কেটে ভাগ ভাগ করে রাখতে হয় এবং এতে নারকেল তাড়াতাড়ি শুকনো হয়। এই প্রযুক্তি ব্যবহারের বেশ কিছু ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন এর মাধ্যমে ভালো মানের ছোবড়া পাওয়া যায়, খরচ তুলনামূলক অনেক কম হয় এবং পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তির ব্যবহার খুব সহজেই করা সম্ভব হয়।[২২] কর্ণাটকে এরি রেশমগুটি পালন ও কালোমাটিতে ক্যাসরের উৎপাদন এবং তার সাথে মহিলাদের এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে রেশমগুটি চাষকে উৎসাহবর্ধক ও জনপ্রিয় করে তোলা— এ সমস্ত প্রচেষ্টা গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের পথ প্রশস্ত করে তুলছে। এরি রেশমকীট উৎপাদনের জন্য ক্যাসরের ব্যবহার ক্রমশ মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠছে এবং মহিলাদের জন্য উপযুক্ত কাজ হিসেবে এই নতুন প্রযুক্তি এই অঞ্চলে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে।[২৩]

শুষ্ক জলবায়ুযুক্ত অঞ্চলে বৃষ্টির জল ধরার জন্য পাত্র তৈরি মহিলাদের এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মালবেরি ফল ও পাতা চাষের ক্ষেত্রে নতুন কৌশল আবিষ্কার অপর এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। এর জন্য নতুন পদ্ধতি অনুসন্ধান, এটা খাওয়ার যোগ্য হতে পারে কিনা,

অর্থনৈতিক দিক থেকে সাশ্রয়কারী কিনা— এ সমস্ত বিষয়ে নিরন্তর পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে।[২৪] মহিলাদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা এই নতুন পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে নিজস্ব রোজগারের পথকে আরও সহজসাধ্য করে তুলতে পারে।

সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে কর্মসংস্থানের জন্য বেশ বড়ো আকারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মূলতঃ সমুদ্রের জৈবপদার্থ ব্যবহার করে এই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। সামুদ্রিক শ্যাওলার চাষ ও তার ব্যবহার এবং এর সাথে সমুদ্রতীরে বসবাসকারী মহিলাদের পরিচিতির ফলে ভারতের ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে এর চাষ আরম্ভ হয়েছে। সাগরদ্বীপ, যেটি সুন্দরবনের কাছে অবস্থিত, সেখানে ২০০৭-০৮ সাল থেকে মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া আরম্ভ হয়েছিল মাটি পরীক্ষা বা জলপরীক্ষা করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। তার সাথে সাথে কলাগাছের তন্তু নিঃসরণ, মাটির উর্বরতা নিয়ন্ত্রণ করা, ভেষজ উদ্ভিদের চাষ, জলজ প্রাণীর চাষ— এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঐ অঞ্চলের মহিলারা উপকৃত হয়েছেন যথেষ্টভাবে এবং নিজেদের উদ্যোগে নিজস্ব কাজ শুরু করেছেন।[২৫]

উত্তরাখন্ডের ৫টি জেলার ১৩টি ব্লকে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে আঙ্গুরা উল প্রস্তুতের কাজ শুরু হয়েছে তপশিলী উপজাতি ভুক্ত মহিলাদের নতুন প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। মহারাষ্ট্রে কলাগাছকে ব্যবহার করে নতুন ধরনের কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে ওয়ার্ধা ও যোটমাল জেলায় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে তিন ধরনের কাজ মহিলাদের শেখানো হচ্ছে— কলাগাছের কান্ড থেকে তন্তু বের করা, এই ব্যবহার করে উচ্চমানের কাগজ তৈরি করা এবং কাগজ যথাযথভাবে সংরক্ষণের মাধ্যমে তা দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করা। এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে ইতিমধ্যেই ৫০ জনের বেশি মহিলা নিজস্ব উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।[২৬] পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুর ব্লকের মহিলারা হাঁস-মুরগির ডিম ফোটানোর কাজে সাহায্য নিচ্ছেন ইনকিউবেটরের–যা কেরোসিন তেল ব্যবহার করে করতে হয়। বাজারে যার দাম বেশ কয়েক লক্ষ টাকা, সেখানে এই গ্রামীণ সংস্ত্রণের তৈরির খরচ আনুমানিক ৬৫০০ টাকা।[২৭] পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় গ্রামের দরিদ্র মহিলারা এখন মুড়ি তৈরি করছেন অটোমেটিক মেশিনে।

তাই বলা যায়, সমগ্র দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সমীক্ষায় মহিলাদের প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ ও তার সফল ব্যবহারের অনেক তথ্য সামনে এসেছে। আরও কিছু বিশেষ নিদর্শন উল্লেখ করা যেতে পারে। কঙ বারণাদেত্তে নামে এক প্রশিক্ষিত মহিলা মেঘালয়ের উম্‌রান অঞ্চলে একটি বিরাট আকারের জৈব সার উৎপাদনের কেন্দ্র খুলেছেন, যার উৎপাদন ক্ষমতা বছরে প্রায় ১৫০০ কেজি।[২৮] অমিতা মাহাত, যিনি পশ্চিমবঙ্গের নয়াগ্রামে একজন কেঁচো সার প্রশিক্ষণার্থী, জানিয়েছেন যে খুবই সহজ উপায়ে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে যে উন্নতমানের কেঁচো সার তৈরি করা যায়, তা মহিলা প্রযুক্তি উদ্যান তাঁকে শিখিয়েছে। নতুন এই পদ্ধতি শিখে এই কাজে তাঁর আগ্রহ আরও বেড়ে গিয়েছে।[২৯]

ছয়

স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে মহিলাদের উন্নতির ক্ষেত্রে সাফল্য এসেছে ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে বিগত দুই দশক ধরে। প্রযুক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগের বিভিন্ন সফল মডেল তুলে ধরে মহিলাদের উৎসাহিত করা হচ্ছে, তাদের মনে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে; তাদের ক্লান্তিকর একঘেঁয়ে পরিশ্রম কমানো হচ্ছে এবং এসবের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় উন্নতির সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

স্বাধীন দেশের নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মহিলা প্রযুক্তি উদ্যান প্রকল্প গৃহীত হয়েছিল। এর প্রসারিত মূল লক্ষ্য ছিল উপযুক্ত প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সুযোগ-উপযোগী ভাবে সেগুলির গ্রহণ, পরীক্ষিত প্রযুক্তির হস্তান্তর এবং প্রযুক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রদর্শন— সবই একমাত্র মহিলাদের উন্নতির জন্য। বিগত প্রায় ১৫-১৬ বছরের ক্রমাগত প্রচেষ্টায় এই প্রকল্পটি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে এর অভিনবত্ব ও ক্রমিক আবিষ্ক্রমনস্ত্রার জন্য, মহিলাদের শোচনীয় আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রতি সংবেদনশীলতার কারণে এবং সমাজের একেবারে নিচের স্তরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির দৃঢ় সংযোগের সাফল্যে। নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগুলি যখনই সফল প্রমাণিত হচ্ছে, তখন সেগুলিকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহারের জন্য তুলে ধরা হচ্ছে।

মহিলা প্রযুক্তি উদ্যান প্রকল্প তাই এক অর্থে অনুঘটকের কাজ করেছে। এই প্রকল্প একই সাথে গুরুত্ব দিয়েছে প্রযুক্তির উন্নতি ও যথাযথ বাস্তবায়নের ওপর এবং সমান্তরালভাবে সফল প্রযুক্তির প্রদর্শনের ওপর। এই সফলতা দেশের বিশাল অংশের মহিলাদের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রয়োগকে প্রসারিত করার ক্ষেত্রে। গ্রামীণ মহিলাদের প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের এই উদ্যোগ সত্যিকার অর্থেই প্রচলিত গতানুগতিক জীবনধারায় এক অন্য আঙ্গিক তুলে ধরার চেষ্টা। এখানে মানবসভ্যতার নতুন আবিষ্ক্রগুলির সাথে যুক্ত করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বহুদিন ধরে অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া নারীদের উন্নয়নের সমন্বয় ঘটানো। নিঃসন্দেহে এই ধরনের প্রগতিসূচক প্রকল্প মহিলাদের জীবনচর্যার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে, তাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে।

তাই বলা যায়, মহিলাদের জীবিকানির্বাহ ও জীবিকা উন্নয়ন এই দুটি ভাবনাকে সাথে রেখে সমস্ত দেশে মহিলারা আজ তাঁদের মধ্যে বহু যুগ ধরে সুপ্ত কারিগরি বিদ্যা ও প্রতিভাকে বহিঃপ্রকাশের এক উপায় খুঁজে পেয়েছেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই সফল প্রয়োগ অনেকক্ষেত্রে এই সব মহিলাদের সাহস যুগিয়েছে সংসারের আর্থিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে, এমনকি সফল অভিভাবিকা হিসেবে নিজেদের পরিচিতি অর্জনের ক্ষেত্রেও।

তথ্যসূত্র :

১. *India Rural Development Project to Empower Women,* 1997. NISTADS/CSIR, Press Release No. 97/1292 SAS, New Delhi, 27 March, 1997.

২. *India Rural Development Report*. 2012/13, 2013. New Delhi : Orient Black Swan, p.3.

৩. *Fifty years of Science in India,* 1963. Department of Science and Technology, India Science Congress Association, p. 279.

৪. *Anual Report* 2000-2001, 2005. Department of Science and Technology, Ministary of Science and Technology, New Delhi.

৫. রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বৈশাখ ১৪১৫, "আদিবাসী অধ্যুষিত নয়াগ্রামে মহিলা প্রযুক্তির উদ্যান – কিছু ভাবনা ও ভবিষ্যৎ", *কিঙ্কিনীর বোল*, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃ. ৯.

৬. *প্রাগুক্ত*.

৭. *Annual Report* 2006-2007, 2005 Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, New Delhi.

৮. "Technology Parks for Women". Press Information Bureau, Government of India. pib.nic.in/feature/fe0399/f1003991.html, (সংগৃহীত ২৩.৯.১৪)

৯. *Anuual Report* 2000-2001, *Ibid.*

১০. *Ibid*.

১১. *Annual Report 2007-2008, Ibid.*

১২. *Annual Report 2006-2007, Ibid.*

১৩. 'Women technology park in Karamdadai', *The Hindu,* 12 Febrary, 2010. (সংগৃহীত ২৫.৯.১৪)

১৪. 'Women technology park in Kerala gets in-principle nod', *The Times of India,* 23 February, 2013, (সংগৃহীত ২৫.৯.১৪)

১৫. 'Technology Parks for Women'. *Ibid*.

১৬. *Anual Report/2004-2005, Ibid.*

১৭. *Anual Report/2006-2007, Ibid.*

১৮. *Anual Report/2003-2004, 2006-2007, Ibid.*

১৯. *Anual Report/2001-2002, Ibid.*

২০. *Anual Report/2006-2007, Ibid.*

২১. *Anual Report/2007-2008, Ibid.*

২২. *Ibid.*

২৩. *Ibid.*

২৪. *Ibid.*

২৫. *Ibid.*

২৬. *Anual Report/2011-2012, Ibid.* pp.158 &161.

২৭. "ডিম ফোটানোর নতুন যন্ত্রে সাফল্য", *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৮ আগষ্ট, ২০১৪, পৃ.৪

২৮. *Anual Report/2004-2005, Ibid.*

২৯. অমিতা মাহাত, ১৪১৫. "আলোর দিশা", *কিঙ্কিনীর বোল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮.

Sudha Pai (ed)

Handbook of Politics in Indian States

Regions, Parties and Economic Reforms

Oxford University Press, New Delhi, 2013

p.443, Price Rs. 1495/-

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক উপন্যাসে রাজ্যগুলির রাজনীতির উপাখ্যান যত না চমকপ্রদ, তার চাইতেও বেশী চমকপ্রদ এবং তাৎপর্যপূর্ণ হ'ল সেইসব উপাখ্যানের ব্যাখ্যান এবং ব্যাখ্যান-অবলম্বী অনুপুঙ্খ প্রেক্ষণ। সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষণগুলিকে সমাহৃত ক'রে যে যে ব্যাখ্যানের অবয়ব গড়ে ওঠে সেগুলি মস্তবড় একটি উপন্যাসের এক একটি অধ্যায়ের ভূমিকা পালন করে। এইভাবে গড়ে উঠে বর্তমান ভারতবর্ষের রাজনৈতিক উপন্যাসের বর্দ্ধমান অবয়ব। এইস্থানে পর্য্যলোচনাযোগ্য যে পুস্তকটি উপস্থাপন করা হবে সেটি একটা edited বা সম্পাদিত ভল্যুম বা খন্ড। যদি এই খন্ড (volume) টিকে ব্যাখ্যান বলি, তাহ'লে এই ব্যাখ্যান খন্ডটিতে চারটি অনুপুঙ্খ প্রেক্ষণ বা অধ্যায় (chapter) আছে। অধ্যায়গুলিতে বিষয়ানুগ সুলিখিত অনধিক পাঁচ এবং/বা সাতটি ক'রে প্রবন্ধ আছে। প্রণালীগতভাবে এইগুলিকে আমরা উপ-অধ্যায় (section/subsection) নামে অবিহিত করতে পারি।

প্রথম প্রেক্ষণটিতে (অধ্যায়টিতে) অঞ্চল ও আঞ্চলিকতার ইতিহাসবাহিত চিন্তা-ভাবনার অনুক্রমণ এবং সেইসঙ্গে এই বিষয়ে বর্ত্তমান কালের চিন্তাশীলদের কী ধরনের অনুভবের উপস্থাপনীয় মাত্রা সূচিত হতে পারে — তা পাঁচটি ধ্রুবকে (প্রবন্ধে) ব্যাখ্যাত হ'য়েছে। ভারতীয় সভ্যতার সর্বাত্মক তথা আঞ্চলভিত্তিক সাংস্কৃতিক রূপের করণীয় ব্যাখ্যানের সাথে কালের দাবিতে ভারতের অঞ্চলগুলির বৈচিত্র্যীকরণ প্রাপ্তি তথা একত্রীকরণ প্রয়াসের অত্যন্ত কালস্পর্শী বিশ্লেষণ আমরা একসাথে পেয়ে যাই। এজন্য

সাধুবাদ প্রাপ্ত হওয়ার অধিকারী সম্পাদক স্বয়ং। রাজ্য-পুনর্গঠন কমিশন নির্ধারিত রাজ্য-বিন্যাস, জনজাতিগত 'অভ্যন্তরীণ সংঘাত এবং প্রতিঘাতের সূত্রে প্রাপ্ত কারকগুলির দ্বারা কৃত' সূক্ষ্ম কিন্তু অন্তর্লীন বিশেষ প্রকারের পুনর্গঠন ও বিন্যাস, ঝাড়খন্ড আন্দোলনের গণতন্ত্রকামিতা কিংবা বিকেন্দ্রীকরণ সম্পাদনের কৌশল, নাম ও সংখ্যার রাজনীতির মহাত্ম্য কীর্তন এবং পাহাড়ের রাজনীতিতে 'উত্তরাখন্ড' রাজ্যপ্রাপ্তির অন্দরে স্রোতস্বিনীর মত প্রবাহিত অস্মিতা তথা প্রতিবাদী ভাবালুতার উদ্গমন ইত্যাদি সম্পর্কে প্রেক্ষণীয় উপঅধ্যায়গুলি (ধ্রুবক সমুদয়) চিন্তাশীলতার কর্ষণে এক অনন্য নজির হিসাবে ফুটে উঠেছে এই ব্যাখ্যানটির সমগ্র দেহের স্তরে স্তরে।

দু-নম্বর অধ্যায়টি রাজ্যগুলির অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল তথা ঘাত-প্রতিঘাতমুখর আঞ্চলিক দল বা জাতীয় দলগুলির নির্বাচন বা নির্বাচকমন্ডলী সংশ্লিষ্ট রাজনীতির উপাদেয় সংশ্লেষণশীল ঘটনাবলী ঈর্ষনীয় মাত্রায় আমাদের ভাবিত করে। উত্তরপ্রদেশে একসময়কার সর্ববিদিত জাতীয় কংগ্রেসের রমরমা থেকে আরম্ভ ক'রে তার ক্রমশ ক্ষীয়মানতার রেখাচিত্রকে সংগে নিয়ে উঠে দাঁড়ানোর দরদস্তুর পর্যন্ত সবকিছুর পর্যালোচনা; এর অন্যপিঠে ভারতীয় জনতা পার্টির কোয়ালিশনধর্মী নতুন রাজনীতি তথা তার বিস্তার; ভারতীয় রাজনীতির ক্রম-অঞ্চলীকরণ এবং তার মাত্রা; অন্ধ্রপ্রদেশের রাজনীতিতে তেলেগু দেশম দলের ক্ষমতা থেকে পতন বা পুনরুত্থান প্রচেষ্টা সংক্রান্ত কোন নতুন সূত্র; তামিলনাড়ুর রাজনীতির পটপরিবর্ত্তনের নিত্যনতুন আখ্যান; অসম গণপরিষদের উত্থানের কোন ইঙ্গিতবহ প্রেরণার সঙ্কাশ বা বাম সংসদীয় রাজনীতির দীর্ঘতম পথপরিক্রমার অবসান কিংবা বিপ্রলম্ভন — এই সব বিষয়ের উচ্চস্রাবী ও মেধাবী কৃন্তনগুলি এক একটি উপঅধ্যায় হয়ে এই প্রেক্ষণ বা অধ্যায়ের সংলগ্ন হ'য়েছে। এই রকম বিপুল সমাবেশ রাজনীতি চর্চ্চায় রত মানুষদের স্বতঃই উদ্বেলিত করে এবং আন্দোলিত করে নতুন বিনির্মিত অবয়বের নিকটে উপনীত হ'তে।

তৃতীয় ছন্দে, সামাজিক আন্দোলনের বলয় এবং রাজ্য রাজনীতির বলয় কিভাবে ও কোনবিন্দুতে কাটাকাটি করবে— তার একটি দ্বন্দজটীল জ্যামিতিক উপকরণে সজ্জিত মানমন্দিরের abstraction বা ভাবানুষঙ্গ উপস্থাপিত করা হ'য়েছে। এখানে উত্তর ভারতের পশ্চাদপর জাতপাত রাজনীতির শ্রেণী-রাজনীতিতে বিলগ্নীকরণের ও উত্তরণের মত চমকপ্রদ ঘটনা থেকে আরম্ভ করে তামিল দলিত রাজনীতির শাখা-প্রশাখা বিন্যাস, বহুজনসমাজ রাজনীতির মূলীভূত সাব-অল্টার্ন বা সাধারণ নিম্নবর্গের সংগে ক্ষমতা-কেন্দ্রের ঐকীকরণ কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠের মহিমার মাঝখানে জনজাতিগত নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব এবং সেই ঘটনা প্রবাহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদগম ও তদ্‌ভিত্তিক রাজনীতির বিশ্লেষণসূচক উপস্থাপনার ক্রমপরম্পরা একটি নিটোল রাজনীতি-নিবন্ধনের ধাঁচ তৈরী করে। সেই ধাঁচ বা ছাঁদ বিশ্লেষণধর্মী রাজনৈতিক অবলোকনের সূক্ষ্ম কৌণিক কিংবা তির্যক দৃষ্টিভঙ্গীকে এখানে তুলে ধরেছে।

শেষ তথা চতুর্থ প্রেক্ষণে বিংশ শতকের অর্থনৈতিক সংস্কার তথা রাজ্য-রাজনীতির বিশ্বায়ন-পরবর্ত্তী অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনের প্যাটার্ন-কেন্দ্রিক যে কল্পিত বা বাস্তবিক রূপরেখা, তার অনুপুঙ্খ বার্ত্তা তুলে ধরা হ'য়েছে। এই নতুন 'মাত্রা পাওয়া' ফেডারেল মার্কেট ইকোনমিতে চন্দ্রবাবু নাইডুর অভিনেতাসুলভ দুর্বার পদক্ষেপ যা রাষ্ট্রসার্বভৌমত্বের ক্ষমতা বলয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ার স্পর্দ্ধা দেখায়; কিংবা রাজ্যগুলির পারস্পরিক বৈষম্যগুলিকে জাজ্বল্যমান মনে করে তুলে ধরে বিহারের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার চমকপ্রদ হাল-হকিকত; প্রাদেশিক প্রশাসন প্রক্রিয়ার মধ্যে SEZ বা বিশেষীকৃত অর্থনৈতিক জোন সংশ্লিষ্ট প্রতিবাদ-প্রতিরোধ রাজনীতির উত্থান বা বাড়বাড়ন্ত কিংবা অন্ধ্রের সংস্কার রাজনীতির দক্ষতাপূর্ণ প্রচার এবং তৎপরবর্তী নতুন সামাজিক বিন্যাসের অধিক্রমণ ও তৎসংক্রান্ত আলোচনা এই অধ্যায়টিকে অভিনবত্বে তথা মৌলিককত্বে উত্তীর্ণ করায়। Jos Mooij-এর লেখা সংকলনের শেষ প্রবন্ধটি থেকে একটি উদ্ধৃতি বিষয়টির গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করবে: After all, it is not just class that matters, but also class aspirations. It is these three things — hype, skill and class and— that seem to have played an important role in the reform process of AP. (''Hype, skill and class : The Politics of reforms in Andhra Pradesh, 1995-2004 and Beyond'', in *Handbook of Politics in Indian stady*, p. 412.

মোটের উপর, সম্পাদিত ভল্যুমটি (Handbook of Politics in Indian States : Regions, Parties and Economic Reforms) নিজের শিরোনামের মর্যাদা ও মূল্যমানের যথাযোগ্য চিহ্ন বা আলিম্পন রাখতে পেরেছে। ২০১৩ সালে প্রকাশিত বই হিসেবে যে ধরনের প্রস্তার দেখানোর scope বা অবকাশ ছিল, সম্পাদক অক্লেশে তা করেছেন। সঠিক মানের বিষয়ের সেই সেই ধরনের Article বা প্রবন্ধের সমাবেশ ঘটিয়ে চিন্তাঘন একটি অমূল্য সংকলন আমাদের উপহার দিয়েছেন যা আধুনিক রাজনৈতিক মননের সাথী। ঐতিহাসিক উন্মেষ-পর্ব দিয়ে শুরু করে বর্ত্তমান ভারতবর্ষের রাজ্যগুলির রাজনীতির বিচিত্র ঘনঘটাকে চুম্বকীয় আয়ত্তে এনে ফেলেছেন - সে ethnic বা নৃতাত্ত্বিক সংঘর্ষই হ'ক কিংবা ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী অস্মিতার স্ফুরণের প্রশ্নই হ'ক এবং/অথবা উত্তরাখণ্ডের স্বতন্ত্র পাহাড়ী রাজ্যগঠনের দাবিই হ'ক। সেই সংগে রাজনৈতিক দলগুলির কিংবা নির্বাচনী রাজনীতির বৈতরণী পারাপারের কাণ্ডারীদের কৌশল বা রণনীতিগত আঞ্চলিকতার কণ্ডুয়নজনিত যে রাজ্য-রাজনীতি— সে শুধু কংগ্রেসের বা ভারতীয় জনতা পার্টির কেন; আসাম গণপরিষদ বা তেলেগুদেশম কিংবা তামিল রাজনীতির নাটকীয়তাও— এখানে সন্নিবিষ্ট আছে। তৃতীয় অন্য একটি স্তম্ভের উপরেও নির্ভর করা হয়েছে-সেটি হল সামাজিক আন্দোলনের রাজনীতি এবং তা, জাতপাতের রাজনীতি, দলিত-উন্মেষ বা বিকাশের রাজনীতি কিংবা বড় বড় রাজ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ethnic বা নৃগোষ্ঠীর 'অস্মিতা' দাবীর রাজনীতির মতই সমাজ-সংস্কৃতির

নার্সারিতে পালন করা অভিনব রাজনীতি।

এই নয়া রাজনীতির চতুর্থ আর একটি স্তম্ভও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অর্থনৈতিক সংস্কার কিংবা বিশ্বায়নের প্রভাবে রাজ্য রাজনীতির যে হাল হকিকৎ – অর্থনৈতিক সংস্কার, বিশেষ অর্থনৈতিক জোন বা 'সেজ' কিংবা রাজ্যগুলি কিভাবে প্রাইভেট সেক্টরকে জারিত ক'রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা বৃদ্ধি, বাণিজ্য বা চাকুরিবৃদ্ধির নীতিকে রূপায়িত ক'রেছে এবং করার পশ্চাতে জনগণের প্রতিবাদ কিংবা গ্রহণ বর্জনের যে রাজনীতি ছিল বা আছে তাও সংকলনটিতে সমাবিষ্ট হ'য়েছে। একটিই অভাব বা অপূর্ণতা গ্রন্থটির মধ্যে অনুভব করা যায় – তা হ'ল কাশ্মীর সংক্রান্ত কোন একটি প্রবন্ধ বা প্রেক্ষণ সংকলিত না হওয়া; যা হ'লে, ঘটমান রাজ্য রাজনীতির ঘূর্ণায়মান ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ মহাসাগরে অতলান্ত অভিক্ষেপের সন্ধান দিতে পারত। আসলে, রাজন্য-শাসিত রাজ্যগুলির অগ্রগণ্য কাশ্মীর রাজ্যের ভারতভুক্তি অন্যান্য এরকম প্রায় ছয় শত রাজ্যের একইরকম ঘটনাকে সমদর্শী মনে হ'লেও, স্ব স্ব রাজ্যের জনগণের অস্মিতা বা নিজস্ব ধরনের রাজনীতির স্বাতন্ত্র্য প্রত্যেকটি অন্তর্ভুক্তিকে বিশিষ্ট করে রেখেছে, যেমন কাশ্মীরকেও। তথাপি, রাজন্যশাসিত রাজ্যগুলির প্রতিভূ হিসাবে কাশ্মীর বিষয়ক একটি স্বতন্ত্র আঞ্চলিকতা সম্পর্কীয়, দলীয় সংস্কার বা অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষীণ প্রভাবসম্বলিত রচনাংশও সংকলিত হ'লে, পর্যালোচিত গ্রন্থটি আদর্শ মানে পৌঁছোতো।

—শক্তিপদ পাল

Uma Medury

Public Administration in the Globalisation Era

The New Management Perspective

Orient Black Swam, New Delhi, 2010

PB, pp. 267, Rs. 295/-

সাম্প্রতিক সময়ে রাষ্ট্র, জনপ্রশাসন এবং জনজীবনে 'বিশ্বায়ন' কেবল একটি বহুল ব্যবহৃত শব্দ নয়; বরং পাশাপাশি এক অপরিহার্য অবভাস যা বিভিন্ন দেশের কর্ণধার সহ নাগরিক সমাজকেও অনেকাংশে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে তুলেছে। আর, এই অসামান্য ঘটনার অনুসারী হ'ল জনপ্রশাসনে নব্য পরিচালন তত্ত্বের গভীরগম্যতা। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান — বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে আই এম্ এফ্ — এবং প্রত্যেক দেশের সরকারী সংস্থা থেকে শিক্ষাকেন্দ্র — সমস্ত ক্ষেত্রেই নয়া পরিচালন নক্শা প্রাত্যহিক চর্চার বিষয় ও প্রয়োগের ছাঁচঘর। সূচনার পরিবেশ ও স্তর সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করা কষ্টসাধ্য হলেও বিভিন্ন দেশের উপর ক্রিয়াশীল কিছু জাতীয়, আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও দার্শনিক উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসাবে এই পরিচালন ব্যবস্থাকে চিহ্নিত করা সম্ভব। এক শতাব্দী তিন দশক পূর্বে (১৮৮৭ - এর জুন) উড্রো উইলসনের এক অনুসন্ধানী প্রবন্ধে আধুনিক জন-প্রশাসনের উদ্ভবের পর দীর্ঘ পথ এবং সময় অতিক্রান্ত হয়েছে; পঠন-পাঠন ও ব্যবহারিক শাস্ত্র হিসাবে মূলত রাষ্ট্রকেন্দ্রিক চরিত্রই প্রশাসনে প্রাধান্য পেয়েছে। মধ্যবর্তী সময়ে দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের অবক্ষয়, কোরিয়ার যুদ্ধ, এশিয়া-আফ্রিকায় পশ্চিমী উপনিবেশবাদের অবসান, সোভিয়েত রাষ্ট্রের ভাঙন, আমেরিকার বিশ্বব্যাপী একাধিপত্যবাদী আবির্ভাব — এ সমস্ত ঘটনাবলীর টানাপড়েনে জনপ্রশাসনের প্রচলিত

দৃষ্টিভঙ্গীর তেমন কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেনি; যদিও বিগত শতাব্দীর সত্তর দশক থেকে ওয়েবারীয় আমলাতান্ত্রিক বাঁধন শিথিল করে প্রশাসনিক কাঠামো ও আচার-আচরণে গণতান্ত্রিক প্রলেপ দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা আজও অব্যাহত, যার প্রতিফলন মিনোব্রুকে পর পর তিন বার লক্ষ্য করা গেছে।

অতীতে জন-প্রশাসনের প্রচলিত মডেলে আমলাতন্ত্র নির্ভর স্তরবিন্যস্ত কেন্দ্রীভূত প্রশাসিক কাঠামো একমাত্র বিবেচ্য উপাদানের মান্যতা লাভ করলেও নব পরিচালন ব্যবস্থা (এনপিএম) জনস্বার্থ সম্পাদন ও পরিষেবা প্রদানে সরকারী সংগঠনের দক্ষতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে, যেখানে রাজনীতি কিংবা সামাজিক কল্যাণের প্রাধিকার কোনভাবে স্বীকৃত নয়। ১৯৮০ -এর দশকে ইংল্যান্ডের থ্যাচার সরকার সরকারী প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও পদ্ধতিতে যে নতুন ধারার প্রবর্তন করে তার মধ্য দিয়েই এই পরিবর্তনের সূত্রপাত। সরকারী দপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদিত বেশ কিছু কাজ ও পরিষেবাকে সরকারী ক্ষেত্র মুক্ত করে বেসরকারী পরিসরে স্থানন্তরিত করার উদ্যোগ এই পরিবর্তনে সুস্পষ্ট। যার ফলে ইংল্যান্ডের বিদ্যুৎ, কয়লা, এনার্জি সহ জনগণের উপযোগী বেশ কিছু ক্ষেত্রের বেসরকারীকরণ ঘটে। এভাবেই ১৯৮০-এর দশকে ব্রিটেন, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যন্ড প্রভৃতি দেশে নব পরিচালন ব্যবস্থার অম্বপ্রকাশ। বস্তুতপক্ষে নয়া পরিচালন ব্যবস্থা হ'ল জন-প্রশাসনের এক আদর্শ স্থাপনকারী ধারণা যা কতকগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত উপাদানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। প্রশাসনের এই নতুন মডেল প্রচলিত জনপ্রশাসনের কাঠামো, প্রক্রিয়া ও আচরণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রচলিত জনপ্রশাসন তার ঘরানা ও সর্বব্যাপী আকর্ষণ সত্ত্বেও কিছু পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিষয় ও ঘটনার প্রভাব সম্পর্কে উদাসীন থাকার ফলে পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক শক্তি হিসাবে গড়ে উঠেছে। নব পরিচালন ব্যবস্থা এই পারিপার্শ্বিক শক্তিসমূহের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ।

সত্যি কথা বলতে, নয়া জন-পরিচালন ব্যবস্থার সূচনালগ্ন থেকেই বিতর্কের অন্ত নেই, কারণ এই ব্যবস্থা অনুসরণের ফলে বিভিন্ন দেশে শুধু যে প্রশাসনিক সংস্কার কিংবা পরিবর্তন ঘটেছে তা নয়; এর ফলে সরকারের ভূমিকা, প্রশাসক মন্ডলী ও রাজনীতিবিদদের মধ্যকার সম্পর্ক, আমলাতন্ত্রের যোগ্যতা ও দক্ষতা, তাদের দায়বদ্ধতা — সমস্ত বিষয়ে মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। সনাতনী প্রশাসনিক ধারণার পরিবর্তে নতুন কিছু ধারণা ও উপাদানের নিছক পরিবর্তন, কিংবা কেবলমাত্র বাজার নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি নয়; বরং বলা যায় এই রূপান্তরের অনিবার্য পরিণতি হ'ল রাষ্ট্রের বাজার-কেন্দ্রিক সঞ্চরণ। স্বাভাবিক ভাবেই এই নতুন মডেলের প্রাসঙ্গিকতা, বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিতর্ক এখনও সজীব। এ রকম প্রশাসনিক তত্ত্বের এক বৌদ্ধিক সংকটে অধ্যাপিকা উমা মেদুরী -এর লেখা 'Public Administration in the Globalisation Era' যে বর্ধিত আগ্রহ ও নতুন বিতর্কের ভূমিকা হিসাবে আখ্যাত হবে— এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। প্রায় তিন দশকের

অভিজ্ঞতার নিরিখে লেখিকা নব্য উদারনীতিবাদী দর্শনের প্রতিফলনে বিকশিত নব পরিচালন ব্যবস্থার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে গিয়ে যে রূপরেখা নির্মাণ করেছেন তার মধ্যে জন প্রশাসনের মৌলিক অবস্থিতির পুনর্নির্মাণ, প্রশাসনিক মডেল সমূহের পুনর্গঠন, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অভিন্ন নীতিপ্রয়োগের সমস্যা ও তার সমাধান এবং রাষ্ট্রনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গী তথা বাজারকেন্দ্রিক ব্যক্তি অভিমুখী চিন্তাধারার সুপ্রথিত বাস্তববাদী উন্নয়ন কৌশল নির্মাণ-ইত্যাদিই হ'ল এর প্রধান উপজীব্য বিষয়।

আলোচ্য পুস্তকটির ভূমিকায় নয়া জন-প্রশাসনের উদ্ভবের কার্য-কারণ সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবে আলোচনার মুখ্য প্রয়াস লেখিকা সংক্ষেপে পাঠক সমাজের কাছে উপস্থিত করেছেন, যা আকর্ষণীয়। এছাড়া বইটি ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এবং প্রতিটি পর্ব পারস্পরিক সংবলিত। ভূমিকা পরবর্তী প্রথম দু'টি অধ্যায়ে খুব সুস্পষ্টভাবে নব্য পরিচালন ব্যবস্থার তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি আলোচ্যমান মডেলের উদ্ভব এবং পরবর্তী দু'দশকের বিকাশের উপাদানগুলি, তথ্য এবং তত্ত্বের সংমিশ্রণে অন্যান্য ধারণাগুলির একত্র সংক্ষিপ্ত আলোচনা খুবই উৎকৃষ্ট এবং উপযোগী। এছাড়া এই দুই অধ্যায়ে এন.পি.এম. এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। বিশেষত গ্রন্থটির দ্বিতীয় পর্বে নব জন-পরিচালন ব্যবস্থা যে সাবেকী প্রশাসনিক ধারণার এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা- সেই বিষয়টিকে সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া এই পরিচ্ছেদে সাবেকী প্রশাসনিক মডেল এবং নব পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্যও বিশেষভাবে আলোচিত। আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশে নয়া পরিচালন ব্যবস্থার প্রয়োগ এবং প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্যোগ সম্পর্কে আলোচনা তৃতীয় পর্বের মুখ্য বিষয়। ভারত সহ পশ্চিমের অন্যান্য দেশ –আমেরিকা, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশে প্রশাসনকে কিভাবে বাজার নির্ভর পরিচালন ব্যবস্থায় পরিণত করা হয়েছে তা আলোচ্য অধ্যায়ে বিশ্লেষিত। একথা উল্লেখযোগ্য এবং অধ্যাপিকা মেদুরীর আলোচনায় সুস্পষ্ট যে প্রশাসনিক রাজনৈতিক পার্থক্য, আর্থ-সামাজিক বিভিন্নতা, সাংবিধানিক ও সংস্কৃতিগত বৈষম্য সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশের প্রশাসনিক সংস্কারের সূচনা পর্ব থেকেই কিছু কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যও পরিলক্ষিত হয়।

নব জনপরিচালন তত্ত্বের সঠিক পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণ পুস্তকটির চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু। এই অধ্যায়ে মডেলটির রূপায়ণ এবং প্রয়োগ সংক্রান্ত ত্রুটিসমূহ আলোচিত হয়েছে। নয়া পরিচালনের লক্ষ্য হ'ল উৎপাদ (আউটপুট্) ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারী কাজকর্ম ও প্রক্রিয়ার বেসরকারীকরণ, বাজারীকরণ, চুক্তিভিত্তিক প্রকল্প সম্পাদন এবং সংকোচনের প্রয়াস এবং এই বিবিধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সরকারী সংগঠনে সহজ পদ্ধতি ও উদ্যোক্তামুখী সংস্কৃতি প্রচলন করা। অধ্যাপিকা মেদুরী তাই যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে নয়া পরিচালন ব্যবস্থা প্রশাসনিক সংস্কারের সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় একটি একমাত্রিক ভাবনা।

বর্তমান পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র নব পরিচালনপদ্ধতির উপর নির্ভরতা যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন হ'ল, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক নীতির সংমিশ্রণে সরকারী সংগঠনে সঠিক পরিচালন পদ্ধতি নির্মাণ। অন্য ভাবে বলা যায়, পরিচালনগত পরিবর্তন এবং সরকারী প্রশাসনের গণমুখী চরিত্রের মধ্যে সু-সামঞ্জস্য বিধানের মধ্য দিয়ে প্রশাসনিক সংস্কারের সুফল অর্জন সম্ভব।

সাম্প্রতিক সময়ে রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সাবেকী ধারণার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় অবয়ব ও ক্রিয়াকলাপ বর্তমান শতকে ন্যুব্জ এবং অনেকাংশে অতীত। বিশ্বায়নের বিশ্ব বিজয়ে সমাজ, রাষ্ট্র, প্রশাসন - সমস্ত কিছুর ক্ষেত্র, পরিধি এবং চরিত্র পরিবর্তিত; আর এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সামাজিক উন্নয়নে রাষ্ট্র একমাত্র কারক নয়-আরো অনেক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সঙ্গে সমালোচনামূলক সহযোগিতা ও নেতৃত্ব সুলভ প্রতিযোগিতায় আশ্লিষ্ট। 'গভর্ণমেন্ট' এর পরিবর্তে 'গভর্ণান্স' বা কর্তৃত্ব-মূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহারের প্রক্রিয়ার ধারণায় সমাজ অনেক বেশী স্বচ্ছন্দ। যেমন স্থানীয় সরকার বা লোক্যাল্ গভর্ণমেন্ট আজ লোক্যাল্ গভর্ণান্স-এ রূপান্তরিত। স্বাভাবিকভাবে এই পরিবর্তন আলোচ্য পুস্তকের অন্তর্ভূক্ত। গ্রন্থটির পঞ্চম পর্বে বিস্তৃত আলোচনার পর লেখিকা ভবিষ্যতে জন-প্রশাসনের চর্চা ও প্রয়োগের এক রূপরেখা নির্মাণ করেছেন যার ভিত্তি হ'ল আর্থিক সংস্কারের সামাজিক ও মানবিক মুখ যুক্ত করা যার মধ্য দিয়ে টেকসই উন্নয়নের কথা ভাবা যায়। এ বিষয়ে অধ্যাপিকা মেদুরীর দৃঢ় অভিমত হ'ল প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে জন-প্রশাসনকে পুনর্গঠিত করা যাতে বিকাশমুখী প্রকল্প নির্ধারণ এবং নীতিসমূহের রূপায়ণ সম্ভব হয়। এই লক্ষ্যে সরকার, বাজার এবং নাগরিক সমাজের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের শাসন প্রক্রিয়ায় অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও এজেন্সী সমূহের কাজকর্মকে যুক্ত করা যায়, যার ফলে সু-শাসন এবং দৃঢ় অর্থনৈতিক অবস্থা সুনিশ্চিত হতে পারে। প্রশাসনিক কৌশল হিসাবে এ ধরণের উদ্যোগ সম্ভবনাপূর্ণ হলেও পরিবেশগত উপাদানকে অস্বীকার করার অবকাশ নেই বলে তাঁর বিশ্বাস।

জন প্রশাসনের উপযুক্ত মডেলের অনুসন্ধানে এন পি এম নিঃসন্দেহে এক উল্লেখযোগ্য উপাদান - মূলত দুটো কারণে : (ক) আমলাতন্ত্রকেন্দ্রিক জনপ্রশাসনের প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণে, আর (খ) সরকারী প্রশাসন ও প্রশাসনের মাধ্যেকার পুরানো বিতর্ক নতুন আঙ্গিকে বিচারের ক্যানভাস তৈরীর মাধ্যমে। কিন্তু মৌলিক প্রশ্ন হ'ল, জন-প্রশাসনকে নব জনপরিচালনে পরিণত করার প্রয়াস কতটা যুক্তিযুক্ত কারণ, গুণগতভাবে বাজারকেন্দ্রিক এন পি এম উদ্দেশ্য, আনুগত্য এবং উদ্বেগের প্রশ্নে জন-প্রশাসন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। বর্তমান উল্লেখ্য গ্রন্থে এই মৌলিক প্রশ্নের উত্তর সরাসরি না থাকলেও আগামী দিনে প্রশাসন বিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনায় অধ্যাপিকা মেদুরীকে এর সমাধানে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

আলোচ্য পুস্তকটি সময়োপযোগী; বিশ্বায়নের কম বেশী তিন দশক পর জন প্রশাসনের

তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক প্রেক্ষাপটে নয়া পরিচালনব্যবস্থার প্রভাব, প্রতিক্রিয়া ও ভবিষ্যৎ বোঝার ক্ষেত্রে প্রকাশনাটি আকর গ্রন্থের তুলনীয়। খুব সংক্ষেপে বলা যায়, জন প্রশাসন ও নব পরিচালন তত্ত্বের বৌদ্ধিক অন্বেষণে গ্রন্থটি এক মূল্যবান সংযোজন যা অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্যের লিখিত মুখবন্ধে স্বীকৃত। পরিশেষে উল্লেখ্য, বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বইপত্র, প্রবন্ধ-নিবন্ধের তালিকা, গ্রন্থপঞ্জি গবেষক ও আগ্রহী পাঠকসমাজের কাছে যথেষ্ট আকর্ষণীয়। নির্ভুল প্রকাশনা অবশ্যই বাড়তি পাওনা।

— অনিল কুমার জানা

সমাজ জিজ্ঞাসা-র প্রকাশিত বিষয়সমূহ

উদ্বোধনী সংখ্যা

মোহিত ভট্টাচার্য	সমাজ বিজ্ঞানের চরিত্র
সত্যনারায়ণ ঘোষ	সমাজবিজ্ঞান গবেষণার সমস্যা
রাখহরি চট্টোপাধ্যায়	রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গবেষণা পদ্ধতি
অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়	রাষ্ট্রতত্ত্বে মানবাধিকার
অমিয় দেব	বিশ্বায়ন ও সমাজধর্ম : একটি নিবন্ধের ভূমিকা
অমিয় কুমার সামন্ত	বিদ্যাসাগর ও ডিরোজিয়ানগণ
সন্তোষ কুমার অধিকারী	বিদ্যাসাগর চেতনায় বিজ্ঞান
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য	গান্ধী হিউম্যানিজম্ : মার্কসবাদীর দৃষ্টিতে
জীবেন্দু রায়	ধূর্জটিপ্রসাদ : মার্কস্‌বাদ ও মানবধর্ম
পুস্তক পর্যালোচনা	পূর্ণেন্দুশেখর দাস, গৌতম চন্দ রায়

দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা

রাধারমণ চক্রবর্তী	শ্রেণী, শ্রেণীচেতনা ও বিশ্রেণীকরণ
স্বপন কুমার প্রামাণিক	অনুন্নত শ্রেণী ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা : প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য
ভারতী মুখোপাধ্যায়	জুডিশিয়াল অ্যাকটিভিজম্ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতে
নিমাই প্রামানিক	'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' : প্রকৃতি ও পরিণতি
দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন : একটি প্রাথমিক মূল্যায়ন
বিপত্তারণ ঘোষ	বাংলাদেশের অভ্যুদয় : সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
অনিল কুমার জানা	উদারীকরণ : রাষ্ট্র বনাম বাজার - নতুন মোড়কে পুরানো বিতর্ক
প্রভাত মিশ্র	অনিবার্য হিংসা ও অহিংসানীতি
দেবনারায়ণ মোদক	জাতিপ্রশ্ন, মার্কস্‌বাদ ও ভারতবর্ষ : একটি তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট
কোরক চৌধুরী	মার্ক ব্লখ্ : সার্বিক ইতিহাসচর্চার সন্ধানে

তৃতীয় বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা

কেশব চৌধুরী	নগরায়ণ ও নগরনীতি : তৃতীয় বিশ্বের প্রেক্ষিত
মৃণাল কান্তি ভদ্র	মানুষ, বিশ্ব এবং পরিবেশ-দর্শন
রাজশ্রী দেবনাথ	তেভাগা তেলেঙ্গানার গণসংগ্রাম ও ভারতীয় মহিলা সমাজ
অচিন্ত্য কুমার দত্ত	উনিশ শতকে ভারতীয় সমাজ ও মহিলা চিকিৎসক
সন্তোষ কুমার পাল	পারমাণবিক প্রতিরোধতত্ত্ব : যুক্তি ও নৈতিকতা
দেবেশ ভৌমিক	পরিবেশ, দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন এবং নারী দারিদ্র্য
গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	মালানা : হিমালয়ের পরিবেশে এক বিচ্ছিন্ন ও অনন্য মানবসমাজ
অসীম পাল	বোলান : লোকসংস্কৃতির আধুনিকীকরণের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত
শ্যামাপ্রসাদ বসু	কোম্পানীর আমলে মানভূমে ঘাটোয়ালী পুলিশ ব্যবস্থা
অরিন্দম গুপ্ত	ভারতীয় শেয়ার বাজার কি বিশ্বায়নের পথে ?
মৃণাল কান্তি চট্টোপাধ্যায়	জিন্নার গণতান্ত্রিক ভাবনা : কিছু ইঙ্গিত

চতুর্থ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা

প্রবন্ধ :

নিমাই প্রামাণিক	সি. টি. বি. টি. ও ভারত
দেবনারায়ণ মোদক	বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি প্রয়াস বিরোধী আন্দোলন (১৯৫৬) : কমিউনিস□পার্টির ভূমিকা
বিমল গুড়িয়া	একুশ শতকে ভারতের উচ্চশিক্ষা- একটি নিবন্ধের ভূমিকা
ভূপেন্দ্র চন্দ্র দাস	বুদ্ধদেবের সমাজ ভাবনা
অনিল কুমার জানা	উন্নয়ন ও প্রযুক্তি : গান্ধীর বিকল্প প্রযুক্তির ধারণা
রীনা পাল	ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মেদিনীপুরের নারী
সৈয়দ আব্দুল হাফিজ মইনুদ্দিন	ভারতের সংসদীয় রাজনীতিতে নারীর অবস্থান
প্রসেনজিৎ মাইতি	রাষ্ট্র এবং শাসন : রাজনীতির গোড়ার কথা
উদয়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	আধিপত্যবাদী হিন্দু রাষ্ট্রের কল্পনা
রামানুজ গাঙ্গুলী	ভারতীয় সমাজে বার্ধক্য সমস্যার প্রকৃতি
নারায়ণ মান্না	স্থিতিবান সামাজিক সম্পর্ক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব
রামকুমার ভকত	দীঘার পরিবেশ সমস্যা

পুস্তক পর্যালোচনা :

অম্বরীষ মুখোপাধ্যায়	Prasenjit Maiti, *Problems of Governance in India Since Independence : The Bengal Success Story*
শঙ্কর মজুমদার	Prabhat Datta, *Panchayats, Rural Development And Local Autonomy : The West Bengal Experience*

পঞ্চম বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা

শক্তিপদ পাল	সমাজবিজ্ঞানের দিগ্‌দর্শন
দীপক সরকার	পশ্চিমবাংলার শিল্পায়ন প্রসঙ্গে কিছু কথা
রামকৃষ্ণ মাইতি	পশ্চিম মেদিনীপুরে শিলাবতী নদীর বন্যা একটি ভূবৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান
দেবনারায়ণ মোদক	সাম্প্রদায়িকতা এবং ভারতীয় রাজনীতি : সামাজিক শিকড়ের সন্ধান
লায়েক আলি খান	উনিশ শতকের বাঙালী মুসলমানদের চিন্তাচেতনার ধারা
কুমার মিত্র	বৈষম্য, বিপরীত বৈষম্য এবং প্রায়োগিক নীতিবিদ্যার দৃষ্টিকোণ
সুমনা বেরা	মানব জীবনে ধারণা গঠন প্রক্রিয়া : কিছু সাধারণ কথা
নিমাই প্রামাণিক	নয়া উদারনীতিবাদ : কী ও কেন ?
অনিল কুমার জানা	বিশ্বায়ন : সমাজ, রাজনীতি ও প্রশাসন
অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়	সু-শাসন : সংজ্ঞা ও ফলিতার্থ
অশ্বিনী কুমার রায়	বিশ্বায়ন ও গণতান্ত্রিক পরিচালন ব্যবস্থা : ভারতীয় অভিজ্ঞতা
রীনা পাল	রবীন্দ্রনাথের পল্লীভাবনা ও উত্তরাধিকার
সৌম্যজিৎ পাত্র	কার্লমার্ক্স ও পুঁজিবাদ
সুজয়া দে (সরকার)	বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী আন্দোলন ও রবীন্দ্র ভাবনা

এ.এফ.এম.ডি.আসাদুল হক	নজরুলের নারীমুক্তি ভাবনা
গৌতম মজুমদার	ভারত-মার্কিন পারমাণবিক সমঝোতা এবং ভারতের জাতীয় স্বার্থ
দেবাশীষ নন্দী	ঠান্ডাযুদ্ধ-উত্তর ভারত মার্কিন সম্পর্ক : পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গী
মানস চক্রবর্তী ও দিব্যেন্দু দাশগুপ্ত	সন্ত্রাসবাদ ও কাশ্মীর সমস্যা : একটি নিবন্ধের ভূমিকা
Swapan Kumar Pramanik	Privatization of Health Care System in India : Issues and Challenges
Rajatkanti Das	Anthropological Research : Reflections of Imperial Times and Thereafter
Anirban Mukherjee	Working Women in India

ষষ্ঠ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা

গৌতম চন্দ রায়	বিংশ শতকের প্রারম্ভে বাঙালী জীবনে নীতিশিক্ষা- পন্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের বঙ্গের রত্নমালা : একটি পাঠ
কেশব চৌধুরী	ব্যক্তি স্বাধীনতার তত্ত্বনির্মাতা গান্ধী : একটি বিশ্লেষণ প্রয়াস
ভূপেন্দ্র চন্দ্র দাস	মানব জীবন ও সমাজে দর্শনের ভূমিকা
সন্তোষ কুমার পাল ও মুনমুন দত্ত	নীতিশাস্ত্রে নারীবাদের অনুপ্রবেশ
পাপিয়া গুপ্ত	কৃপাহত্যার নৈতিকতা : একটি পর্যালোচনা
বাণীরঞ্জন দে	অ-বাচিক ভাষা-প্রসঙ্গ ও বাংলা-সমাজের কয়েকটি অ-বাচিক ব্যবহার
প্রভাত মিশ্র	ওরে বিহঙ্গ: প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ
অম্বরীষ মুখোপাধ্যায়	অবাক জলপান : আজ কাল-এর জলছবি
শচীনন্দন সাউ	স্ব-সহায়ক দল : তত্ত্ব ও অভিজ্ঞতা - পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখ সহ একটি আলোচনা
রাজকুমার কোঠারী	ভারতের বিদেশনীতি নির্ধারণে ভারত মহাসাগরের ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব : সাম্প্রতিক প্রবণতা
কল্যাণ কুমার সরকার	বিশ্বায়ণ, সন্ত্রাসবাদ ও বিশ্বরাজনীতি : বর্তমান প্রেক্ষিত
ইয়াসিন খান	জ্যোতিরাও ফুলে : ভারতীয় সমাজ ভাবনায় বিকল্পধারার পথিকৃৎ
তপন দে	শিক্ষার একাল ও সেকাল : একটি পর্যালোচনা

সপ্তম বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা

বিদিশা চক্রবর্তী	এক বাল্যবিধবার জীবন বৃত্তান্ত
রীনা পাল	নারী ও মানবাধিকার
অনিল কুমার জানা	গান্ধীর গ্রাম-উন্নয়ন ভাবনায় যন্ত্রপাতির স্থান : পরিপ্রেক্ষিত ও প্রাসঙ্গিকতা

বিমল কুমার গুড়িয়া	স্বাধীনতা উত্তর ভারতে গ্রামোন্নয়নে রবীন্দ্র ভাবনার প্রয়োগ : একটি অনুসন্ধান
দেবনারায়ণ মোদক	সুভাষচন্দ্রের সম্প্রীতি ভাবনা : সমকালীন ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা
গৌতম বসু	'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কী শুধুই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি অধ্যায় ?'– একটি আত্মসমীক্ষা
অপূর্ব মুখোপাধ্যায়	সাম্রাজ্যবাদ ও নয়াউপনিবেশবাদ
শ্যামাপদ দে	ভারতের বিদেশনীতি ও 'মলদ্বীপ' এর ভূ-কৌশলগত অবস্থান – একটি পর্যালোচনা
কৌশিক চক্রবর্তী	নয়-এগারো উত্তর বিশ্বপরিস্থিতি ও আমেরিকার ভূমিকা
শক্তিপদ পাল	রাজনৈতিক দুর্নীতি – একটি নয়া ধারণা
নন্দিনী বশিষ্ঠ	ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও বিচ্ছিন্নতাবাদের রাজনীতি : উত্তর-পূর্ব ভারতের অভিজ্ঞতা
জয়তিলক গুহরায়	ভারতে নির্বাচনী সংস্কার
রাখি বণিক	শহরের দারিদ্র্যদূরীকরণ কর্মসূচী ও অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা : একটি নিবন্ধের ভূমিকা
সিদ্ধার্থ সাঁতরা	ভারতীয় চলচ্চিত্রের শতবর্ষ : বিনোদন থেকে সামাজিক প্রসঙ্গে রূপান্তর

পুস্তক পর্যালোচনা :

অম্বরীষ মুখোপাধ্যায়	*বিশ্বায়ন ও রবীন্দ্রনাথ* (শংকর পাল)
পার্থপ্রতীম বসু	*এমার্জিং ইন্ডিয়া অ্যাজ্ এ গ্লোবাল্ প্লেয়ার : গ্রোয়িং টাইজ্ এন্ড্ চ্যালেঞ্জেস্* (রাজকুমার কোঠারী সম্পাদিত)
গৌতম চন্দ রায়	*স্পোর্টিং অব্ দ্য ফিল্ড : ফুটবল কালচার ইন্ বেঙ্গল* (কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

সমাজ বিজ্ঞান কেন্দ্র প্রকাশিত মনোগ্রাফ্

অনিল কুমার জানা ● সমীর ঘোষ ● পূর্ণেন্দু শেখর দাস

ভারতীয় ব্যাংক ব্যবস্থায় দক্ষতা ও জনস্বার্থ

একটি প্রাসঙ্গিক বিতর্ক

সমাজ জিজ্ঞাসা
লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ/রচনা (পাঁচ-ছয় হাজার শব্দের মধ্যে) এবং গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক পর্যালোচনা পত্রিকার মূল উপজীব্য। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু এবং গুণগত মান একমাত্র বিবেচ্য।

২. প্রাকাশের জন্য বাংলা আক্রুতি-শরদ হরফ্ বারো পয়েন্ট-এ ছাপা কপি সহ সফ্ট কপি সি. ডি. বা ইমেল মাধ্যমে পাঠাতে হবে। লেখা পাঠানোর পূর্বে প্রেরককে বানান ও অন্যান্য বিষয়ে যত্নবান হতে হবে।

৩. লেখার সংগে প্রবন্ধের নাম, লেখকের পুরো নাম, ঠিকানা, পেশা, কর্মস্থল এবং ফোন নম্বর ইত্যাদি পৃথক কাগজে উল্লেখ করে স্বাক্ষরসহ পাঠাতে হবে।

৪. পূর্বে প্রকাশিত কোন লেখা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

৫. লেখা নির্বাচনে পত্রিকা সম্পাদকমন্ডলীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং লেখকের কোন মতামত সম্পর্কে পত্রিকা কর্তৃপক্ষের কোন দায় থাকবে না।

৬. কোন প্রকার চার্ট, গ্রাফ বা সারণি (Table) সাধারণতঃ গ্রহণ করা হয় না।

৭. অমনোনীত লেখা ফেরত পাওয়ার জন্য উপযুক্ত ডাক-মাশুলসহ পূর্বাহ্নে জানাতে হবে।

৮. (ক) পাদটীকা, টীকা, তথ্য, তথ্যসূত্র, টীকা ও সূত্রনির্দেশ— ইত্যাদি রচনার মধ্যে উল্লেখ থাকবে না; রচনার শেষে উল্লিখিত হবে। রচনার মধ্যে কেবলমাত্র উপযুক্ত স্থানে ওপরদিকে বাংলায় সূত্র-সংখ্যা থাকবে।

(খ) নিম্নোক্ত নমুনা অনুযায়ী তথ্যসূত্র ইত্যাদি রচনার শেষে ব্যবহার করতে হবে :

● **গ্রন্থ ও মনোগ্রাফ :**

১. অমলেশ ত্রিপাঠী, ১৯৩৭. *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)*. কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স. পৃ. ১৫.

২. Jean Drèze and Amartya Sen, 2002. *India – Development and Participation*. New Delhi : Oxford. p. 21 - 29.

● **সম্পাদিত পুস্তক :**

লেখকের নাম, প্রকাশ কাল. ''প্রবন্ধের নাম'', সম্পাদকের নাম (সম্পাদিত), *বইয়ের নাম*. প্রকাশনার স্থান : প্রকাশক. পৃ. ৩৩ - ৪৭.

● **পত্রিকার প্রবন্ধ :**

গোপাল হালদার, ২০০১. ''অধ্যাপক সুশোভন সরকার (প্রবন্ধের নাম)'', *উজানে* (পত্রিকার নাম). প্রথম বর্ষ/ভল্যুম্ (প্রথম সংখ্যা). পৃ. ১৩ - ১৬.

● **ইন্টারনেট সূত্র :**

লেখকের নাম, প্রকাশ কাল. ''প্রবন্ধের নাম''.
<http://www. ... ...> (Date of Access).

● **সেমিনার ইত্যাদি সূত্র :**

নাম, সেমিনার সময়. ''প্রবন্ধের নাম''. *সেমিনারের নাম*, বিবরণ ও স্থান.

● **দৈনিক পত্রিকা :**

টেলিগ্রাফ্, ১১ নভেম্বর ২০১৩. পৃ. ৭.

With Best Compliments from:

Celebrating

72 Years of Excellence

UCO Bank's attractive Deposit Schemes promise you high growth and easy liquidity

UCO Bank's attractive Loan Schemes are specially designed to suit your personal needs

Debit card services offers great convenience

o Local knowledge, worldwide expertise o An array of rural banking solutions.

Credit facilities for all the rural needs

UCO Bank reaches out to unbanked villages with the aid of financial inclusion

Fast track services and products to micro and small enterprise

यूको बैंक UCO BANK

(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

सम्मान आपके विश्वास का Honours Your Trust

Samaj Jijnasa / Vol 8 No-1 & 2 / 2014

Vidyasagar Centre for Social Sciences
বিদ্যাসাগর সেন্টার ফর সোস্যাল সায়েন্সেস, মেদিনীপুর

আমাদের প্রতিশ্রুতি । আমাদের প্রয়াস

- পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ-সচেতন ও জীবনমুখী আদর্শ ও কর্মপ্রয়াসের ঐতিহ্য অনুসরণ:
- সামাজিক দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বহুমুখী সামাজিক সমস্যাসমূহের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনায় ধারাবাহিক উদ্যোগগ্রহণ:
- জীবনমুখী ভাবনাসঞ্জাত বিষয়সমূহের পারস্পরিক আলোচনা, সেমিনার, প্রকাশনাসহ নানাবিধ কর্মোদ্যোগের মাধ্যমে সমাজ চেতনার প্রসার:
- পরিবর্তমান সামাজিক সমস্যাসমূহের প্রাসঙ্গিকতার নিরিখে গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ ও পরিচালন:
- সামগ্রিক ভাবে মানব সমাজের বিশেষতঃ আমাদের দেশের এবং রাজ্যের সমস্যা সম্পর্কিত বিষয়সমূহের পাশাপাশি জেলার বিশেষ সমস্যাবলীর অগ্রাধিকার-ভিত্তিক অনুপুঙ্খ অনুশীলন ও অনুসন্ধান:
- সামাজিক সমস্যাবলীর কারণ অনুসন্ধানের প্রক্রিয়ায় জনগণের সংযুক্তিকরণ এবং অনুসন্ধানলব্ধ ফলাফল সমাজের সর্বস্তরে উপস্থাপন ও প্রয়োগ।

Published by Dr Anil Kumar Jana
Secretary, Vidyasagar Centre for Social Sciences
Midnapore, West bengal